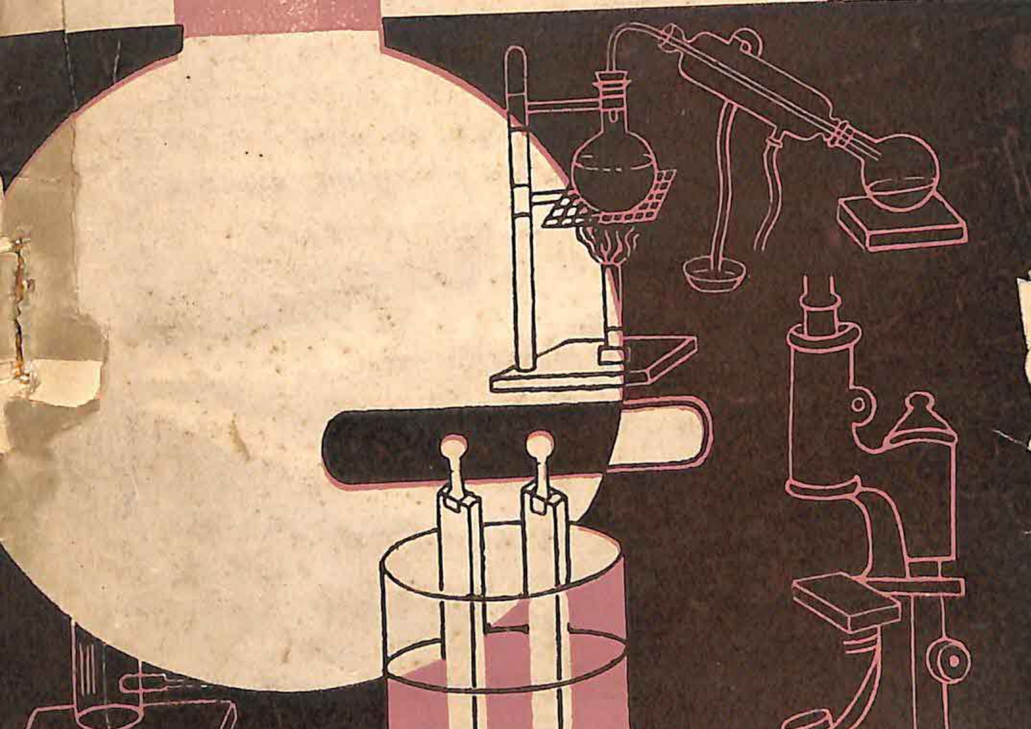
মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান



শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
ও
অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বা

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class IX for all Schools in West Bengal & Tripura (Vide Notification No. TB/74/IX/PS/60 and also Board's Letter No. 10367/G dated 24. 11. 75)

মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান

[নবম শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-প্রাপ্ত 'মানব-কল্যাণে রসায়ন', দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংহদাস পুরস্কার'-প্রাপ্ত 'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধান, 'কিশোর বিজ্ঞানী', 'মাধ্যমিক বিজ্ঞান' প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থ-প্রণেতা।

ও

অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস, এম. এস-সি., ডি-ফিল.

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও 'মাধ্যমিক বিজ্ঞান', স্নাতক শ্রেণীর 'ব্যবহারিক রসায়ন' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৭৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৭৪
তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ১৯৭৫
চতুর্থ সংস্করণ : জুন, ১৯৭৬

চিত্রশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীচিত্রকুমার রায়
কলিকাতা।

প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে
হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য : ৪ টাকা মাত্র

[ভারত সরকার প্রদত্ত স্বল্পমূল্য কাগজে এই পুস্তক ছাপা হইয়াছে।]

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর প্রিণ্টার্স
২৭/৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ সাধারণ তথ্যাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন ভৌত রাশি ও তাহাদের একক-সমূহ; পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি; পরিমাপের বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশল: সাধারণ স্কেল, সাধারণ তুলা, পরিমাপক চোঙ, ঘড়ি। 1—16

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পদার্থ ও শক্তি; ভর ও ওজন; শক্তির বিভিন্ন রূপ; শক্তির রূপান্তর; ভর-সংরক্ষণ সূত্র ও শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র। 17—25

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পদার্থের অবস্থান্তর: গলন, হিমায়ন, স্ফুটন, বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন; স্ফুটনাঙ্ক ও গলনাঙ্ক এবং উহাদের উপর বিভিন্ন বাহ্যিক বিষয়ের প্রভাব; লীন তাপ। 26—35

প্রথম অধ্যায়ের অনুশীলনী (i)—(v)

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পদার্থ-বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ স্থিতি ও গতি: স্থির ও সচল অবস্থা; সরণ, দ্রুতি ও গতিবেগ; ত্বরণ ও মন্দন; নিউটনের গতিসূত্র; বলের সংজ্ঞা। 36—46

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কার্য, শক্তি ও ক্ষমতা; স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি; সরল যন্ত্র: আনত তল, লিভার, চক্র ও অক্ষ-দণ্ড। 47—60

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তাপের প্রকৃতি; তাপ ও তাপমাত্রা; তাপের পরিমাণ-নির্ধারক বিষয়সমূহ; শক্তির অন্যতম রূপ হিসাবে তাপ; তাপের সঙ্গে কার্যের সম্পর্ক। 61—70

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ আলোকের উৎস; আলোক-রশ্মি; আলোকের স্বরূপ ও গতিবেগ; আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ; প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা; আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন; উত্তল লেন্সের অভিসারীয় ক্রিয়া ও ফোকাস-দূরত্ব; আতস-কাচ হিসাবে উত্তল লেন্সের ব্যবহার; আলোকের বিচ্ছুরণ ও বর্ণালী (পরীক্ষা ও প্রদর্শন)। 71—92

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুশীলনী (i)—(v)

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রসায়ন-বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ পদার্থের ভৌত অবস্থা ; পদার্থের ভৌত গঠন ও তিনটি অবস্থার অস্তিত্বের কারণ ; স্ফুটনাংক ও গলনাংক, পদার্থের সনাক্তকরণ ; ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ; পদার্থের বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ; পদার্থের বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ; রাসায়নিক পরিবর্তনের সহায়ক ও নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন উপায় ; তাপ-উদ্গারী ও তাপ-শোষক বিক্রিয়া ; মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ ; ধাতু ও অ-ধাতু। 93—108

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দ্রবণ : দ্রাবক ও দ্রাব ; সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ ; তাপমাত্রার সহিত দ্রাব্যতার সম্পর্ক। 109—112

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ প্রতীক, সংকেত, রাসায়নিক সমীকরণ ; সমীকরণের সঠিক তাৎপর্য এবং সহজ সমীকরণের সঠিক প্রকাশ-পদ্ধতি। 113—118

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ তড়িদ্‌বিশ্লেষণ ঃ তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য পদার্থ ; জলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ ; ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (তড়িদ্‌প্রলেপন)। 119—124

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা ; প্রশমন-ক্রিয়া। 125—127

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ জারণ ও বিজারণ। 128—130

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ তরল বায়ু ; নাইট্রোজেন-চক্র ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড চক্র (সাধারণ ধারণা) ; বায়ুর বিরল গ্যাসীয় উপাদানগুলির ব্যবহার ; নিয়ন-আলোক। 131—136

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ কয়েকটি সাধারণ গ্যাসের সহজ প্রস্তুত-প্রণালী ও ধর্ম ঃ অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, কিপ্‌ যন্ত্র ও তাহার ব্যবহার। 137—150

তৃতীয় অধ্যায়ের অনুশীলনী (i)—(x)

প্রথম অধ্যায়ঃ

সাধারণ তথ্যাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিমাপের একক ও পদ্ধতি

(Units and Systems of Measurement)

পাঠ্যসূচীঃ বিভিন্ন ভৌত রাশি ও তাহাদের এককসমূহ; পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি; পরিমাপের বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলঃ সাধারণ স্কেল, সাধারণ তুলা, পরিমাপক চোঙ, ঘড়ি।

রাশি ও একক

(Quantities and Units)

বিজ্ঞান হইল যে-কোন বিষয়ের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের সঠিক পরিমাপ জানা একান্ত প্রয়োজন। কোন-কিছু মাপিয়া সঠিক সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে না পারিলে তৎসম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সুনির্দিষ্ট জ্ঞান হয় না। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দুইটি দণ্ডের কোন্‌টি বড় পাশাপাশি ধরিয়া তাহা বলিতে পারি; কিন্তু কতটা বড় তাহা উহাদের **দৈর্ঘ্য** (length) না মাপিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। দুধ কিনিতে গেলে উহার **আয়তন** (volume) মাপিয়া লইতে হয়; মাছ কিনিবার সময় উহার **ভর** (mass)* অর্থাৎ বস্তু-পরিমাণ ওজন করিয়া লই; কোন্ কাজ করিতে কত **সময়** (time) লাগে তাহা হিসাব করিতে হয়। আমরা এই দৈর্ঘ্য, আয়তন, ভর ও সময়ের পরিমাপ যথাক্রমে মিটার (metre), লিটার (litre), গ্র্যাম (gram) ও মিনিট (minute) এককের (unit) কোন গুণিতক, বা ভগ্নাংশিক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করি।

---

* কোন বস্তুর ভর (mass) ও ওজনের (weight) মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে; এখানে সাধারণভাবে উহাদের সমার্থক বলা হইল।

যাহা কিছু পরিমাপযোগ্য, তাহাকে বলা হয় **রাশি** (quantity) ; যথা, দৈর্ঘ্য, আয়তন, ভর, গতিবেগ, সময় ইত্যাদি। কোন রাশি পরিমাপ করিতে হইলে সেই জাতীয় রাশির কোন একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণকে মূল, বা প্রমাণ (standard) মাপকাঠি হিসাবে ধরিয়া লইতে হয়, যাহাকে বলা হয় ঐ রাশির **একক** (unit)। রাশিটির সমগ্র পরিমাণ তাহার এককের কত গুণ, বা কত ভগ্নাংশ সেই সংখ্যা দ্বারা রাশিটির পরিমাপ প্রকাশ করা হয় ; অতএব বলা যায়, **রাশির পরিমাপ = সংখ্যা × রাশির একক।**

তরল পদার্থের আয়তন প্রকাশ করিবার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আয়তনকে একক (unit) ধরা হইয়াছে, যাহা লিটার (litre) নামে পরিচিত। যদি বলা হয়, কোন পাত্রে 10 লিটার জল আছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আয়তনের ঐ নির্দিষ্ট একক, বা মাপকাঠির 10 গুণ জল ঐ পাত্রে আছে। এইরূপ দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর, গতিবেগ, উষ্ণতা, সময় প্রভৃতির জন্য বিভিন্নরূপ একক নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রাথমিক একক ও লব্ধ একক :
(Fundamental Units and Derived Units)

প্রত্যেক রাশিরই এক-একটি সুনির্দিষ্ট একক রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক তিনটি স্বাধীন ও অন্য-নিরপেক্ষ ; অপরাপর সকল রাশির এককই ইহাদের সাহায্যে পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য **দৈর্ঘ্য** (length), **ভর** (mass) ও **সময়** (time)—এই তিনটির একককে বলা হয় **প্রাথমিক, বা মৌলিক একক** (fundamental units) ; আর, অন্যান্য বিভিন্ন রাশির একক এই তিনটি প্রাথমিক এককের ভিত্তিতে পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের বলে **লব্ধ একক** (derived units)। এইভাবে, বস্তুর ক্ষেত্রফল, আয়তন, ঘনত্ব, গতিবেগ প্রভৃতি বিভিন্ন রাশির একক ঐ প্রাথমিক একক তিনটি হইতেই পাওয়া যায় ; যেমন—**ক্ষেত্রফল** হইল দুইটি দৈর্ঘ্যের (linear measure) গুণফল (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) ; **আয়তন** হইল তিনটি দৈর্ঘ্যের গুণফল (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × বেধ) ; **ঘনত্ব** বলিতে বুঝায় ভর ও আয়তনের ভাগফল (ভর ÷ আয়তন)। আবার, কোন চলমান বস্তুর **গতিবেগ** বলিতে আমরা বুঝি, একক সময়ে বস্তুটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ দূরত্ব,

বা দৈর্ঘ্য ÷ সময়। এইভাবে বিভিন্ন রাশির একক উক্ত প্রাথমিক একক তিনটি হইতে হিসাব করিয়া সহজেই পাওয়া যাইতে পারে।

প্রধান দুইটি পরিমাপ-পদ্ধতি :
(Two Main Systems of Measurement)

উল্লিখিত তিনটি প্রাথমিক একক প্রকাশ করিবার বস্তুতঃ দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে : (a) সি. জি. এস. পদ্ধতি (C. G. S. system) ও (b) এফ. পি. এস. পদ্ধতি (F. P. S. system) :

(a) **সি. জি. এস. পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হইল সেন্টিমিটার (centimetre), ভরের একক গ্র্যাম (gram) এবং সময়ের একক সেকেণ্ড (second) ধরা হইয়াছে। এই সেন্টিমিটার, গ্র্যাম ও সেকেণ্ড শব্দ তিনটির ইংরাজী আদ্যক্ষর লইয়া পদ্ধতিটির নামকরণ করা হইয়াছে সি. জি. এস. (C. G. S.) পদ্ধতি।

এই পরিমাপ-পদ্ধতিটি প্রথমে ফরাসীদেশে উদ্ভাবিত হয় বলিয়া ইহাকে **ফরাসী পদ্ধতি** (French system)-ও বলা হয়। আজকাল যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় এবং ইহা সাধারণতঃ **মেট্রিক পদ্ধতি** (Metric system) নামে পরিচিত। মেট্রিক পদ্ধতিতে বৃহৎ রাশি পরিমাপের সুবিধার জন্য ইহার একটি প্রকারভেদ প্রচলিত আছে, যাহাকে বলা হয় **এম. কে. এস. পদ্ধতি**। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক মিটার (metre), ভরের একক কিলোগ্র্যাম (kilogram) ও সময়ের একক সেকেণ্ড (second) ধরা হয়। এই প্রাথমিক একক তিনটির ইংরাজী আদ্যক্ষর লইয়া পদ্ধতিটির নামকরণ করা হইয়াছে এম. কে. এস. (M. K. S.) পদ্ধতি। বস্তুতঃ ইহা সি. জি. এস. পদ্ধতিরই প্রকারভেদ মাত্র।

(b) **এফ. পি. এস. পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক ফুট (foot), ভরের একক পাউণ্ড (pound) ও সময়ের একক সেকেণ্ড (second) ধরা হইয়াছে। এই প্রাথমিক একক তিনটির ইংরাজী আদ্যক্ষর লইয়া ইহার নাম করা হইয়াছে এফ. পি. এস. (F. P. S) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে **বৃটিশ পদ্ধতি** (British system)-ও বলা হয়।

বিভিন্ন রাশির একক
(Units of Different Quantities)

A. দৈর্ঘ্যের একক (Units of Length) :

1. সি. জি. এস. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট একক হইল **সেন্টিমিটার** (centimetre)। ফরাসীদেশের প্যারিস নগরীর নিকটবর্তী সেভার্ন নামক স্থানে 'আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ সংস্থা'-য় (International Bureau of Weights and Measures) প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর-ধাতুতে নির্মিত একটি দণ্ড 0°C তাপমাত্রায় রক্ষিত আছে; উহার উপরে দুইটি সুনির্দিষ্ট চিহ্নের মধ্যবর্তী দূরত্বকে এক **মিটার** (metre) দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এক মিটারের 10 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় ডেসিমিটার (decimetre), তাহার আবার 10 ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ মিটারের 100 ভাগের এক ভাগকে বলে **সেন্টিমিটার** (centimetre, সংক্ষেপে cm.), যে-দৈর্ঘ্যকে এই পদ্ধতিতে মূল একক (unit) ধরা হইয়াছে।

আবার, সেন্টিমিটারের 10 ভাগের এক ভাগকে বলে এক মিলিমিটার (milimetre)। পক্ষান্তরে, মিটারের দশ-দশ গুণিতক দৈর্ঘ্যকে যথাক্রমে ডেকামিটার (decametre), হেক্টোমিটার (hectometre) ও কিলোমিটার (kilometre) বলা হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দৈর্ঘ্য-রাশি মাপিবার জন্য মিটারের এইরূপ ভগ্নাংশিক ও গুণিতক দৈর্ঘ্য-মাপ এতদ্বিষয়ক আলোচনাকালে বিশেষ সুবিধাজনক হয়। সংক্ষেপে বলা যায় :

10 মিলিমিটার=1 সেন্টিমিটার	10 মিটার=1 ডেকামিটার
10 সেন্টি „ =1 ডেসিমিটার	10 ডেকামিটার=1 হেক্টোমিটার
10 ডেসি „ =1 মিটার	10 হেক্টো " =1 কিলোমিটার
অর্থাৎ 1000 মিলি „ =1 মিটার	অর্থাৎ 1 কিলোমিটার=1000 মিটার

2. এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হইল **ফুট** (foot)। লণ্ডনে 'বৃটিশ বণিক-সভা'-র (British Board of Trade) দপ্তরে ব্রোঞ্জ-নির্মিত যে দণ্ডটি 62° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রক্ষিত আছে, তাহার উপরে দুইটি সুনির্দিষ্ট চিহ্নের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা দৈর্ঘ্যকে বলা হয় 1 গজ (yard); গজের এক-তৃতীয়াংশকে বলা হয় 1 ফুট, যাহাকে এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের নির্দিষ্ট প্রাথমিক একক ধরা হইয়াছে।

এই পদ্ধতিতে ফুটের 12 ভাগের এক ভাগকে ইঞ্চি (inch), 1760 গজে 1 মাইল (mile) এবং 220 গজে 1 ফার্লং (furlong) ছাড়া আর কোন ভগ্নাংশিক বা গুণিতক দৈর্ঘ্য-রাশি নাই।

B. **ভরের একক** (Units of Mass):

1. সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ভরের একক হইল **গ্র্যাম** (gram)। প্যারিসের সেভার্নে 'আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ সংস্থা'-য় প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর-ধাতুতে নির্মিত একটি বতুর্লাকার ধাতু-খণ্ড রক্ষিত আছে, যাহার ভরকে বলা হয় 1 **কিলোগ্র্যাম** (kilogram)। 1 কিলোগ্র্যামের 1000 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় 1 গ্র্যাম (gram), যাহাকে এই পদ্ধতিতে ভর বা বস্তু-পরিমাণের নির্দিষ্ট একক ধরা হইয়াছে।

ভরের মূল পরিমাণ হিসাবে গ্র্যাম-একককে দৈর্ঘ্যের সেন্টিমিটার-এককের ভিত্তিতে এইভাবে স্থির করা হইয়াছে: 4° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক **ঘন সেন্টিমিটার** (cubic centimetre, সংক্ষেপে c.c.) আয়তনবিশিষ্ট বিশুদ্ধ জলের ভর হইল এক **গ্র্যাম** (gram)।

সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ভরের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাশি পরিমাপের জন্য দশমিক ভগ্নাংশ ও গুণিতক মাপের এককসমূহ এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

10 মিলিগ্র্যাম = 1 সেন্টিগ্র্যাম	10 গ্র্যাম = 1 ডেকাগ্র্যাম
10 সেন্টিগ্র্যাম = 1 ডেসিগ্র্যাম	10 ডেকাগ্র্যাম = 1 হেক্টোগ্র্যাম
10 ডেসিগ্র্যাম = 1 গ্র্যাম	10 হেক্টোগ্র্যাম = 1 কিলোগ্র্যাম
অর্থাৎ 1000 মিলিগ্র্যাম,	অর্থাৎ 1 কিলোগ্র্যাম = 1000 গ্র্যাম।
বা 100 সেন্টিগ্র্যাম = 1 গ্র্যাম।	

2. এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ভরের একক হইল **পাউণ্ড** (pound)। লণ্ডনে 'বৃটিশ বণিক-সভা'-র কার্যালয়ে রক্ষিত প্ল্যাটিনাম ধাতুতে নির্মিত একটি সুনির্দিষ্ট ধাতুখণ্ডের ভরকে ধরা হয় এক পাউণ্ড। পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর ভর মাপিতে হইলে **কোয়ার্টার** (28 পাউণ্ড), **হন্দর** (4 কোয়ার্টার, বা 112 পাউণ্ড) এবং **টন** (20 হন্দর, বা 2,240 পাউণ্ড) একক ব্যবহৃত হয়। আবার, ক্ষুদ্রতর ভর মাপিতে **আউন্স** (ounce, পাউণ্ডের 16 ভাগের একভাগ) মাপ ব্যবহার করা হয়। এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ভরের এইরূপ পরিমাপ বাস্তব ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নহে, প্রচলনও তেমন নাই।

C. **সময়ের একক** (Units of Time) :

সি. জি. এস. ও এফ. পি. এস. উভয় পদ্ধতিতেই সময়ের একক হইল **সেকেণ্ড** (second)। পৃথিবীর কোন স্থানে পর-পর দুই দিন সূর্য ঠিক মধ্য-গগনে উঠিবার সময়ের ব্যবধানকে বলা হয় স্থানীয় এক **সৌর দিবস** (solar day)। যে-কোন স্থানে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই সৌর দিবসের মান বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং একটি পূর্ণ বৎসরে সৌর দিবসের গড় মানকে বলা হয় **গড় সৌর দিবস** (mean solar day)। এই গড় সৌর দিবসের 24 ভাগের এক ভাগ সময়-কালকে বলা হয় এক **ঘণ্টা** (hour) ; এক ঘণ্টার 60 ভাগের এক ভাগকে বলে এক **মিনিট** (minute) ; এক মিনিটের 60 ভাগের এক ভাগ সময় হইল এক **সেকেণ্ড** (second)।

D. **ক্ষেত্রফলের একক** (Units of Area) : সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক হইল **বর্গ সেন্টিমিটার** (square centimetre, সংক্ষেপে sq. cm.)। যে বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 1 সেন্টিমিটার, তাহার ক্ষেত্রফলকে বলা হয় 1 বর্গ সেন্টিমিটার।

আবার, এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক হইল **বর্গ ফুট** (square foot)। কোন বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 1 ফুট হইলে উহার ক্ষেত্রফলকে বলা হয় 1 বর্গ ফুট (অর্থাৎ $12 \times 12 = 144$ বর্গ ইঞ্চি)।

E. **আয়তনের একক** (Units of Volume) : সি. জি. এস. পদ্ধতিতে আয়তনের একক ধরা হয় **ঘন সেন্টিমিটার** (cubic centimetre, সংক্ষেপে c.c.)। যে ঘনকের (cube) প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 1 সেন্টিমিটার, তাহার আয়তন হইল 1 ঘন সেন্টিমিটার (c. c.)। অধিকতর আয়তন পরিমাপের জন্য প্রায়শঃই (বিশেষতঃ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে) আর একটি একক ব্যবহৃত হয়, যাহাকে বলে **লিটার** (litre) ; 1 লিটার = 1000 ঘন সেন্টিমিটার।

এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে আয়তনের একক হইল **ঘন ফুট** (cubic foot)। কোন ঘনকের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 1 ফুট হইলে তাহার আয়তনকে বলা হয় 1 ঘন ফুট। ঘন ফুট অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর আয়তন মাপিতে হইলে (বিশেষতঃ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে) **গ্যালন** (gallon) একক ব্যবহার করা হয়। 62° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় 10 পাউণ্ড বিশুদ্ধ জলের আয়তনকে বলে এক গ্যালন। 1 গ্যালন = 0·16 ঘন ফুট।

পদ্ধতি দুইটির পারস্পরিক সম্পর্ক :

(Relation between C.G.S. & F.P.S. measures)

উল্লিখিত দুইটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাশির যে-সকল একক আলোচিত হইয়াছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নে দেওয়া হইল :

(i) দৈর্ঘ্য : 1 সেন্টিমিটার = 0·394 ইঞ্চি ; 1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার ; 1 গজ = 3 ফুট = 0·914 মিটার ; 1 মিটার = 1·09 গজ = 39·4 ইঞ্চি ; 1 মাইল = 1·64 কিলোমিটার ; 1 কিলোমিটার = 0·62 মাইল।

(ii) ভর : 1 কিলোগ্রাম = 2·21 পাউণ্ড ; 1 পাউণ্ড = 454 গ্র্যাম = 0·454 কিলোগ্র্যাম।

(iii) **আয়তন :** 1 লিটার = 1000 সি. সি. = 0·22 গ্যালন ; 1 গ্যালন = 4·54 লিটার = 0·16 ঘন ফুট।

(iv) **ক্ষেত্রফল :** 1 বর্গ ফুট = 929 বর্গ সেন্টিমিটার = 0·093 বর্গ মিটার ; 1 বর্গ মাইল = 2·69 বর্গ কিলোমিটার।

কয়েকটি রাশির পরিমাপ-কৌশল

(Some Measuring Devices)

যে কোন রাশির সঠিক পরিমাপের জন্য অবশ্যই কোন না কোনরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। পাঠ্যসূচী অনুসারে দৈর্ঘ্য, আয়তন, ভর ও সময়ের পরিমাপ-কৌশল সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

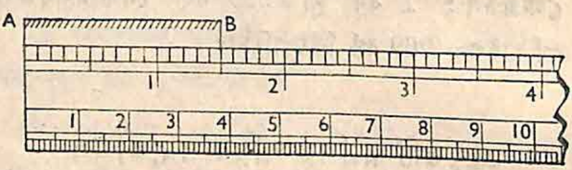
A. দৈর্ঘ্য পরিমাপের কৌশল :

(Devices for Measurement of Length)

কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিবার জন্য আমরা সাধারণতঃ **স্কেল** (scale) ব্যবহার করিয়া থাকি। সাধারণ স্কেল প্রকৃতপক্ষে কাঠ, বা ইস্পাত-নির্মিত চ্যাপ্টা ও লম্বা একটি পাত্ মাত্র। এই পাতের কোন এক প্রান্তের কাছাকাছি কোন নির্দিষ্ট স্থানে একটি দাগ কাটিয়া উহাকে প্রারম্ভ-বিন্দু হিসাবে শূন্য (0) চিহ্নিত করা হয় এবং তাহা হইতে সঠিক এক ইঞ্চি দূরত্বে পর-পর এক-একটি দাগ কাটিয়া উহাদের 1, 2, 3, 4 ··চিহ্নিত করা হয়। দৈনন্দিন কাজে

সাধারণতঃ এফ. পি. এস. পদ্ধতির এক ফুট (12 ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ উহা শূন্য হইতে 12 পর্যন্ত অংশাঙ্কিত থাকে ; উহাকে বলা হয় **ফুট-স্কেল**। প্রতি ইঞ্চির ব্যবধানকে আবার 10-টি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া ছোট-ছোট দাগ কাটা থাকে ; কাজেই এইরূপ প্রতিটি ক্ষুদ্রতর ভাগের দৈর্ঘ্য হয় এক ইঞ্চির এক-দশমাংশ, অর্থাৎ 0·1 ইঞ্চি।

মেট্রিক, বা সি. জি. এস. পদ্ধতির পরিমাপই বর্তমানে সমধিক প্রচলিত ; ইহাকে বলা হয় **সেন্টিমিটার স্কেল** (centimetre scale)। ইহার নির্মাণ-পদ্ধতি ফুট-স্কেলের অনুরূপ ; এই স্কেলের শূন্য (0) চিহ্নিত দাগ হইতে পর-পর সঠিক এক সেন্টিমিটার দূরত্বে দাগ কটিয়া 1, 2, 3, 4…প্রভৃতি সংখ্যা চিহ্নিত থাকে। স্কেলের প্রতি সেন্টিমিটার অংশ অনুরূপভাবে আবার 10 ভাগে ভাগ করা থাকে, যাহাদের এক-এক অংশ 0·1 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ 1 মিলিমিটার (m.m.) হয়। প্রচলিত কোন-কোন স্কেলের

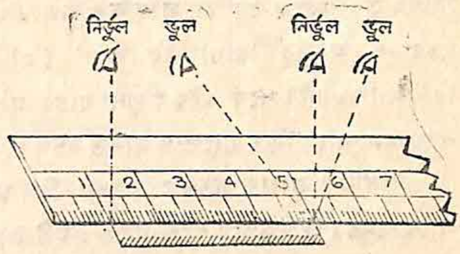


সাধারণ স্কেল : দুই পার্শ্বে ইঞ্চি ও সেন্টিমিটার অংশাঙ্কিত

এক পার্শ্বে ইঞ্চি ও অপর পার্শ্ব সেন্টিমিটার হিসাবের দাগে অংশাঙ্কিত থাকে। ইহাতে একই সঙ্গে উভয় পদ্ধতির দৈর্ঘ্যের মাপ ও উভয়ের সম্পর্ক স্থির করা সম্ভব হয়।

যে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে সেই বস্তুর এক প্রান্তকে স্কেলের শূন্য চিহ্নিত দাগের উপরে স্থাপন করিতে হয় এবং বস্তুটির অপর প্রান্ত স্কেলের কোন্ দাগের সঙ্গে সঠিক মিলিয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। ইঞ্চি, বা সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কয়টি বড় বিভাগ (big division) ও কয়টি ছোট (0·1 ইঞ্চি, বা 1 মিলিমিটার) বিভাগের দাগের সঙ্গে পরিমেয় বস্তুটির অপর প্রান্ত হুবহু মিলিয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বস্তুটির দৈর্ঘ্য জানা যায়। যেমন ধরা যাক, একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য এইভাবে মাপিয়া যেন দেখা গেল, ফুট-স্কেলে 1·5 ইঞ্চি এবং সেন্টিমিটার-স্কেলে 3·9 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ 3

সেন্টিমিটার 9 মিলিমিটার। স্কেলের সাহায্যে কোন-কিছুর দৈর্ঘ্য এইভাবে পরিমাপ করিবার সময়ে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বস্তুর যে-কোন প্রান্ত স্কেলের দাগের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সময় শিক্ষার্থীর চোখ সর্বদা লম্বভাবে (সোজাসুজি দ্রষ্টব্য দাগের উপর হইতে) ফেলিতে হইবে : এদিক-ওদিক হইতে কৌণিকভাবে দেখিলে দৈর্ঘ্যের মাপ সঠিক হয় না। এই ব্যতিক্রমের কারণকে আলোকবিজ্ঞানে বলে **প্যারালাক্স** (parallax), বাংলায় বলা যায় 'দৃষ্টি-বৈষম্য'। ব্যাপারটির তাৎপর্য প্রদত্ত চিত্র হইতে সহজেই বুঝা যাইবে।



প্যারালাক্স জনিত ত্রুটি : স্কেল ও দৃষ্টিকোণ

সাধারণ স্কেলের সাহায্যে বস্তুর দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ সঠিকভাবে মাপা সম্ভব হয় না, মোটামুটি চলিতে পারে মাত্র। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিখুঁতভাবে স্বল্প দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য এক বিশেষ ধরনের **ভার্নিয়ার** (vernier) নামক পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, যাহার আলোচনা পাঠ্যসূচী অনুসারে এখানে নিষ্প্রয়োজন। যথেষ্ট বেশী দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য উল্লিখিত সাধারণ স্কেলের ভিত্তিতেই দীর্ঘ **পরিমাপক ফিতা** (measuring tape), **চেইন** (chain) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

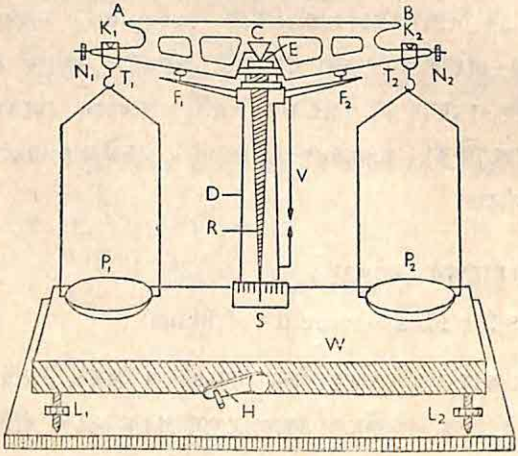
B. ভর পরিমাপের কৌশল :
(Devices for Measurements of Mass)

সাধারণতঃ আমরা যদিও বস্তুর ভর (mass) ও ওজন (weight) একই বলিয়া মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি রাশি (18 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর 'ওজন মাপিবার' জন্য সচরাচর যে দাড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয়, তাহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বস্তুর 'ওজন মাপা' হয় না; ইহাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ (standard) ভরের বিভিন্ন বাটখারার সহিত তুলনামূলকভাবে বস্তুর 'ভর' পরিমাপ করা হয়।

সাধারণভাবে বস্তুর ভর পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার দাড়িপাল্লা, বা তুলা-যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদিতে কোন বস্তুর

ভরের এইরূপ তুলনামূলক সূক্ষ্ম ও সঠিক পরিমাপের জন্য গবেষণাগারে ব্যবহৃত বিশেষ তুলা-যন্ত্রকে বলা হয় **সাধারণ তুলা** (common balance), যাহাকে সচরাচর আবার 'রাসায়নিক তুলা' (chemical balance)-ও বলে। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে এইরূপ তুলা-যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার-পদ্ধতি জানা বিশেষ প্রয়োজন, যাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

সাধারণ তুলার গঠন ঃ প্রদত্ত চিত্রানুযায়ী কাঠের একটি অনুভূমিক পাটাতনের (W) উপরে ধাতুনির্মিত একটি ফাঁপা স্তম্ভ (pillar, D) উল্লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকে। স্তম্ভটির অভ্যন্তরে থাকে একটি ধাতব লম্ব-দণ্ড, যাহার উর্ধ্ব-প্রান্তে অ্যাগেট (agate) নামক এক প্রকার সুকঠিন প্রস্তরের মসৃণ একটি ছোট পাত্ (agate-plate, E) বসানো থাকে। ছোট ত্রিকোণাকার একটি অ্যাগেট খণ্ডের (C) তীক্ষ্ণ প্রান্ত উক্ত পাত্টির উপরে রাখা হয়; এই অ্যাগেট-খণ্ডটিকে বলা হয় **ক্ষুরধার** (knife-edge) বা **ফাল্‌ক্রাম** (fulcrum)। উহা একটি অনুভূমিক ধাতব দণ্ডের নীচে ঠিক মধ্যস্থলে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকে; এই দণ্ডটিকে (AB) বলা হয় **তুলাদণ্ড** (balance beam)।



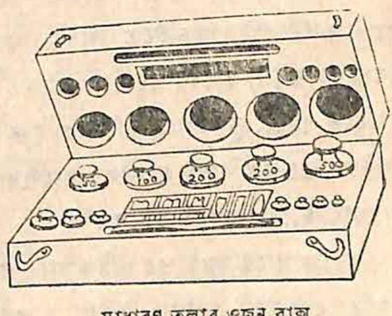
সাধারণ বা রাসায়নিক তুলা

ফাল্‌ক্রামের দুই পার্শ্বে তুলাদণ্ডটির সমদীর্ঘ বাহু দুইটির প্রান্তদ্বয়ে দুইটি ছোট স্ক্রু (screw, N_1 ও N_2) আঁটা থাকে। তুলা ব্যবহারকালে নীচের পাটাতন-সংলগ্ন একটি **হাতল** (H) ঘুরাইয়া তুলাদণ্ডটিকে প্রয়োজনানুযায়ী উঠানো বা নামানো যায়; অন্য সময় তুলাদণ্ডটি স্থির সংবদ্ধ দুইটি অবলম্বন F_1 ও F_2-এর উপরে রক্ষিত থাকে। তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে সংলগ্ন দুইটি

ছোট অ্যাগেট-ক্ষুরধারের (K_1 ও K_2) উপরে বসানো সমান ভর ও সমান দৈর্ঘ্যের দুইটি আংটা, বা ষ্টিরাপের (T_1 ও T_2) সহিত সমান ভর-বিশিষ্ট দুইটি **তুলাপাত্র** (P_1 ও P_2, scale pan) ঝুলানো থাকে।

এতদ্ব্যতীত, সূক্ষ্ম ও সঠিক পরিমাপের জন্য তুলাদণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে লম্বভাবে নিম্নমুখী আবদ্ধ একটি সরু ধাতব কাঁটা (R) **সূচক** (pointer) রূপে কাজ করে। এই সূচক-কাঁটাটির নিম্নপ্রান্ত একটি ছোট স্কেলের (S) উপরে এদিক-ওদিকে দোলে; আর, দুই পার্শ্বস্থ তুলাপাত্র দুইটি সম-ভার হইলে কাঁটাটি স্থির অবস্থায় স্কেলের শূন্য (0) দাগের সহিত মিলিয়া যায়। তুলার স্তম্ভটি (D) ঠিক উল্লম্বভাবে দণ্ডায়মান আছে কি-না বুঝিবার জন্য দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অবলম্বন F_2 হইতে একগাছা **ওলন-দড়ি** (V, plumb line) ঝুলানো থাকে। তুলা ব্যবহারকালে স্তম্ভটি সম্পূর্ণ উল্লম্ব না থাকিলে পাটাতনের নিম্নস্থ L_1 ও L_2 স্ক্রু-দুইটি ঘুরাইয়া স্তম্ভটিকে উল্লম্ব করিয়া লইতে হয়। বাহিরের বায়ুপ্রবাহে তুলাদণ্ড অযথা দুলিয়া তুলাকার্য যাহাতে বিঘ্নিত না হয় তজ্জন্য হাতল (H) ও লেভেলিং স্ক্রু (L_1 ও L_2) ব্যতীত সমগ্র তুলাযন্ত্রটি কাচের একটি বাক্সের মধ্যে রক্ষিত থাকে।

পরীক্ষাগারে বস্তুর তুলনামূলক সঠিক ভর নিরূপণের জন্য তুলাযন্ত্র ব্যবহারে সি. জি. এস. এককের প্রামাণ্য মাপের বিভিন্ন বাটখারা সহ **ওজন-বাক্স** (weight-box) অবশ্যই প্রয়োজন হয়। কাঠের একটি বাক্সের মধ্যে বিভিন্ন খোপে ছোট-বড় বাটখারা-গুলি রক্ষিত থাকে; যেমন—100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2, 1 গ্রাম; 500, 200, 200, 100, 50, 20, 20, 10 মিলি-গ্রাম ভরের বাটখারা। বাটখারা-গুলি হাতে না ধরিয়া সর্বদা একটি ধাতব চিম্‌টার (forceps) সাহায্যে ধরিয়া স্থানান্তরিত করিতে হয়।



সাধারণ তুলার ওজন বাক্স

ব্যবহার-পদ্ধতি : তুলাদণ্ড ব্যবহারকালে প্রথমেই উহার স্তম্ভ (D) সম্পূর্ণ উল্লম্ব আছে কি-না তাহা ওলন-দড়ি (V) লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হয়। উহা

উল্লম্ব না থাকিলে পাটাতনের L_1 ও L_2 স্ক্রু-দুইটিকে প্রয়োজনানুযায়ী ঘুরাইয়া উল্লম্ব করিয়া লইতে হয় এবং ওলন-দড়ি হইতে তাহা বুঝা যায়।

অতঃপর, তুলাপাত্র দুইটি খালি অবস্থায় পাটাতন-সংলগ্ন হাতল (H) ঘুরাইয়া আস্তে-আস্তে তুলাদণ্ডটি উপরে তুলিয়া লক্ষ্য করিতে হয়, উহা স্থির অবস্থায় সম্পূর্ণ অনুভূমিক আছে কি না, অর্থাৎ সূচক (R) কাঁটাটি স্কেলের শূন্য (0) দাগের সহিত মিলিয়া স্থির রহিয়াছে কি-না। তাহা না হইলে N_1 ও N_2 স্ক্রু-দুইটি ঘুরাইয়া তুলাদণ্ডটিকে সঠিকভাবে অনুভূমিক করিতে হয়, অর্থাৎ তুলাপাত্র দুইটি যেন সমান উচ্চে স্থিরভাবে থাকে।

এখন, যে বস্তুর ভর পরিমাপ করিতে হইবে তাহা বাম দিকের তুলাপাত্রে রাখিয়া ডান দিকের তুলাপাত্রে (ওজন-বাক্স হইতে চিম্‌টার সাহায্যে) আন্দাজ মত একটি, বা কয়েকটি বাটখারা রাখিতে হইবে। অতঃপর হাতলের সাহায্যে তুলাদণ্ডটিকে উপরে তুলিলে যদি দেখা যায়, সূচক-কাঁটাটি স্কেলের শূন্য (0) দাগের বাম দিক অপেক্ষা ডান দিকে অধিক সংখ্যক দাগ অবধি সরিয়া আন্দোলিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বস্তুটির ভর ব্যবহৃত বাটখারাগুলির মোট ভর অপেক্ষা বেশী। অপরপক্ষে, সূচকটি যদি স্কেলের ডান দিক অপেক্ষা বাম দিকে অধিকতর দূর অবধি যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ব্যবহৃত বাটখারাগুলির মিলিত ভর বস্তুটির ভর অপেক্ষা অধিক। সূচক-কাঁটাটির এইরূপ গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া অতি সাবধানে বাটখারাগুলির ভর প্রয়োজনানুযায়ী বাড়াইতে অথবা কমাইতে হইবে, যতক্ষণ না সূচকটি স্কেলের শূন্য (0) দাগের দুইদিকে সমান দূরত্ব অবধি আন্দোলিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, তুলাপাত্রে বাটখারা যুক্ত করিতে, অথবা তাহা হইতে অপসারণ করিতে প্রত্যেক বারই হাতলের সাহায্যে তুলাদণ্ডটিকে প্রথমে নামাইয়া স্থির অবস্থায় আনিয়া লইতে হইবে।

পরীক্ষাগারে বস্তুর ভর সঠিকভাবে পরিমাপের জন্য সাধারণ তুলার ব্যবহার-পদ্ধতি মোটামুটি বর্ণিত হইল। সূচকটির উল্লিখিত অবস্থায় বস্তুটির ভর ব্যবহৃত বাটখারাগুলির মিলিত ভরের সমান হইবে।

C. তরল পদার্থের আয়তন মাপিবার কৌশল :
(Measuring Devices for Volume of Liquids)

কঠিন পদার্থের আকার সুনির্দিষ্ট ; সুতরাং নিয়মিত আকারের (regular

shaped) কোন কঠিন পদার্থের আয়তন (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × বেধ) গণনা করিয়া সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু তরল পদার্থের কোন নির্দিষ্ট আকার নাই; উহা যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। সুতরাং তরল পদার্থের আয়তন মাপিবার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের সহজতম উপায় হইল **পরিমাপক চোঙ** (measuring cylinder) ব্যবহার। ইহা উপর-নীচে সমান বৃত্তীয় ব্যাসবিশিষ্ট লম্বা ধরনের কাচনির্মিত এক প্রকার পাত্রবিশেষ। ইহার বৃত্তাকার ভূমির ক্ষেত্রফল জানা থাকিলে ভূমি হইতে যে-কোন নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত চোঙটির আভ্যন্তরীণ আয়তন গণনার দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায়। এই নির্দিষ্ট উচ্চতায় চোঙের বহির্গাত্রে একটি স্থায়ী দাগ কাটিয়া উহার পার্শ্বে আয়তনের উল্লিখিতভাবে লব্ধ মানের (ঘন সেন্টিমিটার, সি.সি.) সংখ্যাবাচক দাগ (বিশেষ পদ্ধতিতে) কাটা হয়। এইভাবে চোঙটির গায়ে 1, 2, 3, 4 …প্রভৃতি সি. সি. আয়তনের দাগ পর-পর কাটা থাকে। এখন, এইরূপ পরিমাপক চোঙে কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ ঢালিলে তরলের উপরিতল চোঙের যে-দাগের সহিত একই অনুভূমিক তলে থাকে, তাহা লক্ষ্য করিলেই উহার গাত্রস্থ অংশাঙ্কিত সংখ্যা হইতে পরিমেয় তরলের আয়তন সরাসরি জানা যায়। আয়তনের নিখুঁত পরিমাপের জন্য পরিমাপক চোঙের এক-এক সি. সি. অংশকে সমান 10 ভাগে ভাগ করিয়া 0·1 সি. সি. অংশও চিহ্নিত থাকে।



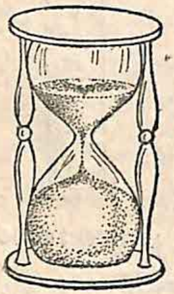
পরিমাপক চোঙ

পরিমাপক চোঙের সাহায্যে তরলের আয়তন মাপিবার সময় দুইটি বিষয়ে বিশেষ **সতর্কতা** অবলম্বন করা প্রয়োজন। চোঙে কোন তরল পদার্থ লইলে লক্ষ্য করা যায়, উহার উপরিতলটি সঠিক অনুভূমিক হয় না; সাধারণতঃ অধিকাংশ তরলের ক্ষেত্রে উহা অবতল হইয়া থাকে। তরলের এইরূপ বক্রতলের নিম্নপ্রান্তটি চোঙের যে-দাগে মিলিয়া থাকে তাহাই তরলের আয়তন সঠিকভাবে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ, বক্রতলের নিম্নপ্রান্তটির অবস্থান লক্ষ্য করিবার সময় শিক্ষার্থীর চোখ ইহার অনুভূমিক তলে রাখিতে হইবে; কিছুমাত্র উপর বা নীচ হইতে লক্ষ্য করিলে আয়তনের সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। প্যারালাক্স-জনিত এই ত্রুটি বিষয়ে স্কেল সম্পর্কীয় আলোচনায় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

D. সময় পরিমাপের কৌশল :
(Devices for Measuring Time)

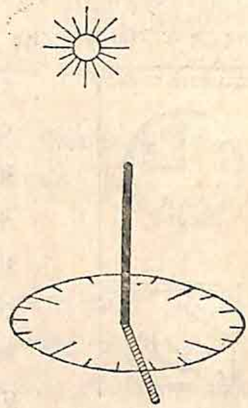
সময়ের কোন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। সময় অবিরাম বহিয়া যাইতেছে ; সময়ের গতি সম্পর্কে মানুষ প্রথম ধারণা করে দিন-রাত্রির ক্রমিক আবর্তন ও বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তন হইতে। প্রকৃতপক্ষে, দিন-রাত্রির ক্রমাবর্তনের ভিত্তিতেই সময়ের মূল একক ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদি স্থির করা হইয়াছে।

সূর্যের আপাত আবর্তন হইতে দিন রাত্রির সময়-কালই কেবল স্থির করা যায় ; কিন্তু তাহার আংশিক সময় পরিমাপের জন্য অবশ্যই কোন-না-কোন বস্তুর বাহিক পরিবর্তনের **হার** (rate) লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বিভিন্ন যুগে মানুষ এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল ; প্রাচীনকালে সময় পরিমাপের জন্য **জল-ঘড়ি** (water-clock), **বালি-ঘড়ি** (sand clock) ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সাধারণ বালি-ঘড়ির একটি চিত্র পার্শ্বে প্রদত্ত হইল ; কাচের দুইটি গোলাকার এক-মুখ-খোলা সম-মাপের পাত্র পরস্পর একটি সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে যুক্ত আছে, খোলা-মুখ দুইটি বিপরীত দিকে রহিয়াছে। এই যন্ত্রটির এক মুখ কোন সমতল স্থানে স্থাপন করিলে গোলকদ্বয় একটির উপর আর একটি লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এখন, ইহার উপরের গোলকটি শুষ্ক ও সূক্ষ্ম বালি ভরিয়া পূর্ণ করা হইত এবং সংযোজক ছিদ্রপথে এই বালি কত সময়ে কতটা, অর্থাৎ কি হারে নীচের গোলকে পড়িত, তাহা লক্ষ্য করিয়া সময়ের পরিমাপ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইত। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বালি ছিদ্রপথে নীচে পড়িতে যে সময় লাগিত তাহাকেই সময়ের মাপকাঠি বা একক ধরা হইত। মোটামুটি অনুরূপ কৌশলে জল-ঘড়িও এককালে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল।


একপ্রকার বালি ঘড়ি

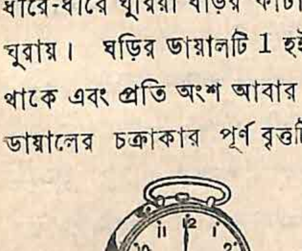
সময় পরিমাপের জন্য উপরিউক্ত ধরনের ঘড়ি ব্যতীত আকাশে সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের ভিত্তিতে একপ্রকার ঘড়ির প্রচলন ছিল, যাহাকে বলা হইত **সূর্য-ঘড়ি** (sun-dial)। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরস্পর লম্বভাবে দুইটি সরল-রেখা অঙ্কিত করিয়া উহাদের ছেদ-বিন্দুতে একটি দণ্ড উল্লম্বভাবে দণ্ডায়মান রাখা হইত। রেখা দুইটির মধ্যবর্তী সমকোণ চারিটিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সমান ভাগে অংশাঙ্কিত করিয়া একটা চক্রাকার দাগ কাটা হইত। দিবাভাগে

আকাশে সূর্যের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লম্বমান দণ্ডটির ছায়াও উক্তরূপ অংশাঙ্কিত চক্রের বিভিন্ন দাগের উপর দিয়া ক্রমশঃ সরিতে থাকে। ছায়াটি কখন কোন্ দাগের উপরে আসে তাহা লক্ষ্য করিয়া সময়ের একটা মোটামুটি পরিমাপ আন্দাজ করা হইত মাত্র।



প্রাচীনকালে প্রচলিত সূর্য-ঘড়ি

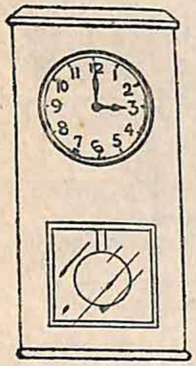
আজকাল আধুনিক যে সকল উন্নত ধরনের ঘড়ি আমরা ব্যবহার করি তাহা বহু বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে প্রস্তুত সূক্ষ্ম যন্ত্রবিশেষ। যে-কোন আধুনিক ঘড়ির মূল অংশ হইল একটি স্প্রিঙ (spring), অর্থাৎ ইস্পাত-নির্মিত একপ্রকার পাতের জড়ানো-কুণ্ডলী। ঘড়িতে দম দিবার সময় কুণ্ডলীটি গুটাইয়া ছোট হয়; অতঃপর উহা যখন নিজ প্রসারণ-বলে ধীরে-ধীরে খুলিয়া বড় হইতে থাকে তখন স্প্রিঙটির মুক্ত প্রান্তের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন প্রকার দাঁত-কাটা চাকা (toothed wheel) ধীরে-ধীরে ঘুরিয়া ঘড়ির কাঁটা দুইটিকে ডায়ালের উপরে সুনির্দিষ্ট গতিবেগে ঘুরায়। ঘড়ির ডায়ালটি 1 হইতে 12 পর্যন্ত চিহ্নিত 12-টি সমান ভাগে বিভক্ত থাকে এবং প্রতি অংশ আবার 5-টি সমান ভাগে ভাগ করা থাকে। কাজেই ডায়ালের চক্রাকার পূর্ণ বৃত্তটি $12 \times 5 = 60$-টি সমান অংশে বিভক্ত হয়।



একটি 'টাইমপিস' ঘড়ি

ঘড়ির স্প্রিঙ-এর গঠন ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন থাকে যাহাতে এক মিনিট সময়ে বড় কাঁটা, অর্থাৎ মিনিটের কাঁটাটি ডায়ালের একটি ছোট বিভাগ অতিক্রম করে এবং উহা ক্রমাগত ঘুরিয়া ডায়ালের পূর্ণ চক্রাংশ, অর্থাৎ 60-টি মিনিটের বিভাগ ঘুরিয়া আসিলে ছোট কাঁটা, অর্থাৎ ঘণ্টার কাঁটাটি পাঁচটি মিনিটের বিভাগ অতিক্রম করে, অর্থাৎ এক ঘণ্টা সময় বুঝা যায়। এইভাবে ডায়ালের উপরে কাঁটা দুইটির অবস্থান লক্ষ্য করিয়া ঘণ্টা ও মিনিটের সময়-কাল সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করা সম্ভব হয়। 'টাইমপিস' ঘড়ি, বড় **দেয়াল-ঘড়ি** (wall-clock) ও ছোট **হাত-ঘড়ি**

(wrist watch) প্রভৃতি সকল প্রকার ঘড়ির যান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলতঃ এই একইরূপ। অবশ্য হাত-ঘড়িতে অনুরূপ আর একটি পৃথক্ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেকেণ্ড পর্যন্ত সময় পরিমাপের জন্য একটি সূক্ষ্ম কাঁটা সন্নিবিষ্ট থাকে। এই সেকেণ্ডের কাঁটাটি ডায়ালের পূর্ণ এক চক্র ঘুরিলে এক মিনিট, অর্থাৎ মিনিটের বড় কাঁটাটি ডায়ালের একটি ছোট বিভাগ অতিক্রম করিয়া তাহা নির্দেশ করে। এইভাবে হাত-ঘড়িতে সময়ের সূক্ষ্মতর সেকেণ্ড বিভাগ পর্যন্ত পরিমাপ করা যায়। আবার, দেয়াল-ঘড়িতে স্প্রিঙ-এর সহিত সংলগ্ন একটি **পেণ্ডুলাম** (pendulum), বা দোলক নীচে ঝুলানো থাকে যাহা সর্বদা সমতালে, অর্থাৎ সমান সময়-কালে এদিকে-ওদিকে সমভাবে দুলিতে থাকে, যাহার ফলে স্প্রিঙ-এর সম্প্রসারণ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।



পেণ্ডুলামযুক্ত দেওয়াল ঘড়ি

আবার, কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন হইতে কত সময় লাগিল, অর্থাৎ সময়ের ব্যাপ্তিকাল (time-interval) সঠিকভাবে পরিমাপ করিবার জন্য এক বিশেষ ধরনের ঘড়ি ব্যবহৃত হয়, যাহাকে বলে **স্টপ-ওয়াচ** (stop watch), বা **বিরাম-ঘড়ি**। দৌড়-প্রতিযোগিতা, সন্তরণ-প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে সময়-কাল মাপিবার জন্য এইরূপ ঘড়ির প্রচলন আছে। ইহার যান্ত্রিক গঠন এইরূপ যে, নির্দিষ্ট কার্যটি শুরু হওয়া মাত্র উহার উপরস্থ একটি বিশেষ চাবি টিপিলেই ঘড়ির কাঁটা চলিতে থাকে, আর কার্যটি শেষ হইবা মাত্র পুনরায় চাবিটি টিপিলে সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়িটি বন্ধ হইয়া যায়। ডায়ালে কাঁটার প্রথম ও শেষ অবস্থান দেখিয়া সহজেই সময়ের ব্যাপ্তিকাল, অর্থাৎ কত সময় লাগিল তাহা জানা যাইতে পারে।

আধুনিক ঘড়ির একটি মূল অসুবিধা হইল এই যে, ইহার যন্ত্রাংশগুলি ধাতুনির্মিত এবং ধাতুমাত্রই উত্তাপে প্রসারিত ও ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং, স্প্রিঙ-এর আকার ও দোলকের দৈর্ঘ্য ঋতুভেদে স্বভাবতঃই পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহার ফলে সাধারণতঃ কোন ঘড়ি সারা বৎসর সঠিকভাবে সময় নির্দেশ করিতে পারে না। যে-কোন ঘড়ি সাধারণতঃ শীতকালে ফাস্ট (fast), অর্থাৎ দ্রুতগতি এবং গ্রীষ্মকালে স্লো (slow), অর্থাৎ মন্থরগতি হয়। আজকাল অবশ্য যান্ত্রিক কৌশলে ঘড়ির এইরূপ ফাস্ট, বা স্লো চলিবার প্রবণতা অনেকটা রোধ করা সম্ভব হইয়াছে।

পদার্থ ও শক্তি
(Matter and Energy)

পাঠ্যসূচী : পদার্থ ও শক্তি; ভর ও ওজন; শক্তির বিভিন্ন রূপ; শক্তির রূপান্তর; ভর-সংরক্ষণ ও শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র।

পদার্থ ও শক্তি (Matter and Energy) :

বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশে এই পার্থিব জড়জগৎ গঠিত। ইহাদের মধ্যে কোনটি কঠিন, কোনটি তরল, কোনটি বা অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থ। বস্তু (object, or body) মাত্রই পদার্থের (matter) সংগঠিত রূপ; পদার্থ প্রাকৃতিক, বস্তু কৃত্রিম। একাধিক বিভিন্ন বস্তু একই পদার্থে গঠিত হইতে পারে। ইট, বা হাড়ি-কলসী দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও উহাদের সংগঠক উপাদান একই পদার্থ, মাটি; লোহার বাল্‌তিই হউক, কাটারী-ছুরিই হউক, পদার্থটি লোহা। এইভাবে বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন রূপে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। অবশ্য সকল পদার্থ দেখা যায় না; যেমন, গ্যাসীয় পদার্থ বায়ু আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু নানাভাবে উহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। পক্ষান্তরে, কঠিন, বা তরল যাবতীয় পদার্থ আমরা দেখিতে, ধরিতে ও অনুভব করিতে পারি। এইভাবে পদার্থমাত্রই কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; পদার্থের ওজন থাকে এবং কিছু স্থান অধিকার করে। সুতরাং বলা যায়, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ওজনবিশিষ্ট ও স্থান অধিকারী, তাহাই **পদার্থ** (matter)।

পক্ষান্তরে, তাপ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও ইহাদের কোন পদার্থিক অস্তিত্ব নাই; ইহাদের বলা হয় **শক্তি** (energy),—পদার্থকে আশ্রয় করিয়া যাহাদের বাহ্যিক প্রকাশ লক্ষিত হয়। যেমন, তাপ আমরা দেখিতে পাই না এবং উহা ধরা-ছোঁয়াও যায় না; কিন্তু কোন উত্তপ্ত বস্তু স্পর্শ করিলে আমরা উহাতে তাপের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। অনুরূপভাবে, আমরা কখনও আলোক দেখি না, আলোকিত বস্তু দেখি; কোন উৎস হইতে আলোক নির্গত হইয়া, অথবা কোন বস্তু হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পৌঁছিলে আমাদের দর্শনের অনুভূতি জন্মে, আমরা

আলোকের উৎস, বা আলোকিত বস্তু দেখিতে পাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাপ বা আলোক স্বয়ং কোন পদার্থ নহে, কিন্তু পদার্থকে আশ্রয় করিয়া উহাদের বাহিক প্রকাশ ঘটে।

অতএব বুঝিতে হইবে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক সংযোগ ও সমাবেশে বিরাজমান ও ক্রিয়াশীল রহিয়াছে; পদার্থ ও শক্তির অস্তিত্ব-বোধ পরস্পর নির্ভরশীল।

ভর ও ওজন
(Mass and Weight)

বস্তুর ভর (Mass of a body): সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, বল প্রয়োগ না করিলে কোন বস্তুকেই স্থানচ্যুত করা যায় না; কিন্তু সকল বস্তুর ক্ষেত্রে অবশ্য সমান বল লাগে না। যেমন, একটি হাল্‌কা চেয়ার আমরা অনায়াসে ঠেলিয়া সরাইতে পারি; কিন্তু একটি ভারী আলমারি ঠেলিয়া সরানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ইহার কারণ, চেয়ারের তুলনায় আলমারিটিতে বেশী পরিমাণ পদার্থ আছে বলিয়াই উহাকে স্থানচ্যুত করিতে বেশী বল প্রয়োগ করিতে হয়। কোন বস্তু যে-পরিমাণ জড় পদার্থে গঠিত, তাহাকে বলা হয় বস্তুটির **ভর** (mass)। প্রত্যেক বস্তুরই কিছু-না-কিছু ভর আছে এবং কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ভর সর্বদা ও সর্বত্রই সুনির্দিষ্ট থাকে। উহা বস্তুর একটি নিজস্ব মূলগত ভৌত ধর্ম।

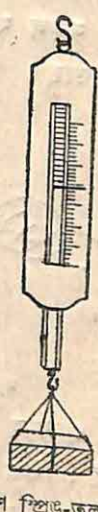
বস্তুর ওজন (Weight of a body): যে-কোন বস্তুকে মাটি হইতে কিছুটা উপরে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা মাটিতে পতিত হয়। কিন্তু কৌতূহলী মনে অবশ্যই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বস্তুটি মাটিতে পড়ে কেন? উহা তো উপরেও উঠিতে পারিত। বিজ্ঞানী নিউটন সর্বপ্রথম ইহার সঠিক কারণ নির্দেশ করিতে সক্ষম হন। তাঁহার মতে, পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণের প্রভাবে যে-কোন পার্থিব বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে আকৃষ্ট হয় এবং এই জন্যই কোন বস্তুকে উপর হইতে ছাড়িয়া দিলে তাহা সর্বদাই সবেগে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর এই নিম্নমুখী আকর্ষণ-বলকে বলা হয় বস্তুটির **ওজন** (weight)। ভর ও ওজনের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; যে বস্তুর ভর যত বেশী, তাহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ-বল, অর্থাৎ

বস্তুটির ওজনও তত বেশী হইয়া থাকে। পার্থিব যে-কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর এইরূপ নিম্নমুখী কেন্দ্রাভিসারী আকর্ষণ-বলকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অভিকর্ষ-বল (force of gravity).

ভর ও ওজনের পার্থক্য (Difference between Mass and Weight) :

সাধারণভাবে বস্তুর 'ভর' ও 'ওজন' কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়, যেন উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে। কোন বস্তুতে কি পরিমাণ জড় পদার্থ আছে, 'ভর' হইল তাহার পরিমাপ ; আর, বস্তুটির উপরে পৃথিবীর যে নিম্নমুখী আকর্ষণ-বল (অভিকর্ষ-বল, force of gravity) ক্রিয়া করে, 'ওজন' হইল তাহার পরিমাপ। সুতরাং, বস্তুর ভর ও ওজন কখনই সমার্থক হইতে পারে না ; উহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি রাশি।

বস্তুর ভর সর্বতোভাবে উহার নিজস্ব একটি মৌলিক ধর্ম ; উহা পারিপার্শ্বিক অপর কোন বিষয়ের উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নহে। কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠের যে-স্থানেই লইয়া যাওয়া হউক না কেন, উহার ভরের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে না। পক্ষান্তরে, বস্তুর ওজন অপরিবর্তনীয় ধ্রুবক রাশি নহে ; ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন, কোন উচ্চ পর্বতের পাদদেশ অপেক্ষা উহার শীর্ষে বস্তুর ওজন কিছুটা কম হয়। ইহার কারণ, পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে কোন বস্তুর দূরত্ব বৃদ্ধি পাইলে বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ স্বভাবতই হ্রাস পাইয়া থাকে। এই জন্যই উচ্চ পর্বতের উপরে যে-কোন বস্তুর ওজন সমতলভূমি অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। আবার, পৃথিবী যেহেতু সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, বরঞ্চ উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা ; সুতরাং, কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে পৃথিবীর বিষুব, বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে ওজন করিলে যে ওজন পাওয়া যাইবে, একই কারণে উত্তর, বা দক্ষিণ মেরুতে বস্তুটির ওজন তদপেক্ষা কিছু বেশী হইবে।



সাধারণ স্প্রিঙ-তুলাযন্ত্র

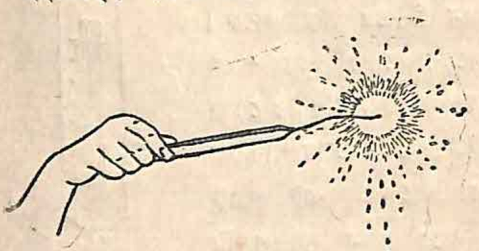
বস্তুর প্রকৃত ওজন মাপিবার সহজতম পদ্ধতি হইল **স্প্রিঙ-তুলাদণ্ড** (spring balance) ব্যবহার। উপরে প্রদত্ত চিত্র হইতে স্প্রিঙ-তুলাদণ্ডের

গঠন ও ব্যবহার মোটামুটি বুঝা যাইবে। কোন বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে এই স্প্রিঙ-তুলাদণ্ডে ওজন করিলে দেখা যায়, উহার ওজন-নির্দেশক কাঁটাটি স্কেলের উপরে সর্বত্র একই দাগে স্থির হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায়, বস্তুর ওজন কোন স্থির, বা অপরিবর্তনীয় ধর্ম নহে, স্থানভেদে একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয়। ইহার কারণ মোটামুটি পূর্বেই বলা হইয়াছে। অপরপক্ষে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ভর সাধারণ তুলাদণ্ডের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে পরিমাপ করিলে উহার ভরের কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না।

ভর-সংরক্ষণ সূত্র

(Law of Conservation of Mass)

কয়লা, বা কাঠ পোড়াইলে সামান্য ছাই পড়িয়া থাকে। ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুর তার জ্বালাইলে উজ্জ্বল আলোক ছড়ায়, সামান্য কিছু ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। মোমবাতি জলিবার সময় দৃশ্যতঃ মোম গলিয়া ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়; কেরোসিন, বা স্পিরিট জ্বালাইলে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই সকল ঘটনায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জড় পদার্থ ধ্বংস, বা বিলুপ্ত হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; দৃশ্যতঃ যাহাকে পদার্থের বিনাশ, বা বিলুপ্তি বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহা পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর মাত্র। জড় পদার্থের উৎপত্তি, বা বিনাশ ঘটিতে পারে না; এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া থাকে মাত্র।

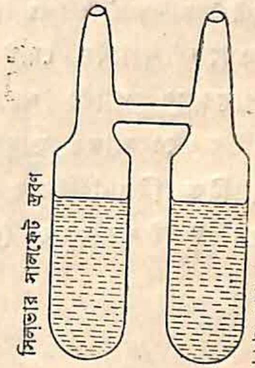


ম্যাগ্নেসিয়াম-তারের দহন

মোমের দহনকালে উহার সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে; কিন্তু উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থগুলি অদৃশ্যভাবে বায়ুতে মিশিয়া যায় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পদার্থের বিলুপ্তি, বা বিনাশ ঘটিল। কেরোসিন, স্পিরিট প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের দহনেও এই একই ব্যাপার ঘটে। পক্ষান্তরে, ম্যাগ্নেসিয়াম-তার বায়ুতে পোড়াইলে উহার সহিত বায়ুর অক্সিজেন যুক্ত হইয়া একটি নূতন (অর্থাৎ, যৌগিক) পদার্থ গঠিত হয়, ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড;

যাহা ভস্মরূপে দেখা যায়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, নির্দিষ্ট ওজনের ম্যাগ্‌নেসিয়াম অপেক্ষা তাহার ভস্মের ওজন কিছু বেশী হয়; এই বর্ধিত ওজন হইল দহনকালে ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সহিত সংযুক্ত অক্সিজেনের ওজনের সমান। এইজন্যই ম্যাগ্‌নেসিয়াম-তার বায়ুতে পোড়াইলে উৎপন্ন ধাতুভস্ম ওজনে বাড়ে; কিন্তু মূল ম্যাগ্‌নেসিয়ামের পরিমাণ একই থাকে।

বৈজ্ঞানিক ল্যাণ্ডোল্ট (Landolt) 1893 হইতে 1904 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু বিভিন্ন সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে পদার্থের **অবিনাশিতা তত্ত্ব**, বা 'ভর-সংরক্ষণ' সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করেন। তাঁহার একটি পরীক্ষা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ইংরেজী H-অক্ষরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটি কাঁচ-নলের একটি বাহুতে সিলভার সালফেট দ্রবণ ও অপর বাহুতে ফেরাস সালফেট দ্রবণ এমনভাবে লওয়া হয় যাহাতে উহারা পরস্পর মিশিয়া না যায়। দ্রবণ দুইটি সহ কাঁচ-নলটিকে একটি রাসায়নিক তুলায় সঠিকভাবে ওজন করা হয়। এখন কাঁচ-নলটিকে ঝাঁকাইয়া উহার বাহু দুইটির সংযোজক নল-পথে দ্রবণ দুইটিকে পরস্পর মিশ্রিত করিলে উহাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে; সিলভার সালফেট লবণ ধাতব সিলভার কণিকায় এবং ফেরাস সালফেট লবণ ফেরিক সালফেট লবণে পরিণত হয়। বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার পরে সর্বসমেত কাঁচ-নলটি পুনরায় ওজন করিলে দেখা যায়, ওজন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আছে, উহার কিছু-মাত্র বৃদ্ধি, বা হ্রাস ঘটে নাই। ইহা হইতে পদার্থের নিত্যতা, বা অবিনাশিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।



ল্যাণ্ডোল্টের পরীক্ষা

অবশ্য, পদার্থের অবিনশ্বরতা, বা ভর সংরক্ষণ সূত্র সম্বন্ধে ল্যাণ্ডোল্টের উল্লিখিত পরীক্ষাসিদ্ধ সিদ্ধান্তের অনেক কাল আগেই 1774 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে (Lavoisier) পদার্থের দহনের রাসায়নিক স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, **"যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র; বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে মোট পদার্থিক পরিমাণের, অর্থাৎ**

ভরের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি কখনও ঘটিতে পারে না। পার্থিব পদার্থের সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই; পদার্থ নিত্য ও অবিনশ্বর।" পদার্থের, অর্থাৎ উহার ভরের অবিনাশিতা সম্পর্কিত এই তথ্যটিকে বলা হয় **ভর-সংরক্ষণ সূত্র** (Law of Conservation of Mass)।



ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়ে (1743-94)

পৃথিবীতে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে অহরহঃ বহু বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটিতেছে। দৃশ্যতঃ কোন-কোন ক্ষেত্রে পদার্থের উৎপত্তি (অর্থাৎ, ভর-বৃদ্ধি), আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে বিনাশ (অর্থাৎ ভর-হ্রাস) ঘটে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে পদার্থের মোট ভরের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। পৃথিবীর উৎপত্তিকালে পার্থিব পদার্থসমূহের মোট যে ভর, বা পরিমাণ ছিল, সামগ্রিকভাবে আজও তাহাই আছে; বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে মাত্র। ইহাই ভর-সংরক্ষণ (conservation of mass) সূত্রের মূল তথ্য।

শক্তির বিভিন্ন রূপ

(Different Forms of Energy)

জড় পদার্থমাত্রই স্বভাবতঃ স্থির ও নিশ্চল থাকে। উহার যে-কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে কোন-না-কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। শক্তির কোন পদার্থিক অস্তিত্ব নাই; জড় পদার্থ আশ্রয় করিয়াই শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ লক্ষিত হয়। সুতরাং, জড় পদার্থের কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে সেই সঙ্গে পরোক্ষভাবে শক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায়।

শক্তি প্রধানতঃ সাত প্রকার: (i) যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy), (ii) আলোক-শক্তি (light energy), (iii) তাপ-শক্তি

(heat energy), (iv) তড়িৎ শক্তি (electrical energy), (v) রাসায়নিক শক্তি (chemical energy), (vi) শব্দ-শক্তি (sound energy) ও (vii) চৌম্বক শক্তি (magnetic energy)। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রতিক কালে পদার্থের **পারমাণবিক শক্তি** (atomic energy) বিমুক্ত করাও সম্ভব হইয়াছে। ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ভারী মৌলিক পদার্থের সংগঠক পরমাণুসমূহের নিউক্লিয়াস, বা কেন্দ্রীণ বিশেষ জটিল প্রক্রিয়ায় বিভাজিত করিলে উহাদের ভরের কিছু বিলুপ্তি ঘটে, পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া বিপুল শক্তির উদ্ভব ঘটায়। পরমাণুর অভ্যন্তরে সঞ্চিত এই ধরনের শক্তিকে বলা হয় পারমাণবিক শক্তি, বা নিউক্লীয় শক্তি (nuclear energy)। পারমাণবিক বোমার (atomic bomb) বিপুল ধ্বংস-ক্ষমতার মূলে রহিয়াছে এই শক্তি। যাহা হউক, ইহার জটিল তথ্যাদি পাঠক্রমের এই পর্যায়ে আলোচ্য নহে।

বস্তুতঃ, সকল প্রকার শক্তির মূল উৎস হইল সূর্য; সৌর-শক্তি (solar energy) বিভিন্ন জড় পদার্থে নানাভাবে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং উহা হইতে আমরা বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ায় তাপ, আলোক, রাসায়নিক ইত্যাদি বিভিন্নরূপ শক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হই।

শক্তির রূপান্তর (Transformation of Energy):

শক্তির উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার-ভেদের মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভবপর। উপযুক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে-কোন প্রকার শক্তি হইতে অপর কোন প্রকার শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত আমরা নিয়ত লক্ষ্য করি। বস্তুতঃ, প্রায় যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাতেই শক্তির কোন-না-কোন প্রকার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(i) **তাপ ও যান্ত্রিক শক্তি:** ট্রেন, স্টীমার, বা জাহাজের বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বা যন্ত্র তাপ-শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের কৌশল মাত্র। ইঞ্জিনের চুল্লীতে কয়লা, বা তৈল জাতীয় যে জ্বালানী ব্যবহার করা হয় তাহাতে নিহিত তাপ-শক্তি উহার দহনকালে বিমুক্ত ও নির্গত হয়। এই তাপের সাহায্যে বয়লারের জল বাষ্পীভূত হইয়া থাকে এবং সেই বাষ্পের চাপে স্টীমার, বা ট্রেনের ইঞ্জিন চলে। অতএব, ট্রেন, স্টীমার প্রভৃতি চলিবার গতি-শক্তি, বা

যান্ত্রিক শক্তি হইল মূলতঃ ব্যবহৃত জ্বালানীতে নিহিত তাপ-শক্তির রূপান্তর মাত্র।

দ্রুত ধাবমান ট্রেনে হঠাৎ ব্রেক কষিলে রেলের লৌহ-পাটি ও চাকার আকস্মিক দ্রুত ঘর্ষণে অনেক সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ইহা গতি-শক্তি, বা যান্ত্রিক শক্তির আলোক ও তাপ-শক্তিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত। এই ধরনের আরও নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগে কাঠে-কাঠে ঘষিয়া, বা চকমকি পাথর ঠুকিয়া অগ্নি ও আলোক উৎপাদন করা হইত। ইহাও ঘর্ষণ-জনিত যান্ত্রিক শক্তির তাপ ও আলোক-শক্তিতে রূপান্তর মাত্র।

(ii) **তড়িৎ শক্তির তাপ ও আলোক-শক্তিতে রূপান্তর ঃ** বৈদ্যুতিক বাতির তার-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিবার ফলে তার-কুণ্ডলীটি অত্যুত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং আলোক সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে তড়িৎ-শক্তি আলোক ও তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। আবার, ইলেক্‌ট্রিক হিটার, ইস্ত্রি ইত্যাদিতে সরু তারের মধ্য দিয়া শক্তিশালী তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিয়া তড়িৎ-শক্তিকে প্রধানতঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়; যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভেদে ইহাতে লক্ষ্যণীয় তেমন কিছু আলোকের উৎপত্তি ঘটে না।

(iii) **তড়িৎ-শক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর ঃ** তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ট্রেন প্রভৃতি যে চলে, তাহা কৌশলে তড়িৎ-শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র।

(iv) **পারমাণবিক শক্তির অন্য শক্তিতে রূপান্তর ঃ** অ্যাটমিক পাইল (atomic pile), বা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর (nuclear reactor) নামক জটিল যন্ত্রে বিশেষ-বিশেষ মৌল পরমাণুর নিউক্লিয়াস নিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত করিলে বিমুক্ত পারমাণবিক শক্তি মূলতঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং তাহা হইতে আবার বিশেষ কৌশলে তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায়।

শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র

(Law of Conservation of Energy)

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে নানাভাবে পারস্পরিক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন এক প্রকার শক্তি ব্যয় করিলে অপর কোন প্রকার শক্তি কি

পরিমাণে পাওয়া যায়? বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তির রূপান্তর-কালে মোট শক্তির কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না; কোন এক প্রকার শক্তি যে পরিমাণে ব্যয়িত হয়, ঠিক সেই পরিমাণ অপর কোন এক প্রকার শক্তির উদ্ভব ঘটে। অন্য কথায় বলা যায়, **"শক্তির সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই; বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে কেবল পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে মাত্র। যখনই কোন এক প্রকার শক্তির আপাত-বিলোপ ঘটে, তখনই ঠিক তুল্যাংক পরিমাণ অপর কোন এক প্রকার শক্তির উদ্ভব হয়; শক্তির মোট পরিমাণ স্থির, অপরিবর্তিত থাকে।"** এই তথ্যটিকে বলা হয় **শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র**।

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বাষ্পীয় ইঞ্জিনে তাপ-শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে, যে-পরিমাণ তাপ-শক্তি ব্যয় করা হইবে ইঞ্জিনটি হইতে ঠিক সম-পরিমাণ যান্ত্রিক কার্য পাওয়া যাইবে। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য ঠিক এইরূপ ঘটে না; ইঞ্জিনটি হইতে প্রাপ্ত যান্ত্রিক শক্তি বস্তুতঃ ব্যয়িত তাপ-শক্তি অপেক্ষা অনেকটা কম হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, ইঞ্জিনে সরবরাহকৃত শক্তির কিছু অংশ ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ-গুলির মধ্যে পারস্পরিক ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করিতে অপচয় হইয়া যায়। এই জন্যই ইঞ্জিন হইতে মোট যে কার্য পাওয়া যায় তাহা ব্যয়িত তাপ-শক্তি অপেক্ষা বেশ কিছুটা কম হইয়া থাকে। কিন্তু ইঞ্জিনে সরবরাহকৃত শক্তির কত অংশ কোন্ দিকে অযথা অপচিত হইয়া গেল, তাহার সূক্ষ্ম হিসাব করা সম্ভব হইলে অবশ্যই দেখা যাইত, মোট শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই; শক্তির যে-অংশ দৃশ্যতঃ বিলুপ্ত হইল বলিয়া মনে হয়, ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি অবশ্যই অলক্ষিতে অন্য কোন-না-কোন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই যুক্তি শক্তি-সংরক্ষণ সূত্রটির মূল তথ্যানুযায়ী বলিয়া অবশ্যই স্বীকৃত ও সমর্থনযোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদার্থের অবস্থান্তর

(Change of State of Matter)

পাঠ্যসূচী : পদার্থের অবস্থান্তর—গলন, হিমায়ন, স্ফুটন, বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন : স্ফুটনাংক ও গলনাংক এবং উহাদের উপর বিভিন্ন বাহ্যিক বিষয়ের প্রভাব ; লীন তাপ।

যাবতীয় পার্থিব পদার্থ তিনটি মাত্র ভৌতাবস্থায় থাকিতে পারে,—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা। পদার্থের স্বাভাবিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক চাপ ও তাপের সাধারণ অবস্থায় যে-কোন পদার্থ স্বভাবতঃ এই ত্রিবিধ অবস্থার কোন একটি অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত কৌশলে চাপ ও তাপের পরিবর্তন ঘটাইয়া পদার্থকে যে-কোন একটি অবস্থা হইতে অপর কোন অবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। পাঠ্যসূচী অনুসারে পদার্থের এইরূপ ত্রিবিধ অবস্থার পারস্পরিক রূপান্তর-করণের বিবিধ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াদি নিম্নে আলোচিত হইল।

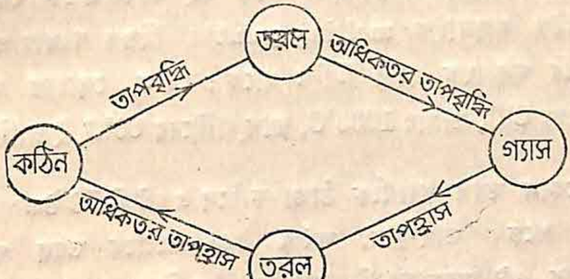
পদার্থের অবস্থান্তর

(Change of State of Matter)

চাপ প্রয়োগ করিলে সকল পদার্থেরই আয়তন কিছু-না-কিছু হ্রাস পায়। কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে চাপের প্রভাবে আয়তন-হ্রাস বিশেষ লক্ষ্যণীয় হয় না। কিন্তু যথোচিত চাপ বৃদ্ধি করিলে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন যথেষ্ট কমে ; এমন কি, উপযুক্ত চাপে কোন-কোন গ্যাসকে তরলে পরিণত করাও সম্ভব হয়। অবশ্য কেবল চাপ বৃদ্ধি করিয়া কোন তরল পদার্থকে কঠিন পদার্থে পরিণত করা বাস্তবে সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ, পদার্থের অবস্থান্তরে চাপের যথেষ্ট প্রভাব থাকিলেও কার্যতঃ কেবলমাত্র চাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে সকল পদার্থের অবস্থান্তর ঘটানো যায় না।

পদার্থের ভৌত অবস্থান্তর ঘটাইবার কার্যকরী উপায় হইল তাহার **তাপ-মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি**। যে-কোন কঠিন পদার্থকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে তাহা গলিয়া তরল হয়। উষ্ণতা যথোপযুক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করিতে পারিলে ঐ তরলকে

আবার গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করাও সম্ভব হইতে পারে। পক্ষান্তরে, এই একই যুক্তিতে আবার গ্যাসীয় পদার্থের তাপমাত্রা যথেষ্ট হ্রাস করিলে তাহা আয়তনে কমিয়া তরলে পরিণত হয়, তাপমাত্রা আরও কমাইলে তরল পদার্থ কঠিন অবস্থা ধারণ করে। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পদার্থের এইরূপ অবস্থান্তর নিম্নে প্রদত্ত ছকটি হইতে সহজেই বুঝা যায়ঃ



তাপের প্রভাবে পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থান্তর

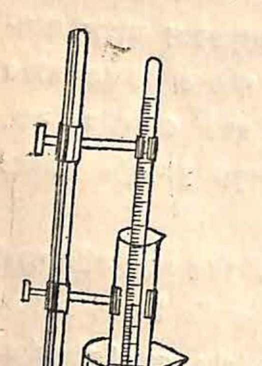
পদার্থের অবস্থান্তরের এই তথ্য জলের ক্ষেত্রে সহজেই প্রমাণিত হয়। জল কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় তিনটি অবস্থায়ই থাকিতে পারে। একখণ্ড বরফ উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে বায়ুমণ্ডলীয় সাধারণ উষ্ণতায়ই তাহা ধীরে ধীরে গলিয়া জলে পরিণত হয়; এই জল আরও উত্তপ্ত করিলে বাষ্পে পরিণত হইয়া উবিয়া যায়। কৌশলে এই বাষ্প ধরিয়া রাখিয়া যথোপযুক্তরূপে তাহার তাপ-হ্রাস, অর্থাৎ ঠাণ্ডা করিলে তাহা আবার জলে পরিণত হয় এবং আরও ঠাণ্ডা করিলে জল জমিয়া কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়। কেবল জল নহে, বস্তুতঃ যে-কোন পদার্থের ক্ষেত্রেই তাপমাত্রার যথোপযুক্ত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাইতে পারিলে তাহার ভৌত অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে।

পদার্থের অবস্থান্তরের ইহা একটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সকল কঠিন পদার্থ উত্তাপে গলে না; যেমন—কাঠ, কাগজ, কয়লা প্রভৃতি উত্তাপে তরল হয় না, পুড়িয়া যায়। ইহা পদার্থের ভৌত অবস্থান্তর (change of physical state) নহে, রাসায়নিক রূপান্তর (chemical change); বিজ্ঞানের বিচারে যাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। আবার, কর্পূর, আয়োডিন ইত্যাদি কোন-কোন কঠিন পদার্থ উত্তাপের প্রভাবে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, এবং এই গ্যাস শীতল করিলে উহা আবার সরাসরি কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ঊর্ধ্বপাতন (sublimation)।

গলন ও হিমায়ন (Melting and Freezing) :

উপযুক্ত উত্তাপে সাধারণতঃ সকল কঠিন পদার্থই গলিয়া তরল হয়। পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হইবার এই ভৌত পরিবর্তন-ক্রিয়াকে বলা হয় **গলন** (melting, or fusion)। পদার্থটি বিশুদ্ধ হইলে তাহা সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গলে ; এই তাপমাত্রাকে বলা হয় ঐ কঠিন পদার্থটির **গলনাংক** (melting point)। বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেকটি কঠিন পদার্থের গলনাংক সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে ; যেমন, লোহার গলনাংক 1539°C বরফের 0°C, তামার 1033°C, ন্যাপ্‌থালিনের 80°C, ইত্যাদি।

আবার, কোন তরল পদার্থকে ঠাণ্ডা করিলে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তাহা কঠিন হইয়া পড়ে। তাপ-হ্রাস, অর্থাৎ শৈত্য-প্রয়োগে তরল পদার্থকে কঠিন করিবার এই অবস্থান্তর-ক্রিয়াকে বলা হয় **হিমায়ন** (freezing), বা **কঠিনীভবন** (solidification)। যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থ জমিয়া কঠিন হয়. তাহাকে বলে তরলটির **হিমাংক** (freezing point)। যে-কোন বিশুদ্ধ তরল পদার্থেরই কোন একটি সুনির্দিষ্ট হিমাংক থাকে ; যেমন, পাতিত বিশুদ্ধ জলের হিমাংক হইল 0°C, অর্থাৎ 0°C তাপমাত্রায় জল জমিয়া কঠিন বরফে পরিণত হয়।



জলের হিমাংক ও বরফের গলনাংক নির্ণয়

লক্ষ্য করা যায়, **যে-কোন বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাংক ও হিমাংক সর্বদা একই হইয়া থাকে।** নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্যটির সত্যতা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

পরীক্ষা : একটি পরীক্ষা-নলে কিছু বিশুদ্ধ (পাতিত) জল লইয়া তাহার মধ্যে একটি সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারের পারদ-পূর্ণ বাল্বটি নিমজ্জিত অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। এখন একটি বীকারে রক্ষিত বরফ-কুচি ও লবণের মিশ্রণের মধ্যে থার্মোমিটারসহ পরীক্ষা-নলটি দণ্ডায়মান রাখা হইল। বরফ ও লবণের মিশ্রণ বিশেষ ঠাণ্ডা হয়, উহার উষ্ণতা হয় প্রায়—20°C ; এইরূপ

মিশ্রণকে বলে **হিম-মিশ্রণ** (freezing mixture)। কাজেই ইহার সংস্পর্শে পরীক্ষা-নলের জল ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া এক সময় জমিয়া বরফে পরিণত হইতে থাকিবে; এই সময় থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখা যাইবে 0°C (সেণ্টিগ্রেড)। ইহা হইতে বুঝা যায়, জলের হিমাংক হইল 0°C। পরীক্ষা-নলের সম্পূর্ণ জল বরফে পরিণত হইলে থার্মোমিটারসহ পরীক্ষা-নলটি হিম-মিশ্রণ হইতে তুলিয়া বায়ু মধ্যে রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতায় পরীক্ষা-নলের বরফ গলিয়া পুনরায় জলে পরিণত হইতে থাকিবে; কিন্তু থার্মোমিটারে তাপমাত্রা পূর্বের ন্যায় 0°C-ই দেখা যাইবে। অতএব, জলের হিমাংক ও বরফের গলনাংক যে একই, তাহা প্রমাণিত হইল।

স্ফুটন ও ঘনীভবন (Boiling and Condensation):

কোন তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে উহার উষ্ণতা ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং তরলের উপরিতল হইতে ধীরে-ধীরে বাষ্প উত্থিত হয়। ক্রমে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া পরিশেষে তরলটি ফুটিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং উহার সকল অংশ হইতে দ্রুত গতিতে বাষ্প উঠিতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় তরলের **স্ফুটন** (boiling)। পক্ষান্তরে, কোন পদার্থের বাষ্পকে উপযুক্তরূপে শীতল করিলে তাহা ঘনীভূত হইয়া তরলে পরিণত হয়; এই প্রক্রিয়াকে বলে **ঘনীভবন** (condensation)।

কোন তরল পদার্থ যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়, তাহাকে বলে ঐ তরলের **স্ফুটনাংক** (boiling point)। বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেক তরলের স্ফুটনাংক সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে; যেমন, বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাংক 100°C, পারদের 356·7°C, গ্লিসারিনের 290°C ইত্যাদি। আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল, যে উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়, বাষ্পটিও আবার সেই একই তাপমাত্রায় ঘনীভূত হইয়া তরলে রূপান্তরিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ, তরল হইতে বাষ্প, অথবা বাষ্প হইতে তরলে রূপান্তর-ক্রিয়া একই তাপমাত্রায় ঘটিয়া থাকে। স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জল 100°C তাপমাত্রায় ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয় এবং জলীয় বাষ্পও ঐ একই তাপমাত্রায় ঘনীভূত হইয়া পুনরায় জলে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

বাষ্পায়ন (Evaporation):

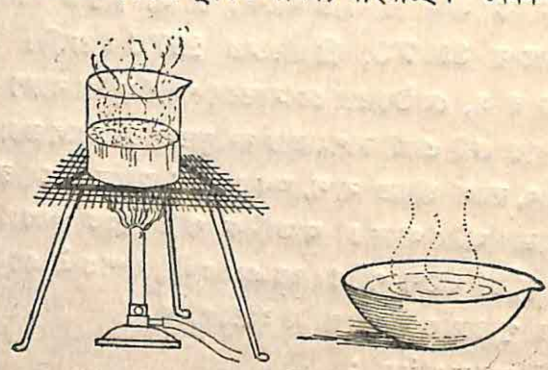
কোন তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করিবার জন্য উহাকে স্ফুটনাংক

তাপমাত্রায় উত্তপ্ত না করিলেও চলে। প্রকৃতপক্ষে, যে-কোন তরল পদার্থ স্বাভাবিক উষ্ণতায়ই অল্পাধিক মাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। যেমন, কোন উন্মুক্ত পাত্রে কিছু জল রাখিলে দেখা যায়, পাত্রে জলের পরিমাণ ধীরে-ধীরে কমিতে থাকে; অর্থাৎ জল ধীরে-ধীরে বাষ্পীভূত হইয়া উবিয়া যায়। জলের স্ফুটনাংক তাপমাত্রা হইল 100°C ; কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্ফুটনাংকের অনেক নিম্নে স্বাভাবিক উষ্ণতায়ই জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যে-কোন তরলের এইরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাষ্পে রূপান্তরিত হইবার প্রক্রিয়াকে বলা হয় **বাষ্পায়ন** (evaporation)।

একই উষ্ণতায় সকল তরল পদার্থ সমান মাত্রায় বাষ্পায়িত হয় না ; যেমন, সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে লক্ষ্য করা যায়, ইথাইল অ্যালকোহল, বা ইথার উন্মুক্ত স্থানে রাখিবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উবিয়া যায়, কিন্তু জল উবিয়া যাইতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। ইহার কারণ, ইথাইল অ্যালকোহল ও ইথারের স্ফুটনাংক যথাক্রমে 78°C ও 34·5°C ; এই তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাংক (100°C) অপেক্ষা অনেক কম বলিয়াই অ্যালকোহল ও ইথার জল অপেক্ষা অনেক দ্রুত বাষ্পায়িত হইয়া যায়। যে তরল পদার্থের স্ফুটনাংক যত কম, স্বাভাবিক উষ্ণতায় তাহার বাষ্পায়নের হার তত বেশী, এবং তাহাকে তত বেশী **উদ্বায়ী** (volatile) পদার্থ বলা হয়।

বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের পার্থক্য :
(Difference between Evaporation and Boiling)

বাষ্পায়ন ও স্ফুটন উভয় প্রক্রিয়াতেই তরল পদার্থ বাষ্পে রূপান্তরিত হইলেও উহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মুলগত পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন—



তরল পদার্থের স্ফুটন ও বাষ্পায়ন

(i) স্ফুটন-ক্রিয়া ঘটে কোন সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (স্ফুটনাংক) ; কিন্তু বাষ্পায়নের জন্য কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না, উহা যে-কোন উষ্ণতায়ই অল্পাধিক মাত্রায় ঘটিয়া থাকে। কোন তরলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হইলে উহার বাষ্পায়নের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে যথেষ্ট উত্তপ্ত হইয়া স্ফুটনাংক তাপমাত্রায় পৌঁছিলে তরলটি ফুটিতে আরম্ভ করে।

(ii) স্ফুটনের তুলনায় বাষ্পায়ন অপেক্ষাকৃত মন্থরগতি প্রক্রিয়া।

(iii) বাষ্পায়ন-কালে তরলের কেবলমাত্র উপরিতল হইতে বাষ্প নির্গত হয়, কিন্তু স্ফুটন-ক্রিয়ায় তরলের সকল অংশ হইতেই বাষ্প উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং উপরিতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করিলে তরলের বাষ্পায়নের হার বৃদ্ধি পায়।

লীন তাপ
(Latent Heat)

সাধারণতঃ কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু পদার্থের অবস্থান্তর-কালে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। ধরা যাক, বরফ ও জলের একটি মিশ্রণকে ধীরে-ধীরে উত্তপ্ত করা হইতেছে। এই মিশ্রণে একটি থার্মোমিটার নিমজ্জিত রাখিলে দেখা যাইবে, মিশ্রণে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও উহার তাপমাত্রা কিন্তু বৃদ্ধি পায় না। বরফ গলিয়া ক্রমে জলে পরিণত হইতেছে, কিন্তু সম্যক বরফ জলে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত থার্মোমিটারে মিশ্রণটির তাপমাত্রা বরফের গলনাংক তাপমাত্রায় (O°C) স্থির অপরিবর্তিত থাকে, দেখা যায়। অবশ্য বরফ সম্পূর্ণভাবে গলিয়া যাইবার পরে ঐ জলের তাপমাত্রা আবার স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই পরীক্ষা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, মিশ্রণে যে-তাপ পূর্বে সরবরাহ করা হইয়াছিল তাহা বরফকে গলাইয়া জলে রূপান্তর-ক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে ব্যয়িত হইয়াছে। অনুরূপভাবে, জলকে উহার স্ফুটনাংক তাপমাত্রায় (100°C) উত্তপ্ত করিয়া যখন বাষ্পে অবস্থান্তরিত করা হয়, তখন দেখা যায়, সম্যক জল বাষ্পে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় না, 100°C উষ্ণতায়ই স্থির থাকে। কেবল জলের ক্ষেত্রেই নহে, যে-কোন পদার্থের অবস্থান্তরের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

স্থির তাপমাত্রায় কোন কঠিন পদার্থ তরলে, অথবা কোন তরল পদার্থ

বাষ্পে রূপান্তরিত হইবার সময় বাহির হইতে যে পরিমাণ তাপ প্রযুক্ত হয়, তাহা ঐ অবস্থান্তরিত পদার্থে সঞ্চিত হইয়া থাকে; এই তাপকে বলা হয় **লীন তাপ** (latent heat)। থার্মোমিটারে এই তাপের কোনরূপ প্রভাব ধরা পড়ে না; উহা সম্পূর্ণভাবে পদার্থের ভৌত অবস্থান্তর-ক্রিয়ায় ব্যয়িত হয় এবং অবস্থান্তরিত পদার্থে লুপ্ত, বা লীন (latent) হইয়া থাকে। লীন তাপ দুই প্রকার; যেমন—(i) একক ভর পরিমাণ কোন কঠিন পদার্থকে উহার স্থির গলনাংক তাপমাত্রায় বিগলিত করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলা হয় **গলনের লীন তাপ** (latent heat of fusion), এবং (ii) একক ভর পরিমাণ কোন তরল পদার্থকে স্থির স্ফুটনাংক তাপমাত্রায় বাষ্পে রূপান্তরিত করিবার জন্য যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলে **বাষ্পীভবনের লীন তাপ** (latent heat of vaporisation)। বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে এইরূপ লীন তাপের মান বিভিন্ন হইয়া থাকে। 'বরফ গলনের লীন তাপ 80 ক্যালোরি/গ্র্যাম'—ইহার অর্থ স্থির গলনাংক তাপমাত্রায় (অর্থাৎ 0°C-এ) প্রতি গ্র্যাম বরফ গলনে 80 ক্যালোরি তাপ শোষিত হয়।

কঠিন পদার্থের গলন-কালে যতটা তাপ অবস্থান্তরিত তরলে লীন হইয়া থাকে, সেই তরল পদার্থের হিমায়ন-কালেও উহা হইতে ঠিক সেই পরিমাণ তাপ হ্রাস করিলে তবেই তরলটি কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে; অবস্থান্তর-ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উহার তাপমাত্রার কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। আবার, কোন তরলে যে-পরিমাণ লীন তাপ সরবরাহ করিলে তাহা বাষ্পে পরিণত হয়, বাষ্পটিকে ঘনীভূত করিয়া তরলে রূপান্তরিত করিতে হইলে উহার ঠিক সেই পরিমাণ তাপ হ্রাস করা প্রয়োজন হয়; অবশ্য এইরূপ তাপ-হ্রাসের ফলে দৃশ্যতঃ তাপমাত্রা কিছুমাত্র হ্রাস পায় না।

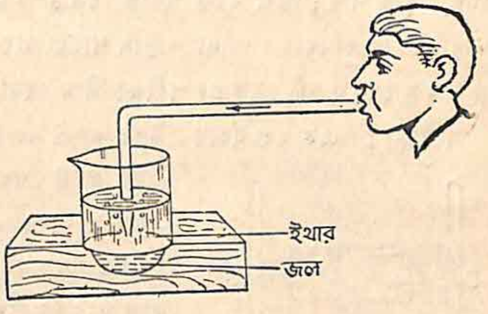
বাষ্পায়নে তাপ-হ্রাস (Cooling by Evaporation):

বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় তরল হইতে বাষ্পে অবস্থান্তরের জন্য অবশ্যই কিছু পরিমাণ লীন তাপ ব্যয়িত হয় এবং তরলটি ও উহার পারিপার্শ্বিক হইতে এই তাপ সংগৃহীত, বা শোষিত হইয়া থাকে, যাহার ফলে অবস্থান্তর-ক্রিয়া সম্ভব হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ধাতু অপেক্ষা মাটির তৈয়ারী কুঁজার জল গ্রীষ্মকালে বেশী ঠাণ্ডা হয়; ইহার কারণ, মাটির কুঁজার গাত্রের অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া জল ধীরে-ধীরে চোঁয়াইয়া বাহিরে আসে এবং বাষ্পায়িত হইতে থাকে। এই অবস্থান্তরের জন্য যে 'লীন তাপ' প্রয়োজন হয়, জল হইতে

তাহা শোষিত হয় বলিয়াই কুঁজার জল যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। ধাতু-নির্মিত পাত্রের গাত্রে এইরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র না থাকায় জল ঐরূপভাবে বাষ্পীভূত হইতে পারে না বলিয়া তাহা বিশেষ ঠাণ্ডা হয় না। লীন তাপের এই তথ্যটি একটি পরীক্ষার সাহায্যে সহজেই বুঝা যাইবে।

পরীক্ষা : একটি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যস্থলে ছোট একটি অগভীর গর্তে কিছু পরিমাণ জল লইয়া তাহার উপর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইথার-পূর্ণ একটি বীকার রাখা হইল। একটি সরু কাচ-নলের এক প্রান্ত ইথারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অপর প্রান্তে মুখ দিয়া ফুঁ দিলে ইথারের মধ্য দিয়া বুদ্‌বুদ্‌ আকারে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। এইভাবে আলোড়ন সৃষ্টির ফলে ইথার অতি দ্রুত বাষ্পায়িত হয়। তরল হইতে বাষ্পে এইরূপ রূপান্তরের জন্য যে লীন তাপ প্রয়োজন হয়, ইথার নিজেই তাহা সরবরাহ করে এবং উহার তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পাইয়া 0°C-এর যথেষ্ট নীচে নামিয়া যায়। ইহার ফলে বীকারের নীচের জলও দ্রুত ঠাণ্ডা হইতে থাকে এবং উহার তাপমাত্রা 0°C-এ পৌঁছাইবা মাত্র সেই জল হিমায়িত হইয়া বরফে পরিণত হয়।



ইথারের বাষ্পায়নে 0°C শৈত্য উৎপাদন

পদার্থের অবস্থান্তর-তাপমাত্রার নির্ধারক বিষয়সমূহ

(Factors affecting Change of State of Matter)

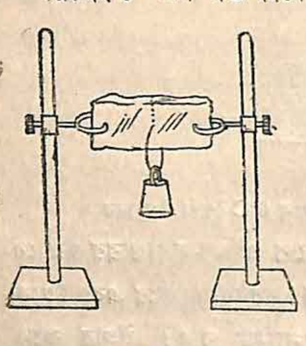
কোন পদার্থ যে তাপমাত্রায় এক ভৌতাবস্থা হইতে অপর কোন অবস্থায় রূপান্তরিত হয় (অর্থাৎ, কঠিন পদার্থের গলনাংক ও তরল পদার্থের স্ফুটনাংক), তাহা প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল ; যেমন—

(i) পদার্থের বিশুদ্ধতা (Purity) **:** বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেক কঠিন পদার্থের কোন একটি সুনির্দিষ্ট গলনাংক থাকে। কোন পদার্থে কিছু **অবিশুদ্ধি** (impurities) মিশ্রিত থাকিলে উহার গলনাংক **হ্রাস** পায়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ পদার্থ অপেক্ষা অবিশুদ্ধ পদার্থ সর্বদা কিছু কম উষ্ণতায় বিগলিত হয়। সাধারণতঃ কোন কঠিন পদার্থের গলনাংক নির্ণয় করিয়া মোটামুটিভাবে উহার

বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আবার, কঠিন পদার্থের গলনাংকের ন্যায় প্রত্যেক বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাংকও সর্বদা সুনির্দিষ্ট ; কোন তরলে কিছু **অবিশুদ্ধি** দ্রবীভূত থাকিলে উহার স্ফুটনাংক **বৃদ্ধি** পাইয়া থাকে। কোন তরল পদার্থ বিশুদ্ধ কি-না তাহা মোটামুটিভাবে জানিবার জন্য প্রায়শঃই উহার স্ফুটনাংক নির্ণয় করা হয়।

(ii) চাপ (Pressure) **:** চাপ বৃদ্ধি করিলে অধিকাংশ কঠিন পদার্থের গলনাংক বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু বরফ ইহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, অর্থাৎ চাপ-বৃদ্ধির ফলে বরফের গলনাংক হ্রাস পাইয়া থাকে। চাপ প্রয়োগে বরফের গলনাংক হ্রাসের একটি চমকপ্রদ পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা : এক খণ্ড বরফের উপর একটি সরু ধাতব তার জড়াইয়া উহার প্রান্ত দুইটি পরস্পর বাঁধিয়া উহা হইতে একটি ভারী ওজন ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। বরফের উপর এইভাবে চাপ প্রয়োগ করিবার ফলে তারটির সংস্পর্শস্থিত বরফের গলনাংক স্থানীয়ভাবে 0°C অপেক্ষা হ্রাস পায়। কিন্তু বরফ-খণ্ডটি যে তাপমাত্রাতে আছে (অর্থাৎ 0°C) তাহা যেহেতু গলনাংকের এই নূতন মান অপেক্ষা বেশী, সুতরাং তারের সংলগ্ন বরফ গলিয়া জলে পরিণত হয় এবং তারটি সেই জলের মধ্য দিয়া নীচে নামে। এখন, তারটি বরফ কাটিয়া নীচে নামিয়া গেলে জলের উপর সেই অতিরিক্ত চাপ আর ক্রিয়া করে না এবং বরফের গলনাংক (অর্থাৎ, জলের হিমাংক) পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া 0°C-এ পৌঁছায় ; ইহার ফলে জল পুনরায় হিমায়িত হইয়া বরফে পরিণত হয়। তারটি এইভাবে বরফের চাঁইটির মধ্য দিয়া ধীরে-ধীরে নীচে নামে, কিন্তু বরফ-খণ্ডটি পূর্বের ন্যায় অবিভক্তই থাকে।



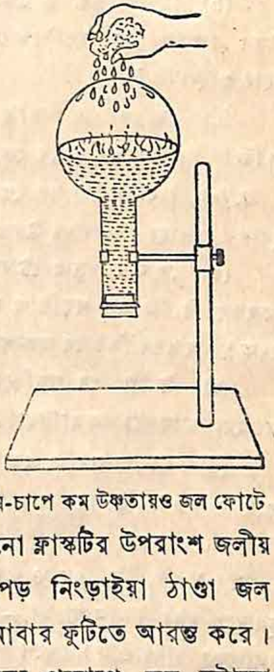
তাপ প্রয়োগে বরফ গলে

কঠিন পদার্থের গলনাংকের ন্যায় যে-কোন তরল পদার্থের স্ফুটনাংকও উহার উপরিস্থিত চাপের উপর নির্ভরশীল। কোন তরলের নিজস্ব বাষ্পীয় চাপ ও সংলগ্ন বায়ুর চাপ পরস্পর সমান হইলে তবেই তরলটি ফোটে। সুতরাং স্থানীয় বায়ুচাপ কম-বেশী হইলে তরলের স্ফুটনাংকও তদনুযায়ী কমে-বাড়ে। সমতল ভূমিতে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জল 100°C উষ্ণতায় ফোটে,

কিন্তু দার্জিলিঙ, সিমলা প্রভৃতি পার্বত্য উচ্চভূমিতে বায়ুচাপ কম বলিয়া সেখানে 100°C অপেক্ষা কম উষ্ণতায়ই জল ফুটিতে থাকে, অর্থাৎ জলের স্ফুটনাংক হ্রাস পায়। অপরপক্ষে, ভূ-গর্ভে খনির মধ্যে বায়ুচাপ বেশী, কাজেই সেখানে জলের স্ফুটনাংক বেশী হয়, অর্থাৎ জল ফুটিতে অধিক উষ্ণতা লাগে।

কোন তরলের উপরিস্থিত চাপ কমিলে যে তাহার স্ফুটনাংক কমে, তাহার একটি চমকপ্রদ পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা ঃ একটি কাচের ফ্লাস্কে প্রায় অর্ধাংশ পরিমাণ জল পূর্ণ করিয়া বুনসেন দীপে উত্তপ্ত করিলে 100°C উষ্ণতায় যথানিয়মে জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইতে থাকিবে এবং এই বাষ্পের চাপে ফ্লাস্কের ভিতরের বায়ু ক্রমে বাহির হইয়া যাইবে। সম্যক বায়ু বাহির হইয়া ফ্লাস্কটির অভ্যন্তরভাগ যখন শুধু জলীয় বাষ্পে পূর্ণ হয়, তখন দীপ সরাইয়া লইয়া ফ্লাস্কটির মুখে ছিপি আঁটিয়া উহাকে উল্টাইয়া একটি বন্ধনীর সাহায্যে নিম্নমুখী করিয়া রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় উষ্ণতা 100°C অপেক্ষা কমিবার ফলে ফ্লাস্কের জল আর ফোটে না; কিন্তু উল্টানো ফ্লাস্কটির উপরাংশ জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে। এখন জলসিক্ত তুলা, বা কাপড় নিংড়াইয়া ঠাণ্ডা জল ফ্লাস্কটির উপর দিলে ভিতরের জল সঙ্গে-সঙ্গে আবার ফুটিতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ উত্তাপে জল ফোটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে শৈত্য প্রয়োগে জল ফুটানো সম্ভব হইল। ইহার কারণ, ফ্লাস্কটির উপর জল দিয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিবার ফলে ভিতরে আবদ্ধ জলীয় বাষ্পের কতকাংশ ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয়; কাজেই ফ্লাস্কের জলের উপরিস্থিত বাষ্পীয় চাপ হ্রাস পাইবার ফলে জলের স্ফুটনাংক যথেষ্ট কমিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত জলই পুনরায় ফুটিতে আরম্ভ করে।



নিম্ন-চাপে কম উষ্ণতায়ও জল ফোটে

কেবল জলই নহে, যে-কোন তরলের স্ফুটনাংক তাহার পারিপার্শ্বিক চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী কমে-বাড়ে। অবশ্য ভূ-পৃষ্ঠের স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোন তরল যে-উষ্ণতায় ফোটে তাহাকেই সাধারণতঃ ঐ তরলের স্ফুটনাংক (boiling point) বলা হয়।

প্রথম অধ্যায় ঃ অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ পরিমাপের একক ও পদ্ধতি

1. (a) পরিমাপের 'একক' কাহাকে বলে এবং তাহার সার্থকতা কি? মৌলিক একক ও লব্ধ এককের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর; কোন্‌-কোন্‌ রাশি পরিমাপে ইহাদের প্রয়োজন হয়?

(b) সি. জি. এস. ও এফ. পি. এস. পদ্ধতির মৌলিক, বা প্রাথমিক এককগুলির নাম লিখ। সি. জি. এস. পদ্ধতিকে মেট্রিক পদ্ধতি বলা হয় কেন এবং কোন রাশি পরিমাপে ইহার সুবিধা কি?

(c) এম. কে. এস. পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় কোন্‌ ক্ষেত্রে ও কেন? ইহার সুবিধাই বা কি? সি. জি. এস. ও এম. কে. এস. পদ্ধতির মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ আছে কি?

2. (a) দৈর্ঘ্য পরিমাপের স্কেল ব্যবহারে প্যারালাক্স, বা দৃষ্টিবৈষম্য-জনিত ত্রুটি বলিতে কি বুঝায় এবং তাহা সংশোধনের উপায় কি, চিত্র সহযোগে বুঝাও।

(b) তোমার পড়ার টেবিলখানার উপরিতলের ক্ষেত্রফল ও তোমাদের খেলার মাঠের ক্ষেত্রফল সি. জি. এস পদ্ধতিতে মাপিতে দৈর্ঘ্যের কোন্‌-কোন্‌ একক ব্যবহার করা সুবিধা-জনক? আয়তন কিভাবে প্রকাশ করা হয়?

(c) সি. জি. এস পদ্ধতিতে তরল পদার্থের আয়তনের একক কি? মাপনী-চোঙের সাহায্যে খানিকটা জল মাপিবার কৌশল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(d) এক গ্যালন ও এক লিটার দুধের আয়তনিক পরিমাপের সম্বন্ধ কি? —কোন্‌টি বেশি ও কত? মিটারের দরে জামার কাপড় কিনিয়া গজের মাপে লইলে ঠকিবে, না জিতিবে এবং কতটা?

3. (a) সি. জি. এস ও এফ. পি. এস পদ্ধতিতে বস্তুর ভরের একক কি? সাধারণ তুলাদণ্ডে বস্তুর কি মাপা হয়,—ভর, না ওজন? ভরের সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য রাসায়নিক তুলাদণ্ডের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(b) 12 টাকা কিলোগ্রাম দরের চা ও 7 টাকা পাউণ্ড দরের চায়ের মধ্যে কোন্‌টি সস্তা? ঘণ্টায় 30 মাইল ও ঘণ্টায় 30 কিলোমিটার বেগে চলমান দুইটি ট্রেনের মধ্যে কোন্‌টি দ্রুততর চলে?

(c) একই বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠে, পর্বতশিখরে ও খনিগর্ভে সাধারণ তুলাদণ্ডে মাপিলে উহার ভরের কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে কি?

(d) যে-কোন পরিমাপ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য ও ভরের প্রমাণ এককের বিভিন্ন ভগ্নাংশিক ও গুণিতক একক ব্যবহার করা হয় কেন? এক কিলোগ্রাম কত সেন্টিগ্র্যামের সমান? এক কুইন্টাল = কত কিলোগ্র্যাম?

4. (a) সময় পরিমাপের আধুনিক ঘড়ি আবিষ্কারের পূর্বে কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বিত হইত? প্রাচীন কালের সূর্য-ঘড়ির কার্যকারিতা সংক্ষেপে চিত্র সহযোগে বুঝাও ও ত্রুটি নির্দেশ কর।

(b) আধুনিক ঘড়ির মিনিটের (বড়) কাঁটাটি ঘণ্টার (ছোট) কাঁটাটির অপেক্ষা কতগুণ দ্রুত ঘোরে? সময় পরিমাপের প্রমাণ একক সেকেণ্ড, ইহার স্থিতিকাল কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

(c) গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে ঘড়ি 'ফাষ্ট' না 'স্লো' চলে? সারা পৃথিবীতে 'প্রমাণ সময়' কি ও কিভাবে স্থির করা হইয়াছে?

(d) সন্তরণ, বা দৌড় প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ধারণের জন্য কোন্ ধরনের ঘড়ি ব্যবহার করা হয় এবং উহার বৈশিষ্ট্য কি?

5. সঠিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ :

(a) দুইটি রেলষ্টেশনের মধ্যবর্তী দূরত্ব সেন্টিমিটার, না মিটার এককে পরিমাপ করা সুবিধাজনক?

(b) পেট্রোলের পরিমাপ সাধারণতঃ করা হয় কোন্ এককে, এবং উহা মৌলিক একক, না লব্ধ একক?

(c) দুই টাকা কিলোগ্রাম দরের চাল ও এক টাকা পাউণ্ড দরের চালের মধ্যে কোন্‌টি সস্তা?

(d) দৈর্ঘ্য, আয়তন, ভর ও ক্ষেত্রফলের এককের মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক, কোন্‌টি লব্ধ একক?

(e) এক ইঞ্চি কত সেন্টিমিটারের সমান? কাপড়ের গজ ও মিটার মাপের কোন্‌টি বৃহত্তর এবং কতটা?

(f) মাপনী-চোঙে জল, বা পারদ (মারকারি) লইলে উপরিতলটি কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পদার্থ ও শক্তি

1. (a) কোন বস্তুর ভর ও ওজনের পার্থক্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। পদার্থের ওজন কোন্ শক্তির উপরে নির্ভরশীল? বস্তুর ভর নির্দিষ্ট, ওজন পরিবর্তনশীল কেন?

(b) কোন বস্তু কলিকাতা হইতে দার্জিলিং লইয়া গেলে উহার ওজনের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিবে, যুক্তি সহকারে বুঝাইয়া দাও। বস্তুর সঠিক ওজন কোন্ তুলাযন্ত্রে নির্ণীত হয়? সাধারণ তুলাযন্ত্রে বস্তুর ভর, না ওজন মাপা হয়?

(c) খনিগর্ভের এক টন কয়লা উপরে তুলিলে উহা ওজনে বাড়ে, না কমে, এবং কেন?

2. (a) পদার্থের ভর-সংরক্ষণ, বা অবিনাশিতা সূত্রটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর এবং ইহার সমর্থনে একটি পরীক্ষার সাহায্যে পদার্থের নিত্যতা প্রমাণ কর।

(b) ম্যাগ্নেসিয়াম তার জ্বালাইলে উৎপন্ন ভস্ম ওজনে বাড়ে, কিন্তু মোমবাতি জ্বলিয়া ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ওজনে কমে; উভয় ক্ষেত্রেই পদার্থের নিত্যতা-সূত্র কিভাবে প্রযোজ্য, যুক্তি সহকারে বুঝাইয়া দাও।

(c) 'পদার্থের সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই' — একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে উক্তিটির সত্যতা প্রমাণ কর।

(d) নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিতে ভর-সংরক্ষণ সূত্র প্রযোজ্য কি-না যুক্তি সহকারে বুঝাও:

(i) কয়লা, বা কাঠ পোড়াইলে, (ii) লোহায় মরিচা ধরিলে, (iii) প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের সংযোগে সামান্য জল উৎপত্তিতে।

3. (a) শক্তি বলিতে কি বুঝ? 'জড় পদার্থ আশ্রয় করিয়াই শক্তির প্রকাশ ঘটে'— কথাটির তাৎপর্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

(b) শক্তি প্রধানতঃ কয় প্রকার ও কি কি? 'শক্তির রূপান্তর ঘটে, বিনাশ নাই'— উক্তিটির সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

(c) 'সকল প্রকার শক্তির মূল উৎস সৌর শক্তি'—কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া উক্তিটির যাথার্থ্য ব্যাখ্যা কর।

(d) ছুরি, কাঁচি প্রভৃতিতে শান দিবার সময় তাপ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্ভব হয়; এই তাপ-শক্তির উদ্ভব হয় কোন্ শক্তির রূপান্তরে?

4. (a) শক্তি-সংরক্ষণ, বা শক্তির অবিনাশিতা সূত্রটি লিখ এবং ইহার তাৎপর্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা কর।

(b) তড়িৎশক্তিকে কোন্-কোন্ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাহা কি-কি কাজে লাগে?

(c) কয়লা পোড়াইলে কোন্ শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়? ষ্টীম ইঞ্জিনে তাপশক্তি কোন্ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়? কোন্ শক্তির রূপান্তরে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে? পার্বত্য নদীর জল কোন্ শক্তির বলে বড়-বড় প্রস্তরখণ্ড অনায়াসে স্থানান্তরিত করিতে পারে?

5. সঠিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ:

(a) পদার্থের ভর-সংরক্ষণ সূত্রের প্রকৃত আবিষ্কারক কে?

(b) আবিষ্কারকের পরীক্ষা ও ল্যাণ্ডোল্টের পরীক্ষার মূল ভিত্তি কি অভিন্ন?

(c) কলিকাতার তুলনায় উত্তর মেরুতে কোন বস্তুর ওজন কম, বেশি, না সমান হয়?

(d) ষ্টীম ইঞ্জিনে ব্যবহৃত জ্বালানীর সম্যক তাপশক্তি কি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পদার্থের অবস্থান্তর

1. (a) পদার্থের ভৌত অবস্থান্তর বস্তুতঃ কয় প্রকার ও কি-কি? প্রধানতঃ কোন্ শক্তির প্রভাবে পদার্থের অবস্থান্তর ঘটে?

(b) 'পদার্থের ভৌত অবস্থান্তরকালে উহার উপাদানগত কোন মৌল পরিবর্তন ঘটে না' — উক্তিটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

(c) পদার্থের অবস্থান্তরে চাপ, বা তাপ কোন্ শক্তির প্রভাব বেশী কার্যকরী? কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের মধ্যে কোন্‌টির ক্ষেত্রে কেবল চাপের পরিবর্তনেই ভৌতাবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব?

(d) একখণ্ড বরফ ও এক টুকরা কাঠ ক্রমশঃ উত্তপ্ত করিলে উভয় ক্ষেত্রেই কি একই ধরনের পরিবর্তন ঘটে?—পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা যুক্তি সহযোগে বুঝাইয়া লিখ।

2. (a) পদার্থের গলনাংক ও হিমাংকের সংজ্ঞা লিখ ও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর। যে-কোন বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাংক ও হিমাংক অভিন্ন, এই তথ্যের সমর্থনে একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(b) উত্তাপে বরফ গলিবার সময় উহার তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন ঘটে কি? একখণ্ড বরফ হাতে ধরিলে উহা গলিতে থাকে, আর উহা ক্রমশঃ বেশী ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন?

(c) লীন তাপের সংজ্ঞা লিখ এবং দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও। 'বরফ গলনের 'লীন তাপ' 80 ক্যালোরি/গ্রাম,' এবং 'জলের বাষ্পীভবনের 'লীন তাপ' 536 ক্যালোরি/গ্রাম'—উক্তি দুইটির মূল তথ্যের উল্লেখ কর।

3. (a) অ্যালকোহল হাতে লাগিলে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বোধ হয়, কিন্তু জলের ক্ষেত্রে তত ঠাণ্ডা লাগে না কেন? পিতলের কলসীর জলের তুলনায় মাটির কলসীর জল বেশী ঠাণ্ডা হয় কেন?

(b) তরলের বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের প্রধান-প্রধান বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর। গরম দুধ গ্লাসে রাখিলে ঠাণ্ডা হইতে যথেষ্ট সময় লাগে, কিন্তু থালায় ঢালিলে দ্রুত ঠাণ্ডা হয় কেন?

(c) ভিজা জামা-কাপড় গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকায়, ইহার তাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা কর।

(d) যে-কোন তরলের বাষ্পীভবনে কিছু লীন তাপ অবশ্যই শোষিত হইয়া থাকে, ইহার সমর্থনে একটি পরীক্ষা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

4. (a) পদার্থের গলনাংক ও হিমাংকের উপরে উহার বিশুদ্ধতার প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। বরফের সঙ্গে লবণ মিশাইলে মিশ্রণটি আরও ঠাণ্ডা হয় কেন?

(b) দুই খণ্ড বরফ লইয়া পরস্পর চাপ দিলে উহারা একসঙ্গে জুড়িয়া যায়,—ইহার অবস্থান্তরগত কারণ ব্যাখ্যা কর।

(c) কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এ জল কি একই তাপমাত্রায় ফোটে? স্ফুটনাংক বিভিন্ন হইলে তাহার কারণ কি?

(d) বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা লবণ-জলের স্ফুটনাংক বেশী, না কম?

5. (a) তরল পদার্থের স্ফুটনাংক উহার উপরিস্থিত চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির উপরে নির্ভরশীল, একটি পরীক্ষার সাহায্যে এই তথ্যটির যাথার্থ্য প্রমাণ কর।

(b) সমতল অঞ্চলের তুলনায় উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলে খাদ্যবস্তু তেমন ভাল সিদ্ধ হয় না কেন? প্রেসার কুকারের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাও।

(c) আবদ্ধ পাত্রে বাষ্পপূর্ণ উত্তপ্ত জল ঠাণ্ডা জল ছিটাইলে আবার ফোটে কেন? কোন তরলের দ্রুত বাষ্পায়নে উহার তাপমাত্রা হ্রাস পাইবার কারণ কি?

6. সঠিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ:

(a) বরফ, খাদ্য-লবণ, আয়োডিন ও চিনি — ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে উত্তপ্ত করিলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হইবে?

(b) কোন কঠিন পদার্থের গলনকালে, অথবা কোন তরল পদার্থের স্ফুটনকালে উহাতে তাপ সরবরাহ করা সত্ত্বেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় না কেন?

(c) আবদ্ধ ঘর অপেক্ষা উন্মুক্ত স্থানে ভিজা জামাকাপড় অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শুকায় কেন?

(d) বিশুদ্ধ জলের হিমাংক 0°C; লবণ-জলের হিমাংক ইহা অপেক্ষা বেশী না কম হইবে?

(e) একখণ্ড বরফের উপর একটি সরু তামার তার জড়াইয়া উহা হইতে একটি ভারী ওজন ঝুলাইয়া দিলে তারটি বরফ কাটিয়া বাহির হইয়া আসে, কিন্তু বরফ-খণ্ডটি অবিভক্তই থাকে। এই পরীক্ষাতে তামার তারের পরিবর্তে শক্ত সুতা ব্যবহার করা যায় কি-না, তাহা যুক্তি সহকারে আলোচনা কর।

(f) কোন তরলের স্ফুটনাংক কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তাহা আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

পদার্থ-বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্থিতি ও গতি

(Rest and Motion)

পাঠ্যসূচী ঃ স্থির ও সচল অবস্থা ; সরণ, দ্রুতি ও গতিবেগ ; ত্বরণ ও মন্দন ; নিউটনের গতিসূত্র, বলের সংজ্ঞা ।

স্থির ও সচল অবস্থা

(State of Rest and Motion)

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু হয় স্থির, নতুবা চলমান অবস্থায় আছে। কোন বস্তুর স্থিরতা, বা সচলতা তাহার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য স্থির বস্তুর, যেমন মাটি, বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা প্রভৃতির আপেক্ষিকে নির্ণীত হয়। বস্তুতঃ, কোন-কিছুর স্থিরাবস্থা, বা চলমান অবস্থা উহার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন স্থির বস্তুর অবস্থানের সহিত একটি আপেক্ষিক, বা তুলনামূলক ধারণা মাত্র।

অতএব বলা যায়, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন স্থির বস্তুর অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বস্তুটি **সচল অবস্থায়** (in motion) আছে বলা হয় ; অপরপক্ষে, বস্তুটি সর্বদা একই স্থানে থাকিলে, অর্থাৎ উহার কোনরূপ স্থানচ্যুতি না ঘটিলে বলা হয় বস্তুটি **স্থিরাবস্থায়** (at rest) রহিয়াছে।

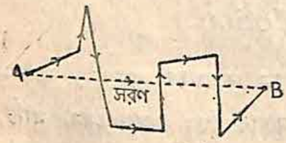
উল্লিখিত আলোচনায় একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বলা হইয়াছে, পারিপার্শ্বিক স্থির বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে কোন বস্তুর সচলতা বুঝা যায় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পার্থিব কোন বস্তুই স্থির নাই। আমরা জানি, পৃথিবী সর্বদাই নিজ অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতেছে। সুতরাং মহাশূন্যের পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যতঃ স্থির, বা সচল সকল পার্থিব বস্তুই নিয়ত স্থান পরিবর্তন করিতেছে ; পৃথিবীর

বাহির হইতে লক্ষ্য করিতে পারিলে ইহা অবশ্যই বুঝা যাইত। যাহা হউক, সাধারণতঃ আমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন পার্থিব বস্তুর অবস্থানের প্রেক্ষিতে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর স্থিরতা, বা সচলতা নির্ণয় করিয়া থাকি। বস্তুর স্থিরতা, বা সচলতা নিছক একটি আপেক্ষিক, বা তুলনামূলক ব্যাপার মাত্র; প্রকৃতপক্ষে, বস্তুর স্থিরতা-সচলতার কোন সঠিক মাপকাঠি নাই।

সরণ (Displacement)

সংজ্ঞা : নির্দিষ্ট দিকে কোন বস্তুর স্থানচ্যুতির পরিমাণকে বলা হয় ঐ দিকে বস্তুটির সরণ (displacement)।

কোন সচল বস্তু যে সর্বদা একই দিকে চলিবে তাহা না-ও হইতে পারে; উহা আঁকাবাঁকা, বা বৃত্তাকার পথেও চলিতে পারে। বস্তুটির প্রাথমিক ও অন্তিম অবস্থানের মধ্যে যে রৈখিক দূরত্ব (linear distance), তাহাই হইল বস্তুটির সরণের প্রকৃত পরিমাপ। ধরা যাক, কোন বস্তু A বিন্দু হইতে শুরু করিয়া আঁকাবাঁকা যদৃচ্ছ পথে চলিয়া অবশেষে B বিন্দুতে উপনীত হইল।



বস্তুর সরণ

বস্তুটির প্রকৃত গতিপথ যাহাই হউক না কেন, উহার সরণ ঘটিল AB সরলরৈখিক দূরত্ব। সরণের মান কেবলমাত্র প্রাথমিক ও অন্তিম অবস্থানের উপর নির্ভর করে; বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কোন্ গতিপথ অনুসরণ করিয়া প্রথম অবস্থান হইতে শেষ অবস্থানে পৌঁছিল, তাহা বিবেচ্য নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কোন সচল বস্তু এক স্থান হইতে যাত্রা শুরু করিয়া যে-কোন পথে চলিয়া পুনরায় ঐ স্থানে ফিরিয়া আসিলে বস্তুটির প্রকৃত সরণ কিছুমাত্র ঘটে না; অর্থাৎ সরণের মান হয় শূন্য।

সরণের নির্দিষ্ট মান ও অভিমুখ উভয়ই উল্লেখ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রে AB হইল সরণের মান এবং উহার অভিমুখ হইল A হইতে B-এর দিকে।

দ্রুতি ও গতিবেগ (Speed and Velocity)

কোন সচল বস্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে তাহা উল্লেখ করিলে আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি, বস্তুটি কত দ্রুত, বা কত মন্থর গতিতে চলিতেছে। চলমান বস্তুর গতির এইরূপ দ্রুততা, বা মন্থরতা প্রকাশ করা হয় উহার দ্রুতি (speed) দ্বারা।

সংজ্ঞা : কোন চলমান বস্তু প্রতি একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহাকে বলা হয় বস্তুটির দ্রুতি (speed)।

বস্তুর দ্রুতি বলিতে কোন দিক্ নির্দেশের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতির উল্লেখ করিলে তাহাকে বলা হয় গতিবেগ (velocity)।

সংজ্ঞা : কোন নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর সরণের হার, অর্থাৎ বস্তুটি প্রতি একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহাকে বলা হয় বস্তুটির গতিবেগ (velocity)।

যদি কোন বস্তু t সময়ে কোন নির্দিষ্ট দিকে l দূরত্ব অতিক্রম করে (অর্থাৎ, উহার সরণের মান l হয়), তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট দিকে বস্তুটির গতিবেগ, v, হইবে :

$$v=\frac{l}{t}\text{ ; অর্থাৎ, গতিবেগ } = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}$$

দ্রুতির সহিত গতিবেগের একমাত্র পার্থক্য হইল, গতিবেগের মান ও দিক উভয়ই সুনির্দিষ্ট; কিন্তু দ্রুতির কোন সুনির্দিষ্ট মান থাকিলেও উহার দিক নির্দিষ্ট নহে। কোন ট্রেনের দ্রুতি ঘণ্টায় 40 মাইল বলিলে বুঝা যায়, ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় 40 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে; কিন্তু ট্রেনটি কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় না, ট্রেনটি অবশ্যই মাঝে-মাঝে দিক পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, ট্রেনটি উত্তর হইতে দক্ষিণে ঘণ্টায় 40 মাইল গতিবেগে চলিতেছে, তাহা হইলে ট্রেনটির গতিবিধি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়; কারণ, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় 40 মাইল করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে।

গতিবেগের একক : যেহেতু গতিবেগ = সরণ/সময়, অতএব, সি. জি. এস. পদ্ধতিতে গতিবেগের একক হইল সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড, কিলোমিটার/ঘণ্টা ইত্যাদি, এবং এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ফুট/সেকেণ্ড, মাইল/ঘণ্টা ইত্যাদি।

ত্বরণ ও মন্দন

(Acceleration and Retardation)

কোন বস্তুর গতিবেগ যে সর্বদা একই থাকিবে তাহা না-ও হইতে পারে, নানা কারণে গতিবেগের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। ধরা যাক, একটি ট্রেন

স্টেশন ছাড়িয়া চলিতে শুরু করিয়াছে ; প্রথমে উহা অতি মন্থর গতিতে চলে, ক্রমে উহার গতি বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে সম-গতিবেগে চলিতে থাকে। এই অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বে প্রথম দিকে ট্রেনটি একক সময়ে যতটা দূরত্ব যায়, পরের দিকে উহা একক সময়ে তদপেক্ষা বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ ট্রেনটির গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

সংজ্ঞা ঃ কোন বস্তুর গতিবেগ পরিবর্তনের হার (rate)-কে বলা হয় ত্বরণ (acceleration)।

ধরা যাক, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোন একটি বস্তু u গতিবেগে চলমান রহিয়াছে এবং t সময় পরে উহার গতিবেগের মান পরিবর্তিত হইয়া হইল v ; অতএব, t সময়ে বস্তুটির গতিবেগের পরিবর্তন ঘটিতেছে $(v-u)$। সুতরাং, প্রতি একক সময়ে গতিবেগের পরিবর্তন হইতেছে $\frac{v-u}{t}$; ইহাকেই বলা হয় বস্তুটির ত্বরণ, f, অর্থাৎ উহার গতিবেগ পরিবর্তনের হার।

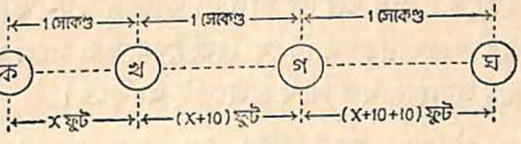
$$\therefore\ f=\frac{v-u}{t}\ ;\ \text{অর্থাৎ, ত্বরণ} = \frac{\text{গতিবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$$

$$= \frac{\text{অন্তিম গতিবেগ} - \text{প্রাথমিক গতিবেগ}}{\text{সময়}}$$

গতিবেগের পরিবর্তন দুই প্রকার ; গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার উহা ক্রমে হ্রাস পাইতেও পারে। সাধারণতঃ, **কোন বস্তুর গতিবেগ-বৃদ্ধির হারকে বলা হয় ত্বরণ (acceleration) এবং গতিবেগ-হ্রাসের হারকে বলা হয় মন্দন (retardation)।** মন্দনকে 'ঋণাত্মক ত্বরণ' হিসাবেও গণ্য করা যাইতে পারে। গতিবেগের ন্যায় ত্বরণের (বা, মন্দনের) সুনির্দিষ্ট মান ও অভিমুখ উভয়ই থাকে।

ত্বরণের একক ঃ ত্বরণ হইল গতিবেগ পরিবর্তনের হার, অর্থাৎ গতিবেগের পরিবর্তনকে সময় দ্বারা ভাগ করিলে পাওয়া যায় ত্বরণ। যেহেতু সি. জি. এস. পদ্ধতিতে গতিবেগের একক হইল সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড ; অতএব, এই পদ্ধতি অনুযায়ী ত্বরণের একক হইবে সেন্টিমিটার/(সেকেণ্ড × সেকেণ্ড) ; অর্থাৎ, সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড^2 ; ইহাকে ভাষায় বলা হয় 'সেন্টিমিটার, প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি সেকেণ্ডে,' অথবা 'সেন্টিমিটার, প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে'। এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হইল ফুট / সেকেণ্ড^2, অর্থাৎ 'ফুট, প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে'। এম. কে. এস. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক মিটার / সেকেণ্ড^2, অর্থাৎ 'মিটার, প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে'।

ত্বরণের এককে 'প্রতি সেকেণ্ডে' কথাটি দুইবার ব্যবহার করিবার কারণ হইল, একবার ইহা প্রয়োজন হয় গতিবেগ বুঝাইবার জন্য এবং দ্বিতীয়বার



ত্বরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

প্রয়োজন হয় গতিবেগ পরিবর্তনের **হার** (rate) বুঝাইবার জন্য। যদি বলা হয়, কোন বস্তু প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে 10 ফুট ত্বরণ লইয়া চলিতেছে, তাহা হইলে বুঝা যায়, বস্তুটি কোন নির্দিষ্ট 1 সেকেণ্ড সময়-কালে যত ফুট অগ্রসর হয়, পরবর্তী 1 সেকেণ্ড সময়-কালে উহা তদপেক্ষা 10 ফুট বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে। প্রদত্ত চিত্র হইতে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, মন্দনশীল কোন বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে যে দূরত্ব অগ্রসর হয় তাহার মান উপরিউক্ত-ভাবে সময়ের সহিত ক্রমে হ্রাস পায়।

নিউটনের গতিসূত্র

(Newton's Laws of Motion)

1687 খ্রীষ্টাব্দে স্বনামধন্য বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন (Sir Isaac Newton) 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia) নামক একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থে গতির স্বরূপ, অর্থাৎ গতি কি, গতির উৎপত্তি ঘটে কিভাবে, গতির বৃদ্ধি, বা হ্রাস ঘটে কিরূপে, বস্তুর গতি সম্বন্ধীয় এইরূপ বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। গতি-সংক্রান্ত যাবতীয় মূল তথ্যাদিকে নিউটন তিনটি সূত্রের আকারে উপস্থাপিত করেন, যাহা গতি-বিদ্যার (kinetics) মূল ভিত্তি-রূপে পরিগণিত। নিম্নে এই সূত্র তিনটি সম্পর্কে যথোচিত আলোচনা করা হইল।



স্যার আইজ্যাক নিউটন
(1642—1727)

নিউটনের প্রথম গতিসূত্র :
(Newton's First Law of Motion)

বাহির হইতে কোন বল প্রয়োগ না করিলে যে-কোন স্থির বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থায়ই থাকিবে এবং যে-কোন সচল বস্তু চিরকাল সম-গতিবেগে সরলরৈখিক পথে চলিতেই থাকিবে।

নিউটনের এই প্রথম সূত্রটি হইতে বুঝা যায়, জড় পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের নিজস্ব কোন উদ্যোগ (initiative) নাই, অর্থাৎ উহার নিজস্ব স্থির, বা সচল অবস্থা বজায় রাখিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। অবস্থা পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য কোনরূপ বাহিক বল প্রযুক্ত না হইলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থাতেই থাকিবে এবং সচল বস্তু যে-গতিবেগে যে-দিকে চলিতেছে সেই গতিবেগে সেই দিকেই চিরকাল চলিতে থাকিবে, উহার থামিবার কোনরূপ লক্ষণ দেখা যাইবে না। জড় বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে অবশ্যই কোনরূপ বাহিক ক্রিয়া প্রয়োজন ; ইহাকেই বলা হয় **বল** (force)।

সংজ্ঞা : কোন স্থির বস্তুকে সচল করিতে, অথবা কোন সচল বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন ঘটাইতে, বা ঘটানোর প্রয়াস পাইতে যে বাহিক ক্রিয়া প্রয়োজন, তাহাকে বলা হয় 'বল' (force)।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বল প্রয়োগ ব্যতীত কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যদি সম্ভব না-ই হয়, তাহা হইলে লৌহ, বা প্রস্তর-নির্মিত একটি গোলক মেঝের উপরে গড়াইয়া দিলে উহার গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে কিছু দূর গিয়া উহা থামিয়া যায় কেন ? গোলকটিকে যে গতিবেগে যে দিকে গড়াইয়া দেওয়া হইল, প্রথম সূত্র অনুযায়ী উহার তো সেই গতিতেই চিরকাল সেই দিকে গড়াইয়া চলা উচিত। ইহার কারণ, গোলকটি যে-দিকে অগ্রসর হয়, দৃশ্যতঃ মসৃণ হইলেও মেঝেটি গোলকটির উপরে উহার গতির বিপরীত-মুখী একটি ঘর্ষণ-জনিত বল প্রয়োগ করে এবং এই ঘর্ষণ-জনিত বাধার জন্যই গোলকটির গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে কিছু দূর গিয়া উহা স্থির হইয়া যায়। মেঝেটি যত বেশী মসৃণ হইবে, ঘর্ষণ-জনিত বাধা তদনুপাতে হ্রাস পাওয়ায় গোলকটি তত অধিক দূর অবধি অগ্রসর হইতে পারিবে।

জড় বস্তুর একটি প্রধান ধর্ম হইল, উহা সর্বদাই নিজ অবস্থা বজায় রাখার

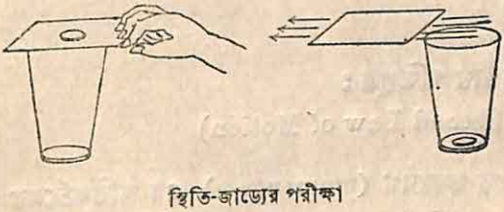
চেষ্টা করে ; কেবলমাত্র বাহ্যিক বল প্রয়োগ দ্বারাই উহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর। জড় বস্তুর এই ধর্মকে বলা হয় জাড্য (inertia)।

সংজ্ঞা : জড় বস্তুর নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখিবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে বলা হয় জাড্য (inertia)।

জাড্য স্বভাবতঃই দুই প্রকার : **স্থিতি-জাড্য** (inertia of rest) এবং **গতি-জাড্য** (inertia of motion)। কোনরূপ বাহ্যিক সহায়তা ব্যতীত কোন স্থির, বা গতিশীল বস্তুর নিজস্ব স্থির, বা সচল অবস্থার পরিবর্তনের অক্ষমতাকে যথাক্রমে বলা হয় স্থিতি-জাড্য ও গতি-জাড্য।

স্থিতি-জাড্যের উদাহরণ : (1) যাত্রীবাহী বাস হঠাৎ চলিতে শুরু করিলে যাত্রীদের দেহ পশ্চাৎ দিকে হেলিয়া পড়ে। ইহার কারণ, বাসটি থামিয়া থাকা অবস্থায় যাত্রীদের দেহ স্থিতি-জাড্যে থাকে ; বাসটি সহসা গতিশীল হইলে আরোহীর দেহের নিম্নাংশে সর্বপ্রথম গতি সঞ্চারিত হয়, কিন্তু দেহের উর্ধ্বাংশের স্থিতি-জাড্য তত দ্রুত লোপ পায় না, অর্থাৎ দেহের উর্ধ্বভাগ স্থিতিশীল অবস্থাই বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই আরোহীদের দেহ পিছনে হেলিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

(2) একটি গ্লাসের মুখে একখানা শক্ত পোষ্টকার্ড চাপা দিয়া তাহার উপর একটি পয়সা রাখা হইল। এখন পোষ্টকার্ডটিকে সহসা অতি দ্রুত আঙুলের টোকা দিয়া আঘাত করিলে উহা দূরে ছিট্‌কাইয়া যাইবে, কিন্তু দেখা যাইবে যে, পয়সাটি বাহিরে না পড়িয়া গ্লাসের মধ্যে পতিত হইল। ইহার

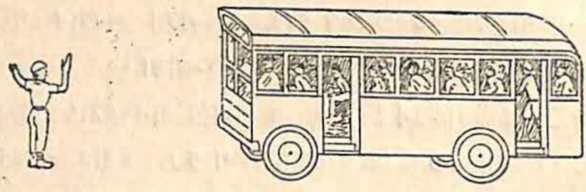


স্থিতি-জাড্যের পরীক্ষা

কারণ, পোষ্টকার্ডটি সহসা গতিশীল হইলেও পয়সাটি উহার স্থিতি-জাড্যের প্রভাবে স্ব-স্থানেই থাকিতে চেষ্টা করে এবং এই জন্যই উহা পোষ্টকার্ডখানার সঙ্গে বাহিরে ছিট্‌কাইয়া না গিয়া গ্লাসের মধ্যে পতিত হয়।

গতি-জাড্যের উদাহরণ : (1) চলন্ত বাস যখন সহসা ব্রেক কষিয়া থামিয়া পড়ে, তখন অসাবধান যাত্রীর দেহ আকস্মিকভাবে সামনের দিকে

ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহার কারণ, চলন্ত বাসের যাত্রীর দেহ গতি-জাড্যে থাকে ; বাসটি সহসা থামিয়া পড়িলে যাত্রীর দেহের নিম্নাংশ প্রথমে স্থির অবস্থানে আসে, কিন্তু তখনও দেহের উর্ধ্বাংশ পূর্ববর্তী গতি-জাড্যের প্রভাবে উহার সম্মুখ-গতি বজায় রাখিতে চেষ্টা করে ; এই কারণেই আরোহীর দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।



গতি-জাড্যের দৃষ্টান্ত

(2) চলন্ত ট্রেনের কামরায় একটি বলকে উঁচুতে ছুঁড়িয়া দিলে উহা আবার ঠিক যাত্রীর হাতেই ফিরিয়া আসে, যদিও ট্রেনের গতির দরুণ আরোহী ইতিমধ্যে অবশ্যই কিছুদূর আগাইয়া গিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি কিছুটা বিস্ময়কর মনে হইলেও ইহার ব্যাখ্যা অতি সহজ। বল ছুঁড়িবার পর আরোহী ট্রেনের সহিত আগাইয়া যায় সত্য, কিন্তু বলটি গতি-জাড্যের দরুণ হাতের উর্ধ্বে শূন্যে থাকিবার সময় নিজেও আরোহার সহিত সম-বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় এবং এই কারণেই উহা আবার ঠিক আরোহীর হাতেই ফিরিয়া আসে।

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র ঃ
(Newton's Second Law of Motion)

কোন বস্তুর ভরবেগ (momentum)-এর পরিবর্তনের হার উহার উপর প্রযুক্ত বাহিক বলের সমানুপাতিক হয় এবং ভরবেগের পরিবর্তন প্রযুক্ত বলের অভিমুখী হইয়া থাকে।

এই সূত্রটির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভরবেগ (momentum) কাহাকে বলে তাহা সর্বপ্রথমে বুঝা প্রয়োজন। **যে-কোন বস্তুর ভর ও গতিবেগের গুণফলকে বলা হয় বস্তুটির ভরবেগ।** যদি কোন বস্তুর ভর হয়

m এবং গতিবেগ v, তাহা হইলে উহার ভরবেগ হইবে mv। বস্তুর ভরবেগ সর্বদা কোন নির্দিষ্ট দিকে ক্রিয়া করে ; বস্তুর গতিবেগ যে-দিকে, ভরবেগের অভিমুখও সেই দিকে হইবে।

নিউটনের প্রথম গতিসূত্র হইতে 'বল' কাহাকে বলে তাহা বুঝা যায় এবং দ্বিতীয় সূত্রটি হইতে বলের পরিমাপ পাওয়া যায়।

বলের পরিমাপ ও $P=mf$ সমীকরণ : ধরা যাক, u গতিবেগে চলমান m ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুর উপর P বল প্রয়োগ করা হইতেছে। প্রথম সূত্র হইতে আমরা জানি, কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে বস্তুর গতীয় অবস্থার (state of motion) পরিবর্তন ঘটে ; সুতরাং, এই ক্ষেত্রে বস্তুটির গতিবেগের পরিবর্তন ঘটিবে, অর্থাৎ ত্বরণ, বা মন্দনের উৎপত্তি হইবে (যদি প্রযুক্ত বল বস্তুটির গতির অভিমুখী হয়, তাহা হইলে ত্বরণ ঘটিবে, এবং প্রযুক্ত বল ও বস্তুর গতির অভিমুখ যদি পরস্পর বিপরীত হয়, তাহা হইলে বস্তুটির গতি মন্দীভূত হইবে)। মনে করা যাক, এই ক্ষেত্রে বস্তুটির ত্বরণ ঘটিতেছে, অর্থাৎ গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন ধরা যাক, t সময় পরে বস্তুটির গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়া হইল v ; অতএব, বস্তুটির

প্রাথমিক ভরবেগ $=mu$ এবং অন্তিম ভরবেগ $=mv$

সুতরাং, ভরবেগের পরিবর্তন $=mv-mu$। ভরবেগের এই পরিবর্তন ঘটিতেছে t সময়ে ; অতএব, প্রতি একক সময়ে উহার ভরবেগের পরিবর্তন, অর্থাৎ, ভরবেগের পরিবর্তনের হার

$$=\frac{mv-mu}{t}=m\times\frac{v-u}{t}=mf$$

$$\left(\text{যেহেতু, ত্বরণ, } f=\frac{\text{গতিবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}=\frac{v-u}{t}\right)$$

এখন, দ্বিতীয় গতিসূত্র হইতে আমরা জানি, কোন বস্তুর উপরে প্রযুক্ত বল উহার ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সহিত সমানুপাতিক হয় ; সুতরাং,

$$P\propto mf$$

অর্থাৎ, $P=K.mf$ [K একটি ধ্রুবক রাশি (constant)]

এখন যদি ধরিয়া লওয়া হয়, যে-বল একক ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া একক ত্বরণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহাই হইল বলের একক ; অর্থাৎ যখন $m=1$ ও $f=1$, তখন $P=1$; তাহা হইলে উপরিউক্ত সমীকরণ হইতে দেখা যায়, $K=1$; সুতরাং, এই পদ্ধতিতে আমরা লিখিতে পারি :

$$P=mf$$

অর্থাৎ, **বল = ভর × ত্বরণ**

অতএব, অ-সম গতিবেগে চলমান কোন বস্তুর ভরকে উহার ত্বরণ দ্বারা গুণ করিলে বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের পরিমাপ পাওয়া যাইবে। এই সমীকরণটিই দ্বিতীয় গতিসূত্রের গাণিতিক রূপ।

বলের একক (Unit of Force) :

(i) **সি. জি. এস. পদ্ধতি :** যে-বল এক গ্রাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক সে. মি. (1 cm /sec.^{2}) ত্বরণ সৃষ্টি করে, তাহাকে বলা হয় এক **ডাইন** (dyne) ; 1 ডাইন = 1 গ্রাম × 1 সে. মি./সেকেণ্ড^2।

ডাইন অপেক্ষা বৃহত্তর একক প্রয়োজন হইলে **এম. কে. এস.** পদ্ধতির 'নিউটন' (Newton) একক ব্যবহার করা হয়। যে-বল এক কিলোগ্রাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক মিটার (1 metre/sec.^{2}) ত্বরণ সৃষ্টি করে, তাহাকে বলা হয় এক **নিউটন** (Newton) ; 1 নিউটন = 1 কিলোগ্রাম × 1 মিটার/সেকেণ্ড^2।

(ii) **এফ. পি. এস. পদ্ধতি :** যে-বল এক পাউণ্ড-ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক ফুট (1 ft./sec.^{2}) ত্বরণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহাকে বলা হয় এক **পাউণ্ডাল** (poundal) ; 1 পাউণ্ডাল = 1 পাউণ্ড × 1 ফুট/সেকেণ্ড^2।

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র :

(Newton's Third Law of Motion)

প্রত্যেক ক্রিয়ারই (action) একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া (reaction) থাকে।

ক্রিকেট খেলার সময় লক্ষ্য করা যায়, ব্যাট দ্বারা বলকে আঘাত করিলে কেবল যে বলটিই আঘাতের অভিমুখে সজোরে অগ্রসর হইয়া

যায় তাহাই নহে, ব্যাটখানাও বলটির ধাক্কা খাইয়া কিছুটা পশ্চাৎ দিকে সরিয়া আসে এবং খেলোয়াড় সেই প্রত্যাঘাত অনুভব করে। ইহার প্রকৃত কারণ হইল, খেলোয়াড়ের পেশী-শক্তিতে ব্যাটখানা বলটির উপরে যে 'বল' (force) প্রয়োগ করে, সঙ্গে-সঙ্গে বলটিও ব্যাটের উপরে ঠিক তাহার সমান ও বিপরীতমুখী একটি 'বল' (force) প্রয়োগ করে। প্রথমটিকে যদি বলা হয় ক্রিয়া (action), তাহা হইলে সমান ও বিপরীতমুখী দ্বিতীয় 'বল'-কে বলা হইবে **প্রতিক্রিয়া** (reaction)। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যাট-খানা পশ্চাৎ দিকে ধাক্কা খায় এবং খেলোয়াড় তাহা অনুভব করে। বন্দুক হইতে গুলী নিক্ষেপ-কালেও ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটে। আবার, রকেট, বা হাউই-বাজীতে উহার জ্বালানীর দ্রুত দহনের ফলে উৎপন্ন উচ্চ-চাপ-পিষ্ট গ্যাস নীচের একটি সরু নল-মুখে সজোরে বহির্গত হয় এবং রকেট, বা হাউইয়ের উপর বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া-বলের প্রভাবে উহা দ্রুতগতিতে উপরে উঠিতে থাকে। বস্তুতঃ, যে-কোন ক্রিয়ার ফলেই তাহার সমান ও বিপরীতমুখী একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অবশ্য ক্রিয়া না থাকিলে প্রতিক্রিয়ারও কোন অস্তিত্ব থাকে না, অর্থাৎ ক্রিয়ার স্থায়িত্ব যতক্ষণ প্রতিক্রিয়ার স্থায়িত্বও ততক্ষণ ; ক্রিয়া লোপ পাইলে প্রতিক্রিয়াও লোপ পায়।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি বিষয় বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করা প্রয়োজন। **ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মান পরস্পর সমান হইলেও উহারা একই বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হয় না** ; দুইটি বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া-কালে ক্রিয়া-বল (force of action) একটি বস্তুর উপর এবং প্রতি-ক্রিয়া-বল (force of reaction) অপর বস্তুটির উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান হইলেও বস্তু দুইটির ভর যদি অ-সমান হয়, তাহা হইলে উহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সমান না-ও হইতে পারে। উপরে ব্যাট ও বলের যে দৃষ্টান্তটি আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। ব্যাট ও বল উভয়েই উভয়ের উপর সমান 'বল' প্রয়োগ করে ; কিন্তু ব্যাট অপেক্ষা বলের ভর অনেক কম বলিয়াই উহার ক্ষেত্রে অনেক বেশী ত্বরণ ঘটে। ইহার ফলে নিক্ষিপ্ত বলটি ব্যাটের আঘাতে সম্মুখ দিকে সজোরে ছুটিয়া যায় ; কিন্তু তজ্জনিত প্রতিক্রিয়ায় ব্যাটটি ধাক্কা খাইয়া সামান্য মাত্র পশ্চাদ্দিকে সরিয়া আসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্য, শক্তি ও ক্ষমতা
(Work, Energy and Power)

পাঠ্যসূচী : কার্য, শক্তি ও ক্ষমতা ; স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি ;
সরল যন্ত্র : আনত তল, চক্র ও অক্ষ-দণ্ড, লিভার।

কার্য (Work)

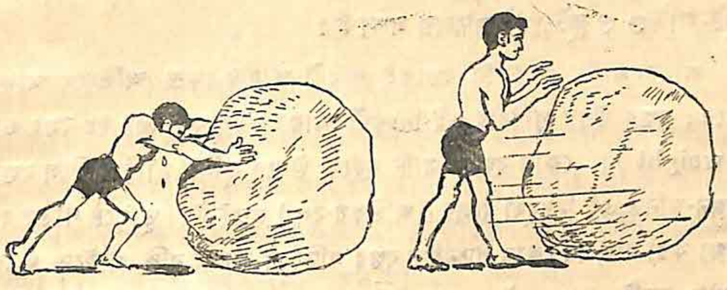
দৈনন্দিন জীবনে কার্যের বহু বিভিন্ন উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। আমরা যখন হাঁটি-চলি, অথবা কোন ভারী বস্তুকে ঠেলিয়া দূরে সরাই, বাল্‌তি করিয়া জল তুলি, প্রতি ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু-না-কিছু পরিমাণ কার্য সম্পন্ন করা হয়। বল প্রয়োগ এবং তজ্জনিত কিছু শক্তি ব্যয় না করিয়া কোন কার্যই সম্পন্ন করা যায় না ; এই কারণেই সাধারণতঃ যে-কোন কার্য করিবার ফলে আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করি। যে শারীরিক ক্রিয়ায় লিপ্ত হইবার ফলে আমাদের দৈহিক ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ হয়, সাধারণভাবে তাহাকেই আমরা কার্য বলি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে 'কার্য' কথাটির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্ন অর্থ, বা বৈশিষ্ট্য আছে।


কুঁয়া থেকে জল তোলা (কার্যের উদাহরণ)

সংজ্ঞা : কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুটির স্থানচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে উহার উপর 'কার্য' করা হইল বলা হয়। প্রযুক্ত বল ও বস্তুর স্থানচ্যুতির গুণফল হইল কৃত কার্যের পরিমাপ ; অর্থাৎ, কার্য = বল × বস্তুর স্থানচ্যুতি।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায়, বল প্রয়োগ করিয়া কোন বস্তুর স্থানচ্যুতি ঘটাইতে পারিলে তবেই বলা যাইতে পারে, 'কার্য' সম্পন্ন হইল। কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল যত বেশীই হউক না কেন, বস্তুটির সরণ, বা স্থানচ্যুতি না

ঘটিলে কোন কার্য করা হইল বলা যায় না। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি একটি ভারী পাথর ঠেলিয়া সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। যত বলই প্রয়োগ করা হউক না কেন, যতক্ষণ না পাথরটি স্থানচ্যুত হইতেছে ততক্ষণ কোনরূপ কার্য করা



পাথর ঠেলিয়া সরানো (কার্যের উদাহরণ)

হইল বলা যায় না। যদি সে পাথরটি সরাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বলা যাইবে, লোকটি 'কার্য' সম্পন্ন করিয়াছে, এবং সেই কৃত কার্যের পরিমাণ হইল, যে-বল প্রয়োগে সে পাথরটিকে সরাইতে সক্ষম হইয়াছে তাহার সহিত পাথরটি যে-দূরত্ব সরিল তাহার গুণফলের সমান।

কার্যের একক (Unit of Work) :

(i) **সি. জি. এস. পদ্ধতি** : কোন বস্তুর উপর এক ডাইন বল প্রয়োগ করিলে যদি উহা বলের অভিমুখে এক সেন্টিমিটার সরিয়া যায়, তাহা হইলে কৃত কার্যের পরিমাণকে বলা হয় এক **আর্গ** (erg) ; 1 আর্গ = 1 ডাইন × 1 সেন্টিমিটার। 1 জুল = 10^7 আর্গ।

(ii) **এফ. পি. এস. পদ্ধতি** : কোন বস্তুর উপর এক পাউণ্ডাল বল প্রয়োগ করিলে যদি উহা বলের অভিমুখে এক ফুট সরিয়া যায়, তাহা হইলে কৃত কার্যের পরিমাণকে বলা হয় এক **ফুট-পাউণ্ডাল** (foot-poundal) ; 1 ফুট-পাউণ্ডাল = 1 পাউণ্ডাল × 1 ফুট।

(iii) **অভিকর্ষজ পদ্ধতি** (Gravitational System) :

এক গ্রাম ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে লম্বভাবে এক সেন্টিমিটার উপরে তুলিতে যে পরিমাণ কার্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে বলে এক **গ্র্যাম-সেন্টিমিটার**

(gram-centimetre)। অনুরূপভাবে, এক পাউণ্ড ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে অভিকর্ষ-বলের বিরুদ্ধে লম্বভাবে এক ফুট উপরে তুলিতে যে পরিমাণ কার্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে বলে এক **ফুট-পাউণ্ড** (foot-pound)।

ফুট-পাউণ্ড ও ফুট-পাউণ্ডালের সম্পর্ক :

আমরা জানি, যে-কোন বস্তুকেই পৃথিবী তাহার কেন্দ্র অভিমুখে আকর্ষণ করে ; বস্তুর উপর পৃথিবীর এই নিম্নমুখী আকর্ষণ-বলকেই বলা হয় বস্তুর ওজন (weight)। কোন বস্তুকে মাটি হইতে উপরে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে বস্তুটির ওজন-জনিত এই নিম্নমুখী বলের (অভিকর্ষ-বল) জন্যই উহা ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। লক্ষ্য করা যায়, যে-কোন পতনশীল বস্তুর গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; অর্থাৎ বস্তুটির ত্বরণ ঘটে। পতনশীল সকল বস্তুরই এই ত্বরণের মান সমান ; ইহাকে বলা হয় **অভিকর্ষজ ত্বরণ** (acceleration due to gravity)। ইহার প্রতীক হইল g ; $g = 32$ ফুট/সেকেণ্ড$^2 = 980$ সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড^2। এখন, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র হইতে আমরা জানি, বল = ভর × ত্বরণ ; সুতরাং, কোন বস্তুর ভর যদি m হয়, তাহা হইলে উহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ-বল, অর্থাৎ বস্তুটির ওজন হইবে mg।

কোন বস্তুকে লম্বভাবে উপরে তুলিতে উহার ওজন-জনিত এই নিম্নমুখী বলের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হয়। সুতরাং,

1 ফুট-পাউণ্ড = 1 পাউণ্ড ভর-বিশিষ্ট বস্তুর ওজন × 1 ফুট
= 1 পাউণ্ড × 32 ফুট/সেকেণ্ড^2 × 1 ফুট
= 32 পাউণ্ডাল × 1 ফুট = 32 ফুট-পাউণ্ডাল।

ক্ষমতা (Power)

একই কার্য কেহ দ্রুত সম্পন্ন করিতে পারে, আবার কাহারও সময় বেশী লাগে ; আমরা বলি, একজনের কর্ম-ক্ষমতা অধিক, অপরের কম। ধরা যাক, দুই জন লোক একই দূরত্ব দৌড়াইতেছে। যাহার দৌড়াইবার ক্ষমতা বেশী সে এই পথ কম সময়ে অতিক্রম করিবে এবং যাহার ক্ষমতা কম তাহার ক্ষেত্রে অবশ্যই বেশী সময় লাগিবে। দুইজনেই মোট যে পরিমাণ কার্য করিতেছে তাহার মান সমান ; কিন্তু যাহার ক্ষমতা বেশী সে কম সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কার্য (এই ক্ষেত্রে দূরত্ব অতিক্রম) করিতে সক্ষম

হয়। সুতরাং, কোন কার্য সম্পাদন-কালে মোট কি পরিমাণ কার্য করা হইল তাহাই একমাত্র বিচার্য বিষয় নহে, ঐ কার্য করিতে কত সময় লাগিল তাহাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে যত বেশী কার্য করিতে পারে, আমরা বলি তাহার কর্ম-ক্ষমতা তত বেশী। প্রতি একক সময়ে কৃত কার্যের পরিমাণ, অর্থাৎ কার্য করিবার হার (rate of doing work) উল্লেখ করিয়া ক্ষমতার (power) পরিমাপ নির্ণয় করা হয়।

সংজ্ঞা : কার্য করিবার হার (rate)-কে বলা হয় ক্ষমতা (power)।

যদি t সময়ে w পরিমাণ কার্য করা হয়, তাহা হইলে প্রতি একক সময়ে কৃত কার্যের মান হইল w/t ; ইহাই কার্য নিষ্পন্ন করিবার হার, অর্থাৎ ক্ষমতা (power)। সুতরাং, ক্ষমতা (P) = কৃত কার্য (w)/সময় (t)।

ক্ষমতার একক (Unit of Power) :

(i) **সি. জি. এস. পদ্ধতি :** প্রতি সেকেণ্ডে এক জুল (joule) পরিমাণ কার্য করা হইলে সেই ক্ষমতাকে বলা হয় এক **ওয়াট** (watt); 1 ওয়াট = 1 জুল/সেকেণ্ড = 10^7 আর্গ/সেকেণ্ড।

ওয়াট অপেক্ষা বৃহত্তর একক প্রয়োজন হইলে অনেক সময় **কিলোওয়াট** (kilowatt) ব্যবহার করা হয় ; 1 কিলোওয়াট = 1000 ওয়াট।

(ii) **এফ. পি. এস. পদ্ধতি :** প্রতি সেকেণ্ডে যদি 550 ফুট-পাউণ্ড পরিমাণ কার্য করা হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষমতাকে বলে এক **অশ্ব ক্ষমতা** (horse power) ; 1 অশ্ব-ক্ষমতা = 550 ফুট-পাউণ্ড/সেকেণ্ড।

1 অশ্ব-ক্ষমতা = (প্রায়) 746 ওয়াট।

শক্তি (Energy)

যে-কোন কার্য সম্পন্ন করিতে কিছু-না-কিছু শক্তি ব্যয়িত হয়। কুঁয়া হইতে বালতি করিয়া জল তুলিতে, অথবা কোন ভারী বস্তুকে ঠেলিয়া সরাইবার সময় কিছু পরিমাণ শক্তি ব্যয় করিতে হয় বলিয়াই আমরা দৈহিক ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করি। মানুষই হউক, বা কোন যন্ত্রই হউক, যাহাই কোন কার্য করিতে সক্ষম তাহারই কিছু শক্তি, অর্থাৎ কার্য করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। শক্তি ব্যয় না করিলে কোন কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

সংজ্ঞা ঃ কার্য করিবার সামর্থ্যকে বলা হয় শক্তি (energy)।

কোন মানুষ, বা কোন যন্ত্র যে পরিমাণ কার্য করিতে সক্ষম তাহাই হইল উহার শক্তির পরিমাপ। যে যত বেশী কার্য করিতে পারে তাহার শক্তি তত বেশী। কার্য ও শক্তি একই এককে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, যথা—আর্গ, জুল, ফুট-পাউণ্ডাল, ফুট-পাউণ্ড ইত্যাদি।

শক্তি প্রধানতঃ সাত প্রকার; যেমন—যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy), তাপ-শক্তি (heat energy), আলোক-শক্তি (light energy), শব্দ-শক্তি (sound energy), তড়িৎ-শক্তি (electrical energy), রাসায়নিক শক্তি (chemical energy) ও চৌম্বক শক্তি (magnetic energy)।

আবার, যান্ত্রিক শক্তি বস্তুতঃ দুই প্রকার, যথা—**গতিশক্তি** (kinetic energy) ও **স্থিতিশক্তি** (potential energy)। পাঠ্যসূচী অনুসারে এই দুই প্রকার যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

গতিশক্তি (Kinetic Energy)

সংজ্ঞা ঃ কোন গতিশীল বস্তু উহার গতির দরুণ যে শক্তি অর্জন করে, তাহাকে বলা হয় গতিশক্তি (kinetic energy)।

চলমান বস্তু মাত্রেরই কিছু কার্য করিবার সামর্থ্য, বা শক্তি থাকে। এই শক্তি বস্তুটি লাভ করে তাহার গতির ফল-স্বরূপ; এই জন্যই ইহাকে বলা হয় গতিশক্তি। একটি উদাহরণ আলোচনা করিলে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইবে। চলন্ত রোলারের সামনে কোন জিনিস পড়িলে রোলারটি উহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়, অথবা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ রোলারটি কিছু কার্য করিতে পারে। কিন্তু রোলারটির অচল অবস্থায় বস্তুটিকে উহার সংস্পর্শে রাখিলেও রোলারটি এইরূপ কোন কার্য করিতে পারে না। সুতরাং, গতিশীল অবস্থায় রোলারটি কার্য করিবার যে সামর্থ্য, বা শক্তি লাভ করে তাহার মূল উৎসই হইল উহার গতি। কোন চলমান বস্তুতে উহার গতিজনিত যে শক্তি অর্জিত হয় সেই শক্তিকে বলা হয় গতিশক্তি।

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অনেক সময় বড়-বড় গাছের গুঁড়ি তীব্র খরস্রোতা পাহাড়ী নদীতে ভাসাইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা হয়। নদীর জল গতিশীল বলিয়া উহা যথেষ্ট গতিশক্তি লাভ করে এবং এই গতিশক্তির ফলেই গুঁড়িগুলির পরিবহণ-কার্য সম্ভব হয়।

গতিশক্তির পরিমাপ : v গতিবেগে চলমান m ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুর গতিশক্তির পরিমাপ হইল $\frac{1}{2}mv^2$; অর্থাৎ

$$\text{গতিশক্তি} = \frac{1}{2} \times \text{ভর} \times (\text{ গতিবেগ })^2$$

স্থিতিশক্তি (Potential Energy)

সংজ্ঞা : কোন বস্তুকে উহার স্বাভাবিক অবস্থা (standard state) **হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্য কোন অবস্থায় আনিলে বস্তুটির এই অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে উহাতে কিছু পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে ; এই শক্তিকে বলা হয় বস্তুটির স্থিতিশক্তি** (potential energy)।

প্রত্যেক বস্তুরই কোন একটি বিশেষ অবস্থায় থাকার একটি সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, যাহাকে বলা হয় বস্তুটির স্বাভাবিক অবস্থা। যেমন, নদীর জল উচ্চ-তলে অবস্থিত উৎসমুখ হইতে নির্গত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে আসিয়া মিশিতে চায় ; কারণ, নিম্ন-তলস্থিত সমুদ্রই জলের স্বাভাবিক অবস্থান। একটি স্প্রীঙকে গুটাইয়া সংকুচিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা পুনরায় প্রাথমিক শিথিল অবস্থায় ফিরিয়া আসে ; কারণ, উহাই স্প্রাঙটির স্বাভাবিক অবস্থা। যে-কোন বস্তুকে উহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্য কোন অবস্থায় আনিলে উহা সুযোগ পাইলেই পুনরায় উহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং এইরূপ পরিবর্তনকালে উহা কিছু পরিমাণ বাহিক কার্য নিষ্পন্ন করিতে পারে। বস্তুটি কার্য করিবার এই শক্তি লাভ করে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুতির ফলে। এই শক্তিকে বলা হয় বস্তুর স্থিতিশক্তি।

দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম যখন লম্বভাবে ঝুলিতে থাকে তখন উহা দোলে না। কিন্তু উহাকে যে-কোন দিকে কিছুটা সরাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দিলে উহা দুলিতে থাকে। দোদুল্যমান অবস্থায় পেণ্ডুলামটি অবশ্যই কিছু পরিমাণ কার্য নিষ্পন্ন করে ; কিন্তু পেণ্ডুলামটি এই কার্য করিবার প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে কিরূপে ? প্রকৃতপক্ষে, পেণ্ডুলামটিকে উহার স্বাভাবিক অবস্থান হইতে বিচ্যুত করিবার ফলে উহাতে কিছু পরিমাণ স্থিতিশক্তি সঞ্চিত হয় এবং তাহার প্রভাবেই পেণ্ডুলামটি এইরূপ দোলন-কার্য করিতে সক্ষম হয়।

যে-কোন বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয় এবং এইরূপ পতনকালে উহা অবশ্যই কিছু পরিমাণ কার্য নিষ্পন্ন করে। বস্তুটি এই কার্য করিবার প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করে উহাকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরে তুলিবার ফলে ; কারণ, ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানই যে-কোন পার্থিব বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা, এবং এই অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিবার ফলে বস্তুটিতে কিছু পরিমাণ স্থিতিশক্তি সঞ্চিত হয় এবং এই শক্তি ব্যয় করিয়া উহা কার্য নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হয়। উর্ধ্বস্থিত বস্তুর নিম্নাভিমুখী পতনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে উহাতে উহার অবস্থান-জনিত স্থিতিশক্তি সঞ্চিত থাকে ; পতনের সময় এই স্থিতিশক্তি ক্রমবর্ধমান গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র হইতে সহজেই বুঝা যায়, পতনকালীন যে-কোন মুহূর্তে বস্তুটির স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির মোট পরিমাণ অবশ্যই সর্বদা সমান থাকিবে, অর্থাৎ উহার স্থিতিশক্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে এবং গতিশক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাটি স্পর্শ করিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বস্তুটির স্থিতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়, সম্যক গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মাটিতে পড়িবার মুহূর্তে এই গতিশক্তি রুদ্ধ হইবার ফলে উহা প্রধানতঃ তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হয়, সামান্য শব্দশক্তিরও উদ্ভব ঘটে।

স্থিতিশক্তির পরিমাপ : m ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তু ভূ-পৃষ্ঠ হইতে h উচ্চতায় অবস্থান করিলে উহাতে যে স্থিতিশক্তি সঞ্চিত হয়, তাহার পরিমাপ হইল $m.\,g.\,h.$; অর্থাৎ

স্থিতিশক্তি = ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ × উচ্চতা

বিভিন্ন প্রকার সরল যন্ত্র

(Different Types of Simple Machines)

যে-কোন কার্য করিতে অবশ্যই কম-বেশী কিছু-না-কিছু বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং এই জন্যই বল প্রয়োগ না করিলে কোন কার্য করাই সম্ভব হয় না। যে কার্যের বাধা যত বেশী সেই কার্য করিতে স্বভাবতঃই তত বেশী বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় এবং কার্যটি তত বেশী কঠিন বলিয়া মনে হয়। কোন কঠিন কার্য নিষ্পন্ন করা আমাদের দৈহিক শক্তিতে সম্ভব না হইলে আমরা বিভিন্নরূপ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করি, যাহার উদ্দেশ্য হইল অল্প পরিশ্রমে কম বল প্রয়োগ করিয়া কোন কঠিন কার্যকে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করা।

সংজ্ঞা ঃ যে ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প বল প্রয়োগ করিয়া অধিকতর বাধা অতিক্রম করা যায় এবং অল্পায়াসে কঠিন কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তাহাকে বলা হয় যন্ত্র (machine)।

ধরা যাক, কোন যন্ত্রে P বল প্রয়োগ করিয়া W পরিমাণ বাধা অতিক্রম করা হইতেছে। W-র তুলনায় P-এর মান যত কম হইবে, অর্থাৎ যত কম বল প্রয়োগে বাধাটি অতিক্রম করা যাইবে, যন্ত্রটির ব্যবহার অবশ্যই ততবেশী সুবিধাজনক হইবে, অর্থাৎ কার্যটি যন্ত্রের সাহায্যে তত বেশী সহজে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হইবে। সুতরাং, কোন যন্ত্র হইতে কতটা সুবিধা পাওয়া যাইতেছে W/P অনুপাতটির মান তাহার পরিমাপ নির্দেশ করে। **কোন যন্ত্র হইতে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয় যান্ত্রিক সুবিধা** (mechanical advantage) **এবং উহার মান অতিক্রান্ত বাধা ও প্রযুক্ত বলের অনুপাতের সমান** ; অর্থাৎ,

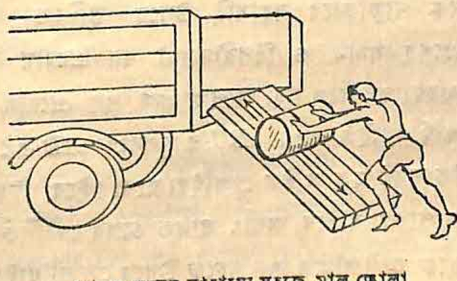
$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{অতিক্রান্ত বাধা}}{\text{প্রযুক্ত বল}} = \frac{W}{P}$$

পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার সরল যন্ত্র সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। ইহা হইতে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও যান্ত্রিক সুবিধা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যাইবে।

(ক) **আনত তল** (Inclined Plane) :

কাঠের একটি মসৃণ পাটাতন, ঐরূপ কোন সমতল ও প্রশস্ত পাতকে যদি ভূমি-তলের সহিত কোন একটি কোণে (angle) হেলানো অবস্থায় রাখা হয়, তাহা হইলে উহার তলকে বলা হয় **আনত তল** (inclined plane)।

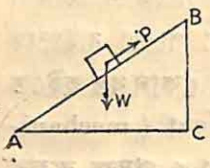
এইরূপ আনত তলের সরল যান্ত্রিক অবস্থায় অনেক কঠিন কাজ অপেক্ষাকৃত



আনত তলের সাহায্যে সহজে মাল তোলা

সহজে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়। লরী, মালগাড়ী, ষ্টীমার ইত্যাদিতে ভারী মাল উঠা-নামা করানোর জন্য অনেক সময় কাঠের একটি পাটাতন হেলানোভাবে স্থাপন করিয়া তাহার উপর দিয়া ভারী মালপত্র গড়াইয়া উপরে তোলা, বা নীচে নামানো হয়। এইরূপ আনত তল ব্যবহারের ফলে ভারী মালপত্র উঠা-নামা করাইতে কম পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

আনত তলের সাহায্যে কার্য করিতে কেন সুবিধা হয় তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাক, AB একটি আনত তল। এই তলের সহিত সমান্তরালভাবে P বল প্রয়োগ করিয়া W ওজনের একটি বস্তুকে গড়াইয়া A বিন্দু হইতে B বিন্দুতে তোলা হইল। যেহেতু কার্য=বল × বস্তুর স্থানচ্যুতি ; অতএব, এই ক্ষেত্রে



আনত তলের কার্যকারিতা

$$\text{কার্যের পরিমাণ} = P \times AB$$

বস্তুটিকে এইভাবে আনত তলের সাহায্যে না তুলিয়া উহাকে C বিন্দু হইতে সরাসরি লম্বভাবেও B বিন্দুতে তোলা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে

$$\text{কার্যের পরিমাণ} = W \times BC$$

উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু একই বস্তুকে একই উচ্চতায় তোলা হইতেছে অতএব, দুই ক্ষেত্রেই কার্যের পরিমাণ সমান হইতে হইবে। অতএব,

$$P \times AB = W \times BC$$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AB}{BC}$$

যেহেতু BC অপেক্ষা AB বৃহত্তর, অতএব বুঝা যাইতেছে, যান্ত্রিক সুবিধার মান 1 অপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ প্রযুক্ত বল P বস্তুটির ওজন W অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইহার অর্থ, বস্তুটিকে খাড়াভাবে সরাসরি উপরে তুলিতে হইলে উহার নিম্নাভিমুখী ওজন-বলের সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করিতে হইত ; কিন্তু আনত তল ব্যবহারের ফলে ইহা অপেক্ষা কম বল প্রয়োগ করিয়াই এই একই উদ্দেশ্য, বা কার্য সাধিত হয়। BC-র তুলনায় AB-র দৈর্ঘ্য যত বেশী হইবে, অর্থাৎ আনত তলটি যত অধিক হেলাইয়া রাখা হইবে, উহা হইতে তত বেশী যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ আনত তলের কৌণিক অবস্থান যত হেলানো হইবে বস্তুকে অপেক্ষাকৃত তত সহজে উপরে তোলা যাইবে।

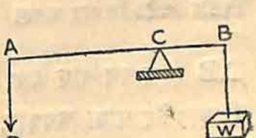
(খ) লিভার (Lever) :

কোন ঋজু, বা বক্র দণ্ডের কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু যদি সর্বদা স্থির থাকে এবং দণ্ডটি যদি ঐ বিন্দুর চতুর্দিকে অবাধে ঘুরিতে পারে, তাহা হইলে এইরূপ দণ্ডকে বলা হয় লিভার (lever)। লিভারের যে-বিন্দুটি সর্বদা স্থির থাকে তাহাকে বলা হয় **আলম্ব** (fulcrum)। লিভার-দণ্ডের কোন-একটি বিন্দুতে কোন ভার (weight), বা রোধ (resistance) থাকিলে অপর কোন বিন্দুতে বল (force) প্রয়োগ করিয়া ভারটিকে সহজে উত্তোলন করা যায়। বল ও ভারের (অর্থাৎ, রোধের) প্রয়োগ-বিন্দু আলম্বের একই দিকে, বা পরস্পর বিপরীত দিকে থাকিতে পারে। আলম্ব হইতে বল ও রোধের প্রয়োগ-বিন্দুর দূরত্বকে যথাক্রমে **বল-বাহু** (power-arm) ও **রোধ-বাহু** (resistance-arm) বলা হয়।

লিভার তিন প্রকার, যথা—(i) প্রথম শ্রেণীর লিভার, (ii) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ও (iii) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

(i) প্রথম শ্রেণীর লিভার : যে লিভারে আলম্বের এক দিকে থাকে ভার এবং বল প্রয়োগ করা হয় উহার বিপরীত দিকে, তাহাকে বলা হয় প্রথম শ্রেণীর লিভার। এই ধরনের লিভারে বল-বাহু সাধারণতঃ রোধ-বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

ধরা যাক, নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে AB একটি প্রথম শ্রেণীর লিভার ; C বিন্দুটি উহার আলম্ব। আলম্বের কাছাকাছি বিন্দু B-তে W ভার ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার বিপরীত দিকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বিন্দু A-তে নিম্নমুখী P বল প্রয়োগ করিয়া ভারটিকে তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এখানে AC হইল বল-বাহু এবং BC হইল রোধ-বাহু ; AC বাহু BC বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর। গাণিতিক পদ্ধতিতে সহজেই প্রমাণ করা যায়, লিভারটির সাম্য অবস্থায়,



প্রথম শ্রেণীর লিভার-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা

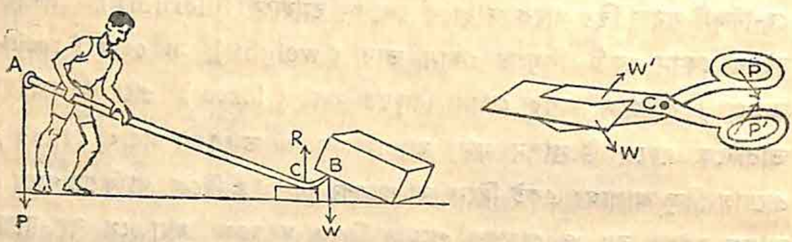
$$P \times AC = W \times BC$$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AC}{BC}$$

যেহেতু BC অপেক্ষা AC বাহু দীর্ঘতর, অতএব যান্ত্রিক সুবিধার মান 1 অপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ বস্তুটির ওজন অপেক্ষা কম বল প্রয়োগ করিয়াই উহাকে উপরে তোলা সম্ভব

হইতেছে। রোধ-বাহু (BC) অপেক্ষা বল-বাহু (AC) যত অধিক দীর্ঘ হইবে, লিভারটির যান্ত্রিক সুবিধাও তত বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম বল প্রয়োগ করিয়া অনেক বেশী ভার উত্তোলন করা সম্ভব হইবে।

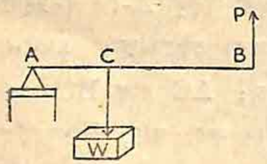
টিউবওয়েলের হাতল, ঢেঁকি, শাবল, কয়লা তুলিবার বেল্‌চা, মাটি কাটিবার



প্রথম শ্রেণীর লিভারের কার্যকারিতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

কোদাল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ; কাঁচি হইল দুইটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের সংযুক্ত রূপ। প্রদত্ত চিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে উহাদের যান্ত্রিক সুবিধার বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইবে।

(ii) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার : যে লিভারে আলম্বের যে দিকে ভার, বা রোধ থাকে, সেই দিকেই আরও দূরবর্তী কোন বিন্দুতে বল প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার। এই ধরনের লিভারে বল-বাহু সাধারণতঃ রোধ-বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর হইয়া থাকে।



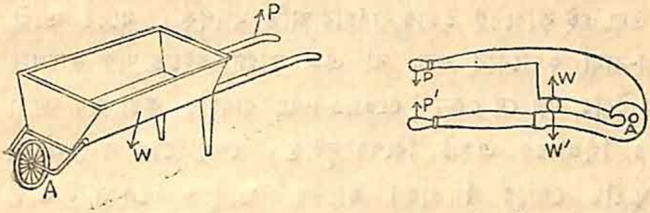
দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ব্যবস্থা

প্রদত্ত চিত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের একটি চিত্ররূপ প্রদর্শিত হইল। AB লিভারটি C বিন্দুতে W ভার ঝুলানো হইয়াছে এবং B বিন্দুতে ঊর্ধ্বমুখী P বল প্রয়োগ করা হইতেছে। C ও B উভয় বিন্দুই আলম্ব A বিন্দুর একই দিকে আছে, কিন্তু B বিন্দুটি C বিন্দু অপেক্ষা আরও দূরে অবস্থিত। এই ক্ষেত্রে AB হইল বল-বাহু এবং AC হইল রোধ-বাহু। এখন গণিতের সূত্র অনুসারে লিভারটির সাম্য অবস্থায়,

$$P \times AB = W \times AC$$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AB}{AC}$$

AB যেহেতু AC অপেক্ষা দীর্ঘতর, অতএব এই শ্রেণীর লিভারে অবশ্যই কিছু যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই ধরনের লিভারে বল ও ভার পরস্পর বিপরীত অভিমুখে কাজ করে।

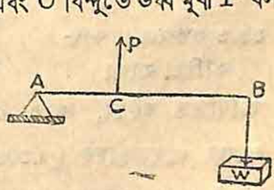


দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

সুপারী-কাটা যাঁতি, ময়লাবাহী হাত-গাড়ী, নৌকা বাহিবার দাঁড় প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ। যাঁতিতে দুইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার এক সঙ্গে কাজ করে। চিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে উহাদের যান্ত্রিক সুবিধা বুঝা যাইবে।

(iii) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার: যে লিভারে বল ও ভার আলম্বের একই দিকে থাকে, কিন্তু বল প্রয়োগ করা হয় আলম্বের অপেক্ষাকৃত নিকটতর কোন বিন্দুতে, তাহাকে বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের সহিত ইহার পার্থক্য হইল, এই ক্ষেত্রে রোধ-বাহু সর্বদাই বল-বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

ধরা যাক, প্রদত্ত চিত্রানুযায়ী AB একটি তৃতীয় শ্রেণীর লিভার ; A বিন্দুটি উহার আলম্ব, B বিন্দুতে W ভার ঝুলানো আছে এবং C বিন্দুতে ঊর্ধ্বমুখী P বল প্রয়োগ করিয়া ভারটিকে তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে বল-বাহু AC অপেক্ষা রোধ-বাহু AB দীর্ঘতর। গণিতের সূত্র অনুসারে ইহার সাম্য অবস্থায় আমরা পাই :



তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের চিত্ররূপ

$P \times AC = W \times AB$;

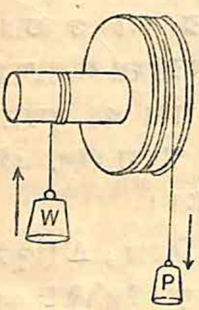
$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AC}{AB}$$

যেহেতু AB অপেক্ষা AC সর্বদাই ক্ষুদ্রতর, সুতরাং যান্ত্রিক সুবিধার মান 1 অপেক্ষা অবশ্যই কম হইবে। ইহার অর্থ, যান্ত্রিক সুবিধার পরিবর্তে এই ধরনের

লিভারে যান্ত্রিক অসুবিধা ঘটে, অর্থাৎ কম ভার তুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী বল প্রয়োগ করিতে হয়। এই অসুবিধা সত্ত্বেও এই ধরনের লিভারের প্রধান সুবিধা হইল এই যে, অন্যান্য লিভারের তুলনায় ইহাতে ভারকে স্থানচ্যুত করা যায় অনেক বেশী, এবং এই কারণেই ইহার ব্যবহার অতি ব্যাপক। যথেষ্ট ভারী মাল-পত্র উঠা-নামা করানোর জন্য, বা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে ক্রেন (crane)-যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহা তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। সেলাইয়ের কল, চিম্‌টা ইত্যাদিও তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। হাতের তালুতে কোন ভারী জিনিস লইয়া তুলিবার সময় হাতটি তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের ন্যায় কাজ করে।

(গ) চক্র ও অক্ষ-দণ্ড (Wheel And Axle) :

চক্র, বা চাকা (wheel) মূলতঃ কাঠ, বা ধাতুর তৈয়ারী একটি গোলাকার সুদৃঢ় বেষ্টনী মাত্র ; চক্রের কেন্দ্রে একটি ঋজু দণ্ড দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে, যাহাকে বলা হয় অক্ষ-দণ্ড (axle)। চক্র ও অক্ষ-দণ্ডের সমন্বয় মূলতঃ একটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের ন্যায় কার্য করে। ধরা যাক, একটি চক্র ও উহার সহিত সংযুক্ত অক্ষ-দণ্ডের উপর দুই গাছা তার, বা দড়ি পরস্পর বিপরীতমুখীভাবে জড়ানো হইয়াছে এবং উহাদের নিম্ন-প্রান্তদ্বয় হইতে যথাক্রমে P ও W দুইটি ভার ঝুলানো আছে। P ভারের দরুণ চক্রটি আবর্তিত হইয়া এই ভারটি নীচে নামিবে এবং চক্রের আবর্তনের ফলে অক্ষ-দণ্ডটিও আবর্তিত হইবে, আর সেই সঙ্গে W ভারটি উপরে উঠিবে। যদি অক্ষ-দণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের (cross-section) ব্যাসার্ধ হয় b এবং চক্রের ব্যাসার্ধ হয় b, তাহা হইলে এইক্ষেত্রে রোধ-বাহু হইবে a এবং বল-বাহু হইবে d ; চক্র ও অক্ষ-দণ্ড উভয়ের কেন্দ্র-বিন্দু অভিন্ন, যাহাকে মনে করা যাইতে পারে লিভারের আলম্ব। সুতরাং লিভারের নীতি অনুযায়ী :



চক্র ও অক্ষ-দণ্ডের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা

$$P \times b = W \times a$$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{b}{a}$$

চক্রের ব্যাসার্ধ b যেহেতু অক্ষ-দণ্ডের ব্যাসার্ধ a অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর, অতএব যান্ত্রিক সুবিধার মান 1 অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে, অর্থাৎ চক্রের উপর জড়ানো তারের সহিত অপেক্ষাকৃত কম ভার ঝুলাইয়া অক্ষ-দণ্ডের তারের সহিত সংযুক্ত অনেক অধিক ভারকে উপরে তোলা সম্ভব হয়। চক্রের তুলনায় অক্ষ-দণ্ডটির ব্যাসার্ধ যত কম হইবে, যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশী পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ অক্ষ-দণ্ডের সহিত সংযুক্ত কোন নির্দিষ্ট ভার উপরে তুলিতে চক্রের তারে আরও স্বল্প ভার প্রয়োগ করিলেই চলিবে।

কপিকল (Pulley) : সাধারণতঃ কুঁয়া হইতে পাত্র-ভর্তি জল, অথবা স্বল্পভারী মালপত্র উপরে তুলিবার জন্য ব্যবহৃত পুলি, বা কপিকলের কার্যকারিতা মূলতঃ উল্লিখিত চক্র ও অক্ষ-দণ্ডের অনুরূপ ; কিন্তু ইহাতে একটি সরু অক্ষ-দণ্ডে সংলগ্ন একটি চক্রের গায়ে একমুখীভাবে একগাছা মাত্র দড়ি, বা তার জড়ানো থাকে। দড়ির একপ্রান্তে কায়িক শক্তি প্রয়োগ করিলে চক্রটি ঘুরিয়া তাহাতে দড়ি জড়ায়, আর তাহার অপর প্রান্তে আবদ্ধ ভারী জিনিস সহজে স্বল্পশক্তি প্রয়োগে উপরে উঠে। ভারোত্তলনে চক্র ও অক্ষ-দণ্ডের কার্যকারিতার উল্লিখিত তথ্যানুসারে সহজেই বুঝা যায়, কপিকল ব্যবহারে যান্ত্রিক সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাপ (Heat)

পাঠ্যসূচী ঃ তাপের প্রকৃতি ; তাপ ও তাপমাত্রা ; তাপের পরিমাণ নির্ধারক বিষয়সমূহ ; শক্তির অন্যতম রূপ হিসাবে তাপ ; তাপের সঙ্গে কার্যের সম্পর্ক।

তাপ বলিতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে আমাদের সকলেরই একটা মোটা-মুটি ধারণা আছে। কোন উত্তপ্ত বস্তু স্পর্শ করিলে আমরা গরম বোধ করি ; আবার, এক খণ্ড বরফ হাতে ধরিলে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বোধ হয়। দিনের বেলা রৌদ্রে দাঁড়াইলে গরম লাগে ; পক্ষান্তরে, ঘরের ভিতরে, অথবা রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ হয়। এই সকল বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে সাধারণভাবে বলা যায়, আমাদের দেহে গরম, বা ঠাণ্ডা বোধ করিবার এই যে অনুভূতি, তাহার বাহ্যিক মূল কারণকে বলা হয় **তাপ** (heat)। কিন্তু আমাদের দেহে তাপের এই অনুভূতি নিতান্তই একটি আপেক্ষিক ব্যাপার ; আমাদের গাত্র-ত্বকের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেহ অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত কোন বস্তুর সংস্পর্শে আমরা গরম বোধ করি ; আর তদপেক্ষা কম উত্তপ্ত বস্তুকে আমরা ঠাণ্ডা বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা, বা গরম সকল বস্তুতেই কম-বেশী কিছু-না-কিছু পরিমাণ তাপ থাকিবেই। সুতরাং কেবল অনুভূতির সাহায্যে তাপের আপেক্ষিক অস্তিত্ব মাত্র মোটামুটি বুঝা যায় ; কিন্তু তাপের প্রকৃতি, বা স্বরূপ ইহা হইতে কিছুমাত্র স্পষ্ট হয় না।

তাপের প্রকৃতি
(Nature of Heat)

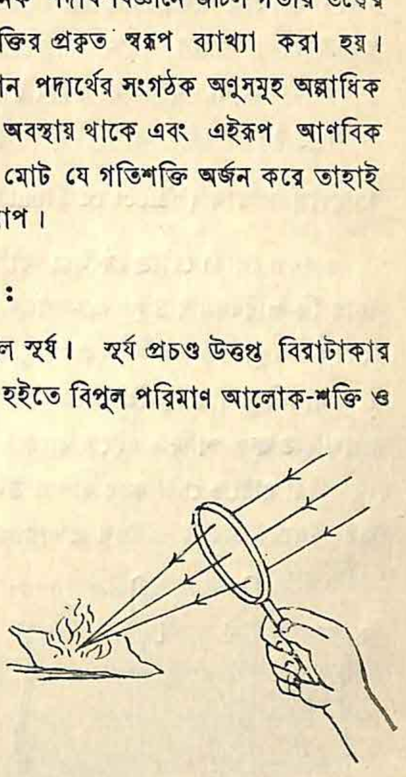
রৌদ্রে এক খণ্ড লোহা ফেলিয়া রাখিলে উহা উত্তপ্ত হয়, কিন্তু স্পর্শ না করিলে তাহা বুঝা যায় না ; বস্তুটি দৃশ্যতঃ যেমন ছিল তেমনই থাকে। রৌদ্রের তাপে লোহা গরম হয়, কিন্তু সেই তাপ আমরা দেখিতে পাই না, স্পর্শ করিলে উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি মাত্র। তাপে বস্তুর **ওজন** বাড়ে না, তাপ দেখাও যায় না। তাপের কোন বস্তু-সত্তা নাই, উহার অদৃশ্য প্রভাবে বস্তু উত্তপ্ত হয়, যাহা কেবল আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া তাপের

অনুভূতি জাগায়। সুতরাং, তাপ কোন পদার্থ নহে ; উহা কেবল অনুভূতি-সাপেক্ষ বস্তু-সত্তাহীন কোন-কিছু, যাহাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় এক প্রকার **শক্তি** (energy) : **তাপ-শক্তি** (heat energy)।

তাপ-শক্তি মূলতঃ অদৃশ্য তরঙ্গ-ধর্মী। উত্তপ্ত বস্তু হইতে বিকিরিত (radiated) তাপ-শক্তি তরঙ্গাকারে চারিদিকে বিস্তৃত হয় এবং দূরবর্তী বস্তুকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে জটিল গতীয় তত্ত্বের (kinetic theory) সাহায্যে তাপ-শক্তির প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল, যে-কোন পদার্থের সংগঠক অণুসমূহ অল্পাধিক পরিমাণে নিয়ত চঞ্চল ও যথেচ্ছ গতিশীল অবস্থায় থাকে এবং এইরূপ আণবিক গতির প্রভাবে কোন বস্তুর অণুসমূহ মোট যে গতিশক্তি অর্জন করে তাহাই হইল বস্তুটিতে নিহিত তাপ-শক্তির পরিমাপ।

তাপের উৎস (Source of Heat) :

তাপ-শক্তির মূল ও প্রধান উৎস হইল সূর্য। সূর্য প্রচণ্ড উত্তপ্ত বিরাটাকার একটি জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড বিশেষ ; ইহা হইতে বিপুল পরিমাণ আলোক-শক্তি ও তাপ-শক্তি অহরহঃ চারিদিকে তরঙ্গাকারে বিকিরিত হইতেছে, যাহার কিয়দংশ মাত্র পৃথিবীতে আসে। সূর্যালোকের সঙ্গে সৌর তাপও যে মিশিয়া থাকে, তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায় : একখানা আতস-কাঁচ (burning-glass) সূর্যালোকের অভিমুখে ধরিলে আলোক-রশ্মিগুলি আতস-কাঁচটির পশ্চাতে যে বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইয়া উজ্জ্বল দেখায়, সেখানে যথেষ্ট উত্তাপেরও সৃষ্টি হয় এবং কাগজ, বা অপর কোন সহজদাহ্য বস্তু সেই উত্তাপে সহজেই জ্বলিয়া উঠে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, সূর্য হইতে আলোক-রশ্মির সঙ্গে-সঙ্গে তাপ-রশ্মিও পরস্পর মিলিতভাবে আসে।



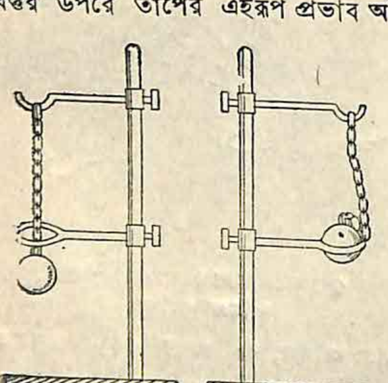
সূর্যালোকে তাপ ও আলোক-শক্তির সংমিশ্রণ পরীক্ষা

কেবল সূর্যই নহে, কৃত্রিম উপায়েও তাপের বিভিন্ন উৎস আমরা সৃষ্টি করিতে পারি। (i) কাঠ, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালাইলে তাপ

পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে জ্বালানী পদার্থসমূহের দহনের **রাসায়নিক শক্তি** (chemical energy) তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। (ii) তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারাও তাপ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক হিটার, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদিতে সরু তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনার ফলে যথেষ্ট তাপের উদ্ভব ঘটে। এই সকল ক্ষেত্রে **তড়িৎ-শক্তি** (electrical energy) প্রধানতঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। (iii) দুই হাতের তালু, বা দুই খণ্ড কাঠ, বা পাথর পরস্পর ঘষিলে তাপের উদ্ভব ঘটে। এই সকল ক্ষেত্রে ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করিবার জন্য যে **যান্ত্রিক শক্তি** (mechanical energy) ব্যয়িত হয়, তাহাই তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

তাপের প্রভাব (Effect of Heat) :

একখণ্ড লোহা রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে উহা উত্তপ্ত হয়; কিন্তু কেন হয়, উহার কি পরিবর্তন ঘটে ? প্রকৃতপক্ষে, তাপ-শক্তির প্রভাবে যে-কোন পদার্থের সংগঠক অণুসমূহের গতি-চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় এবং উহাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃআণবিক আকর্ষণ (intermolecular attraction) হ্রাস পাইয়া অণুগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে। ইহার ফলে অণুগুলি পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করে বলিয়া উত্তপ্ত বস্তুমাত্রই **আয়তনে বাড়ে**। কঠিন বস্তুর উপরে তাপের এইরূপ প্রভাব অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটি লৌহ-গোলক (a) ঠাণ্ডা অবস্থায় একটি রিং (ring)-এর ভিতর দিয়া সহজেই উঠা-নামা করিতে পারে ; কিন্তু গোলকটিকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে দেখা যায়, উহা (b) আয়তনে বাড়িবার ফলে আর ঐ রিং এর ভিতর দিয়া গলে না। উত্তাপের ফলে বস্তুর আয়তন-বৃদ্ধি, বা সম্প্রসারণ তাপ-শক্তির একটি প্রকৃতিগত ধর্ম। যথেষ্ট তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ একই কারণে পদার্থের ভৌত অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ কঠিন পদার্থ তরলে, বা তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়।



উত্তাপে ধাতুর আয়তন বৃদ্ধির পরীক্ষা

তাপ ও তাপমাত্রা

(Heat and Temperature)

কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা ক্রমে বৃদ্ধি পায় ; আর, উহা হইতে তাপ পরিবাহিত, বা বিকিরিত হইয়া গেলে বস্তুটি ধীরে-ধীরে শীতল হয়। আপাতদৃষ্টিতে ইহা হইতে মনে হইতে পারে, কোন বস্তুর উষ্ণতা, বা শীতলতা কেবল উহাতে নিহিত তাপ-শক্তির পরিমাণের উপরে সরাসরি নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নিতান্তই একটি ভ্রান্ত ধারণা ; একটি অতি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এক গ্লাস ফুটন্ত জলে এক গ্লাস সাধারণ উষ্ণ জল মিশাইলে এই মিশ্রিত জলকে ফুটন্ত জলের ন্যায় অত উত্তপ্ত বলিয়া বোধ হয় না; অথচ ফুটন্ত ও সাধারণ উষ্ণ উভয় জলেই অল্লাধিক পরিমাণে তাপ সঞ্চিত ছিল, কাজেই মিশ্রিত জলের মোট তাপ অবশ্যই ফুটন্ত জলের মোট তাপ অপেক্ষা অধিক হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কোন বস্তুতে সঞ্চিত মোট তাপ-শক্তির পরিমাণ এবং বস্তুটির উষ্ণতা, বা শীতলতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। কোন বস্তুর উষ্ণতা, বা শীতলতা উহার তাপীয় অবস্থা (thermal state) নির্দেশ করে; **বস্তুর তাপীয় অবস্থা, অর্থাৎ উহার উষ্ণতা, বা শীতলতার অবস্থাগত বিভিন্নতামূলক পরিমাপকে বলা হয় বস্তুর তাপমাত্রা** (temperature)।

তাপ-শক্তির একটি সাধারণ ধর্ম হইল, অ-সমান তাপীয় অবস্থার দুইটি বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখিলে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর বস্তুটি (অর্থাৎ যাহার তাপমাত্রা বেশী) হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর বস্তুটিতে (অর্থাৎ যাহার তাপমাত্রা কম) স্বতঃই তাপ প্রবাহিত হইতে থাকে, যতক্ষণ না উভয় বস্তুই একই তাপীয় অবস্থায় আসে, অর্থাৎ উভয় বস্তুর তাপমাত্রা সমান হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কোন্ বস্তুতে মোট কি পরিমাণ তাপ ছিল, তাহার উপর এইরূপ তাপ-প্রবাহের দিক্ কিছুমাত্র নির্ভর করে না ; তাপ-প্রবাহ সর্বদাই উচ্চতর হইতে নিম্নতর তাপীয় অবস্থা-অভিমুখী হইয়া থাকে। এই বিচারে বলা যায়, **কোন বস্তুর তাপমাত্রা হইল উহার তাপীয় অবস্থা-নির্দেশক এমন একটি ভৌত বৈশিষ্ট্য, যাহা তাপীয় অবস্থার বৈষম্য-হেতু সেই বস্তুটি হইতে অন্য বস্তুতে, অথবা উহার বিপরীত অভিমুখে তাপ-প্রবাহের দিক্ নির্দেশ করে।**

তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য :
(Distinction between Heat and Temperature)

তাপ ও তাপমাত্রা একার্থক নহে, তথ্যগত সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ; উহাদের প্রধান-প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(i) তাপ প্রয়োগের ফলে যে-কোন বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে, অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ; আবার, কোন বস্তু তাপ বর্জন করিলে উহার উষ্ণতা কমে, অর্থাৎ তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সুতরাং, তাপকে বলা যাইতে পারে **কারণ** (cause) এবং তাপমাত্রা হইল তাপের **ফল** (effect)।

(ii) তাপ হইল এক প্রকার **শক্তি** ; পক্ষান্তরে, কোন বস্তুর তাপমাত্রা উহার উষ্ণতা, বা তাপীয় অবস্থা (thermal state) নির্দেশ করে।

(iii) কোন নির্দিষ্ট বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে, অথবা অন্য বস্তু হইতে সেই বস্তুটিতে তাপ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইবে, তাহা বস্তুদ্বয়ের তাপমাত্রার বিভিন্নতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, উহাদের মধ্যে নিহিত মোট তাপ-শক্তি দ্বারা নহে।

তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য একটি সহজ তুলনামূলক দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতে পারে। কোন পাত্রে যত বেশী জল ঢালা যায়, পাত্রে জলের তল তত উপরে উঠে ; অনুরূপভাবে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে যত বেশী পরিমাণ তাপ-শক্তি সরবরাহ করা যায়, তাহার তাপমাত্রাও অবশ্যই তত বেশী বৃদ্ধি পায়। তাপকে পাত্রস্থ জলের মোট পরিমাণের সহিত এবং তাপমাত্রাকে পাত্রস্থ জলের তলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিলেও জলের পরিমাণ ও জলের তল যেমন এক নহে, তাপ ও তাপমাত্রাও তেমনই একার্থ জ্ঞাপক নহে।

দুইটি জলপূর্ণ পাত্রকে নলপথে পরস্পর সংযুক্ত করিলে, যে-পাত্রে জলের তল অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতায় অবস্থিত সেই পাত্র হইতে নিম্নতর জলতল-বিশিষ্ট পাত্রটিতে জল প্রবাহিত হয় ; কোন্ পাত্রে মোট কি পরিমাণ জল আছে তাহার উপর এই জল-প্রবাহের দিক্ কিছুমাত্র নির্ভর করে না। অনুরূপভাবে, তাপ সর্বদা উষ্ণতর বস্তু হইতে শীতলতর বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ না একটির তাপমাত্রা বাড়িয়া ও অপরটির কমিয়া অবশেষে উভয়ের তাপমাত্রাই পরস্পর সমান হয়। বস্তু দুইটিতে সঞ্চিত তাপের মোট পরিমাণের উপরে এইরূপ তাপ-প্রবাহের অভিমুখ কিছুমাত্র নির্ভর করে না ; তাপ সর্বদা

উচ্চতর তাপমাত্রার বস্তু হইতে নিম্নতর তাপমাত্রার বস্তুতে প্রবাহিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক বাল্‌তি সাধারণ উষ্ণ জলে একটি অত্যুত্তপ্ত লোহার সূঁচ ফেলিলে জলের তুলনায় সূঁচটিতে নিহিত তাপ অনেক কম হইলেও উহার তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশী বলিয়া উত্তপ্ত সূঁচটি হইতে জলে তাপ প্রবাহিত হয় এবং অবশেষে উভয়ে সমান উষ্ণতা, বা তাপমাত্রায় উপনীত হইবার পর উহাদের মধ্যে তাপ-প্রবাহ আর ঘটে না।

কোন বস্তুর তাপমাত্রা নির্ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার (thermometer), বা তাপমান-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, যাহা পূর্ববর্তী শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকে আলোচিত ও পঠিত হইয়াছে।

তাপের পরিমাণ-নির্ধারক বিষয়সমূহ
(Factors Determining the Quantity of Heat)

তাপের পরিমাণ ক্যালোরি (calorie) এককে মাপা হয়; 1 গ্র্যাম বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করিতে যে-পরিমাণ তাপ-শক্তি প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলা হয় **ক্যালোরি**। কোন বস্তু কর্তৃক গৃহীত, বা তাহা হইতে বর্জিত মোট তাপের পরিমাণ উহার তিনটি ভৌত ধর্মের উপরে নির্ভরশীল; যেমন—(i) বস্তুটির ভর (mass), (ii) উহার পদার্থিক উপাদানের **আপেক্ষিক তাপ** (specific heat) ও (iii) বস্তুটির উষ্ণতা, বা **তাপমাত্রা** (temperature)। এই তথ্যটি $H = m.s.t.$ সমীকরণের সাহায্যে সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়; ইহাতে H হইল কোন বস্তু কর্তৃক গৃহীত, বা বর্জিত মোট তাপ-শক্তি, m হইল বস্তুটির ভর, s উহার আপেক্ষিক তাপ এবং t তাপমাত্রার বৃদ্ধি, বা হ্রাস।

উল্লিখিত তিনটি ধর্মের তাৎপর্য নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল:

(i) **বস্তুর ভর** (mass): একই পদার্থে গঠিত অ-সমান ভর-বিশিষ্ট ছোট-বড় দুইটি বস্তুর তাপমাত্রা সমান বৃদ্ধি করিতে বিভিন্ন পরিমাণ তাপ-শক্তি প্রয়োজন হয়। যে-বস্তুর ভর অধিক, তাহার ক্ষেত্রে অধিক তাপ লাগে; অর্থাৎ, কোন বস্তুতে সঞ্চিত তাপ-শক্তির পরিমাণ উহার ভরের সমানুপাতিক। যেমন, ছোট-বড় দুইটি লোহার বলকে বুনসেন দীপ-শিখায় একই তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিয়া অতঃপর সম-পরিমাণ জল-পূর্ণ দুইটি বাল্‌তিতে উহাদের পৃথক-পৃথকভাবে নিমজ্জিত করিলে দেখা যায়, বৃহত্তর বলটির ক্ষেত্রে বাল্‌তির জল অপর বাল্‌তির জল অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হয়। ইহার কারণ, বৃহত্তর

বলটির ভর, অর্থাৎ বস্তু-পরিমাণ অধিক বলিয়া উহাতে অধিকতর পরিমাণ তাপ সঞ্চিত ছিল ; কাজেই ক্ষুদ্রতর বলটির তুলনায় বৃহত্তর বলটি হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ তাপ বাল্‌তির জলে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তপ্ত করিয়া তোলে।

(ii) **আপেক্ষিক তাপ** (specific heat): পরীক্ষায় দেখা যায়, বিভিন্ন পদার্থে গঠিত সমান ভর-বিশিষ্ট দুইটি বস্তুতে সম-পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিলেও উহাদের তাপমাত্রার বৃদ্ধি সমান হয় না ; অথবা বিপরীতভাবে বলা যায়, সমান তাপমাত্রা-স্থিত সমান ভর-বিশিষ্ট দুইটি বিভিন্ন পদার্থে গঠিত বস্তুতে সঞ্চিত মোট তাপের পরিমাণের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে। একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে বিষয়টি অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। লোহা ও তামার দুইটি সমান ওজনের বল ফুটন্ত জলের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ রাখিয়া উভয়কেই সমান তাপ-মাত্রায় উত্তপ্ত করা হইল। অতঃপর, বল দুইটিকে একটি পুরু মোমের প্লেটের উপর রাখিলে দেখা যাইবে, উহারা মোম গলাইয়া ধীরে-ধীরে প্লেটের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। বল দুইটি ক্রমে-ক্রমে শীতল হইয়া উভয়েই যখন পুনরায় সাধারণ তাপমাত্রায় পৌঁছিবে, তখন দেখা যাইবে, লোহার বলটি তামার বলটি অপেক্ষা প্লেটের মধ্যে অধিকতর গভীরে প্রবেশ করিয়াছে। সহজেই বুঝা যায়, ফুটন্ত জলে উত্তপ্ত করিবার সময় যে-বলটি যতটা পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা আবার পরে ঠিক সেই পরিমাণ তাপ বর্জন করিয়া শীতল হইয়াছে, এবং মোমও অবশ্যই ঠিক সেই অনুপাতে বিগলিত হইয়াছে। অতএব, এই পরীক্ষা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, বল দুইটির ভর একই হইলেও উহাদের তাপমাত্রা সমান বৃদ্ধি করিতে তামার বলের তুলনায় লোহার বলটি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিয়াছে। অতএব সহজেই বুঝা যায়, বিভিন্ন পদার্থের তাপ গ্রহণ, বা বর্জনের ক্ষমতা বিভিন্ন, যাহা পরিমাপ করা হয় বস্তুর পদার্থিক উপাদানের আপেক্ষিক তাপ (specific heat) দ্বারা।

একক ভর পরিমাণ কোন পদার্থের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলা হয় পদার্থটির আপেক্ষিক তাপ। সি. জি. এস. পদ্ধতিতে উহার একক হইল 'ক্যালোরি/গ্রাম/ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড'। বিভিন্ন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বিভিন্ন ; জলের 1, লোহার 0·113, তামার 0·093 ইত্যাদি। যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ কম,

সেই পদার্থে তৈয়ারী বস্তুর ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম তাপেই বস্তুটির তাপমাত্রা বেশী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কোন-কোন পদার্থ, যেমন বিভিন্ন ধাতুসমূহ অপেক্ষাকৃত কম তাপেই বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠে; কারণ, উহাদের আপেক্ষিক তাপ কম। আবার, সিমেণ্ট, ইট, কাঠ, পাথর, জল ইত্যাদির আপেক্ষিক তাপ বেশী বলিয়া উহাদের উত্তপ্ত করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী তাপ প্রয়োজন হয়। একই তাপমাত্রায় রক্ষিত এক পাউণ্ড লোহা অপেক্ষা এক পাউণ্ড জলে অধিকতর পরিমাণ তাপ সঞ্চিত থাকে; কারণ, লোহার তুলনায় জলকে এই তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ তাপ সরবরাহ করিতে হয়।

(iii) **তাপমাত্রা** (temperature): কোন নির্দিষ্ট বস্তুর তাপমাত্রা যত অধিক হইবে, উহাতে অবশ্যই তত অধিক পরিমাণ তাপ-শক্তি নিহিত আছে বুঝিতে হইবে; কারণ, তাপমাত্রা হইল তাপের ফল। ছায়ায় রক্ষিত একটি লৌহখণ্ড অপেক্ষা রৌদ্রে রক্ষিত সম-আয়তনের একটি লৌহখণ্ডের উষ্ণতা, বা তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে; যেহেতু, উহাতে অধিকতর পরিমাণ তাপ সঞ্চিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা অধিকতর পরিমাণ সৌর-তাপ শোষণ করিবার ফলেই উহার তাপমাত্রার অধিকতর বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, শোষিত মোট তাপের পরিমাণও বাড়িয়াছে।

শক্তির অন্যতম রূপ হিসাবে তাপ
(Heat as a Form of Energy)

আমরা জানি, শক্তির বহু বিভিন্ন প্রকার-ভেদ আছে; তাপ-শক্তি (heat energy) ইহাদের অন্যতম। তাপ-শক্তি ব্যতীত যান্ত্রিক শক্তি, তড়িৎ-শক্তি, চৌম্বক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, শব্দ-শক্তি, আলোক-শক্তি ইত্যাদি বহু বিভিন্ন রূপে শক্তির বাহিক প্রকাশ ঘটে। বস্তুতঃ, শক্তির সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই; এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় মাত্র। সুতরাং তাপ-শক্তি সৃষ্টি করিতে হইলে অবশ্যই অন্য কোন প্রকার শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রকার শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নিম্নে আলোচনা করা হইল:

(a) **যান্ত্রিক শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তর:** দিয়াশলাই আবিষ্কারের পূর্বে আদিম কালের মানুষ কাঠে-কাঠে ঘষিয়া, বা চকমকি পাথর পরস্পর

ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইত। ছুরি-কাঁচিতে শান দিবার সময় উহাদের একটি অমসৃণ ঘূর্ণায়মান প্রস্তরখণ্ডের সংস্পর্শে রাখা হয়; ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করিতে যে যান্ত্রিক শক্তি ব্যয়িত হয় তাহার বিনিময়ে এত অধিক উত্তাপ সৃষ্টি হয় যে, উহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইতে দেখা যায়। আবার, দ্রুতগতিতে ট্রেন চলিবার সময় চাকা ও লৌহপাটির পারস্পরিক ঘর্ষণে যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হইবার ফলে উভয়েই উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

(b) **তড়িৎ-শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তর:** বৈদ্যুতিক বাতি, হিটার, ইস্ত্রি প্রভৃতি হইতে যে আলোক ও তাপ পাওয়া যায় তাহা তড়িৎ-শক্তির অপরাপর শক্তিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত। বৈদ্যুতিক বাতিতে ধাতব তার-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহের ফলে কেবল যে আলোক পাওয়া যায়, তাহাই নহে; তড়িৎ-শক্তি আংশিকভাবে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া তার-কুণ্ডলীটিকে যথেষ্ট উত্তপ্তও করে। বৈদ্যুতিক হিটার, ইস্ত্রি ইত্যাদিতে তড়িৎ-শক্তি অনুরূপভাবে প্রধানতঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তিত হইয়া থাকে।

(c) **রাসায়নিক শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তর:** যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিছু-না-কিছু তাপীয় পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। বিক্রিয়ার রাসায়নিক শক্তি অনেক ক্ষেত্রে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়; যেমন, জলে এক খণ্ড সোডিয়াম ধাতু ফেলিলে পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয় এবং বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তির বিনিময়ে এত অধিক পরিমাণ তাপ-শক্তি উদ্ভূত হয় যে, বায়ুর অক্সিজেনের সহিত ঐ হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগের ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস স্বতঃই জ্বলিয়া উঠে।

বিভিন্ন প্রকার শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তরের এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মোট কথা, তাপ হইল এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি এবং তাপ সৃষ্টি করিতে হইলে অবশ্যই অপর কোন প্রকার শক্তি ব্যয় করিতে হয়।

তাপ ও কার্যের পারস্পরিক সম্পর্ক
(Relation between Heat and Work)

শক্তির অবিনাশিতা (conservation of energy) সূত্র অনুসারে (পৃষ্ঠা 24), যখনই কোন এক প্রকার শক্তি অন্তর্হিত হয় তখনই ঠিক সম-পরিমাণ অপর কোন প্রকার শক্তি অবশ্যই উৎপন্ন হয় এবং শক্তির মোট পরিমাণ সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকে; কারণ, শক্তি সৃষ্টিও করা যায় না, উহার বিনাশও নাই,—শক্তি

অবিনশ্বর। তাপ-শক্তি ও যান্ত্রিক শক্তির (বা, কার্যের) পারস্পরিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে শক্তির অবিনাশিতা সূত্রটি সমভাবে প্রযোজ্য। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি, বা কার্যকে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করিলে সর্বদা সম-পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়।

1867 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী জেম্‌স্ প্রেস্‌কট জুল (James Prescott Joule) বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এই তথ্যটির সত্যতা প্রতিপন্ন করেন। যদি W পরিমাণ কার্য করিলে H পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে W/H অনুপাতটির মান সর্বদা কোন সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক রাশি হইবে, অর্থাৎ W/H = ধ্রুবক (constant); এই ধ্রুবকটিকে বলা হয় **তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক** (mechanieal equivalent of heat); ইহার প্রতীক হইল J ; অর্থাৎ,

$$\frac{W}{H} = J, \text{ অথবা } W = J.H$$

এই সমীকরণে H = 1 বসাইলে আমরা পাই, W = J ; অর্থাৎ, **একক পরিমাণ তাপ পাইতে হইলে যে-পরিমাণ কার্য করিতে হয়, তাহাকে বলা হয় তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক, J।**

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, সি. জি. এস. পদ্ধতিতে J-এর মান 4·2 জুল/ক্যালোরি, বা $4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ/ক্যালোরি ; অর্থাৎ, 4·2 জুল, বা $4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ পরিমাণ কার্যকে সম্পূর্ণরূপে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করিলে 1 ক্যালোরি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে, 1 ক্যালোরি পরিমাণ তাপ ব্যয় করিলে 4·2 জুল, বা $4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলোক (Light)

পাঠ্যসূচী : আলোকের উৎস; আলোক-রশ্মি; আলোকের স্বরূপ ও গতিবেগ; আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ; প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা; উত্তল লেন্সের অভিসারীয় ক্রিয়া ও ফোকাস-দূরত্ব; বিবর্ধক কাঁচ হিসাবে উত্তল লেন্সের ব্যবহার; আলোকের বিচ্ছুরণ ও বর্ণালী (পরীক্ষা ও প্রদর্শন)।

আলোক না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। অন্ধকার ঘরে কোন জিনিসই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু বাতি জ্বালিলে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠে; আমরা সব-কিছু দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে বাতির আলোক বস্তুর গায়ে প্রতিহত হইয়া আসিয়া আমাদের চোখে পড়িলে চোখের স্নায়ুগুলী উত্তেজিত হয় এবং তাহার ফলে বস্তুটি সম্বন্ধে আমাদের দর্শনের অনুভূতি জন্মে। অতএব বলা যায়, আমাদের দর্শন-অনুভূতির বাহ্যিক মূল কারণ হইল **আলোক** (light)।

বস্তুতঃ, আমরা আলোক দেখিতে পাই না, আলোকিত বস্তু দেখি। অন্ধকার ঘরের বন্ধ জানালার কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করিলে আলোক দেখা গেল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ আলোকের গতিপথে যে-সকল ধূলিকণা বাতাসে ভাসমান থাকে সেইগুলিই আলোকিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ক্ষেত্রে আমরা আলোক দেখি না, যাহা দেখি তাহা আলোকিত ধূলিকণার মাধ্যমে আলোকের গতি-পথ মাত্র। বস্তুতঃ, আলোকের কোন দৃশ্য বস্তু-সত্ত্বা নাই; ইহা এক প্রকার **শক্তি** (energy) মাত্র, যাহা উৎস হইতে সর্বদা অদৃশ্য তরঙ্গাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

আলোকের উৎস
(Source of Light)

সূর্য আলোকের মূল ও প্রধান উৎস। সূর্য একটি বিশালাকার জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড বিশেষ, যাহা অবিরত বিপুল পরিমাণ আলোক-শক্তি চারিদিকে বিকিরণ

করিতেছে এবং তাহারই কিয়দংশ মাত্র আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। রাত্রিকালে আমরা যে চন্দ্রালোক পাই তাহারও মূল উৎস কিন্তু সূর্য; চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই। সূর্যালোক চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে; কাজেই চন্দ্রকে আলোকের স্বাভাবিক উৎস বলা যায় না। চন্দ্রালোক আসলে সূর্যালোকেরই প্রকার-ভেদ মাত্র।

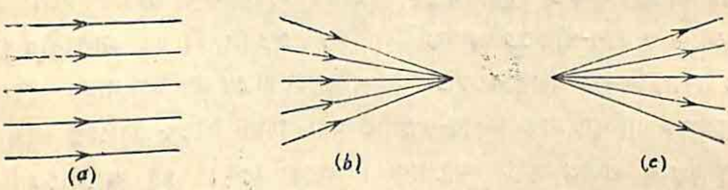
সূর্যালোক ব্যতীত বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ, জান্তব ও খনিজ তেল, চর্বি, মোম প্রভৃতি জ্বালাইয়াও আমরা কৃত্রিম উপায়ে আলোক উৎপাদন করি। এই সকল জ্বালানীর সুসংহত দহনে যে প্রদীপ্ত শিখা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আলোক চারিদিকে বিকিরিত হয়; সুতরাং এই সকল জ্বালানীর জ্বলন্ত শিখাকে আলোকের কৃত্রিম উৎস বলা যায়। মূলতঃ অবশ্য এই সকল জৈব জ্বালানীতে সৌর শক্তিই সঞ্চিত হইয়া থাকে, দহনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তাহা আলোক ও তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং, বিভিন্ন জ্বালানীর দহনে সৃষ্ট প্রদীপ্ত শিখার আলোককেও সৌর শক্তিরই কৃত্রিম রূপ বলা যায়। আবার, বৈদ্যুতিক বাতিতে ধাতব তার-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহের ফলে উহা অত্যুত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া আলোক বিকিরণ করে। এই আলোকের মূল উৎস যে তড়িৎ-শক্তি (electrical energy) তাহা সাধারণতঃ কয়লার দহনে উৎপন্ন তাপ-শক্তির সাহায্যে উৎপাদিত হয়। খনিজ কয়লা ভূ-প্রোথিত উদ্ভিদেরই পরিবর্তিত রূপ, উহাতে সৌরশক্তি সঞ্চিত থাকে। সুতরাং বলা যায়, কোন জ্বালানীর দহনে উদ্ভূত প্রদীপ্ত শিখাই হউক, বা বৈদ্যুতিক প্রবাহে প্রদীপ্ত তার-কুণ্ডলীই হউক, আলোকের যে-কোন উৎসই মূলতঃ সূর্য, বা **সৌরশক্তি** (solar energy)।

মোট কথা, অত্যুত্তপ্ত প্রদীপ্ত বস্তুমাত্রই আলোকের উৎস। যে-কোন দাহ্য বস্তুকে জ্বালাইলে, এমন কি, এক খণ্ড লোহাকে অত্যুত্তপ্ত করিলেও তাহা হইতে অবশ্যই কিছু আলোক বিকিরিত হয়; কিন্তু তাহা তেমন লক্ষ্যণীয় হয় না। কোন বস্তুর তাপমাত্রা যথেষ্ট অধিক হইলে তাহা হইতে তাপ-শক্তির সহিত যথেষ্ট আলোক-শক্তিও বিকিরিত হইয়া থাকে; যেমন সূর্য, জ্বালানী তেল, বা মোমের প্রদীপ্ত শিখা, বৈদ্যুতিক বাল্ব প্রভৃতি। কিন্তু পার্থিব উৎস যাহাই হউক-না-কেন, উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল, আলোক ও তাপ-শক্তির মূল উৎস হইল সূর্য।

আলোক-রশ্মি (Ray of Light)

যে-কোন একক মাধ্যমের (যেমন—বায়ু, জল, কাঁচ ইত্যাদি) ভিতর দিয়া আলোক সর্বদা সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়। আলোকের এক-একটি অতি-সূক্ষ্ম রেখা-পথকে বলা হয় **আলোক-রশ্মি** (ray of light)। ইহা একটি সরলরেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং আলোক কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা একটি তীর-চিহ্ন দ্বারা বুঝানো হয়।

এককভাবে অবশ্য কোন আলোক-রশ্মিই আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করা সম্ভব নহে, আমরা যাহা দেখি তাহা অনেকগুলি রশ্মির সমষ্টি ; ইহাকে বলা হয় **আলোক-রশ্মিগুচ্ছ** (beam of light)। গতিপথ অনুসারে আলোকের রশ্মিগুচ্ছ তিন প্রকার হইতে পারে, যেমন—



বিভিন্ন প্রকার আলোক-রশ্মিগুচ্ছ

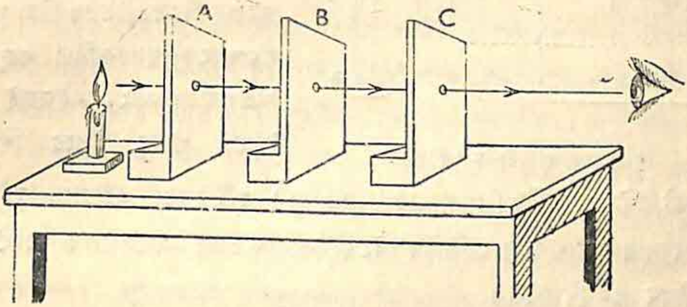
(i) আলোকের যে রশ্মিগুচ্ছের সংগঠক প্রতিটি রশ্মি পরস্পর সমান্তরালভাবে চলে, তাহাকে বলা হয় **সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ** (parallel beam), চিত্র (a) ; (ii) যে আলোক-রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলি ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া অবশেষে কোন একটি বিন্দুতে মিলিত হয়, তাহাকে বলে **অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ** (convergent beam), চিত্র (b) ; (iii) যে রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলি ক্রমশঃ পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া ছড়াইয়া যায়, তাহাকে বলা হয় **অপসারী রশ্মিগুচ্ছ** (divergent beam), চিত্র (c)।

আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে :
(Light always moves in a straight line)

অন্ধকারে টর্চ জালিলে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, উহার মুখ হইতে নির্গত আলোকগুচ্ছ সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়। ট্রেন, বা মোটরগাড়ীর হেড্-লাইট

হইতে যে আলোক বাহির হয় তাহাও ঋজু পথে চলে, দেখা যায়। অন্ধকার ঘরে জানালার ফাঁক দিয়া একফালি সূর্যালোক প্রবেশ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, প্রবিষ্ট আলোক-রশ্মিগুচ্ছের প্রবাহ-পথ সরলরৈখিক ধরনের। বস্তুতঃ, আলোক যতক্ষণ কোন একটি সুনির্দিষ্ট সমসত্ত্ব একক মাধ্যমের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ তাহা সর্বদাই ঋজু রেখায় সরল পথে অগ্রসর হয়; আলোক কখনই বাঁকা পথে চলে না। ইহার একটি পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা: সমান মাপের তিনখানা চতুষ্কোণ কার্ডবোর্ডকে ধারকের সাহায্যে একটি টেবিলের উপরে কিছু দূরে পর-পর সমান্তরালভাবে দণ্ডায়মান রাখা হইল। উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যস্থলে টেবিল হইতে সমান উচ্চতায় একটি



আলোক সরলরেখায় চলেঃ কার্ডবোর্ড পরীক্ষা

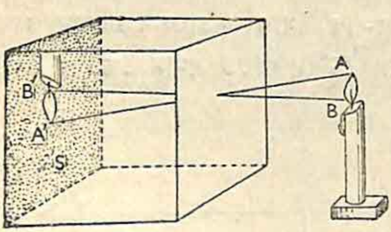
করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র করা আছে। এখন একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া উহাকে কার্ডবোর্ডগুলির এক পার্শ্বে এমনভাবে রাখা হইল, যাহাতে মোমবাতির শিখা ছিদ্র তিনটির সহিত একই উচ্চতায় থাকে। এই অবস্থায় বিপরীত দিকের শেষ কার্ডবোর্ডটির ছিদ্র দিয়া তাকাইলে শিখাটির আলোক দেখা যাইবে। কিন্তু যে-কোন একটি কার্ডবোর্ডকে এদিক-ওদিক ডাইনে-বাঁয়ে সামান্য একটু সরাইয়া দিলেই শিখাটির আলোক আর দেখা যাইবে না। এই পরীক্ষা হইতে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে।

পিন-হোল, বা সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা (Pinhole Camera):

আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে,—এই নীতির ভিত্তিতে অতি সরল ধরনের এক প্রকার ক্যামেরা তৈয়ারী করা যায়, যাহাকে বলে সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা।

সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা মূলতঃ কার্ডবোর্ড, বা কোন ধাতব পাতে তৈয়ারী একটি আয়তাকার (rectangular) ছোট প্রকোষ্ঠ বিশেষ। উহার সম্মুখ-তলের মধ্যস্থলে গোলাকার একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করা থাকে এবং উহার বিপরীত পৃষ্ঠে থাকে ঘষা কাঁচ, বা পাত্‌লা কাগজের একটি পর্দা। ছিদ্র ও পর্দা ব্যতীত বাক্সটির ভিতরের অংশে কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া থাকে।

প্রদত্ত চিত্র হইতে সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার কার্যপ্রণালী অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে বলিয়াই AB শিখাটির বিভিন্ন বিন্দু হইতে আগত যে আলোক-রশ্মিগুলি এই ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করে তাহারা অবশ্যই ছিদ্রের ভিতর দিয়া পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করিয়া ঋজু পথে অগ্রসর হয় এবং সেইজন্যই ঘষা-কাঁচের পর্দার উপরে শিখাটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব (inverted image) সৃষ্টি হয়। এইভাবে সূচী-ছিদ্র ক্যামেরায় গঠিত উল্টা প্রতিবিম্ব হইতে পরোক্ষভাবে আলোকের সরলরৈখিক গতিপথ প্রমাণিত হয়।



পিন-হোল, বা সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা

আলোকের স্বরূপ ও গতিবেগ
(Nature and Velocity of Light)

আলোকের স্বরূপ : আলোক বস্তুতঃ এক প্রকার শক্তি। উৎস হইতে নির্গত আলোক-শক্তি তরঙ্গের আকারে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। আমরা জানি, যে-কোন তরঙ্গের উৎপত্তি ও পরিবহনের জন্য অবশ্যই কোন পদার্থিক মাধ্যম প্রয়োজন, যাহার মধ্য দিয়া তরঙ্গ অগ্রসর হইবে। কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে বিশাল মহাশূন্য বিরাজমান, সেখানে বায়ু, বা অন্য কোন জড় পদার্থের অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, কোনরূপ পদার্থিক মাধ্যম ব্যতিরেকে মহাশূন্যের মধ্য দিয়া সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক-তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছায় কি ভাবে? এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেন যে, এই বিশ্বচরাচরের সর্বত্র, এমন কি, মহাশূন্যের মধ্যেও **লুমিনিফেরাস ইথার** (luminiferous ether) নামক কোন একটি ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের অস্তিত্ব

রহিয়াছে ; এই ইথারের কোন বস্তু-সত্তা নাই, উহা ভারহীন, সর্বব্যাপী এবং ইন্দ্রিয়-অগোচর। বিজ্ঞানীদের মতে, আলোক-শক্তি এই কাল্পনিক ইথারের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে সূর্য হইতে পৃথিবীতে আসে।

আলোকের তরঙ্গ-প্রকৃতির অর্থ ইহা নহে যে, আলোক আঁকা-বাঁকা ঢেউ-খেলানো পথে অগ্রসর হয়। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে, অর্থাৎ আলোক-শক্তি এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে সরল-রৈখিক পথে পরিবাহিত হয়। কিন্তু আলোকের এই গতিপথে অবস্থিত জড় মাধ্যমের কণাগুলি উপরে-নীচে পর্যায়ক্রমে আন্দোলিত হইয়া অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আলোক-শক্তির পরিবহন ঘটায়।

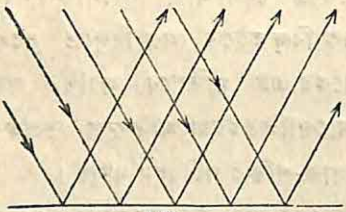
আলোকের গতিবেগ ঃ যে-কোন তরঙ্গের ন্যায় আলোক-তরঙ্গও কোন একটি সুনির্দিষ্ট গতিবেগে অগ্রসর হয়। আধুনিক বিভিন্ন সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্ধারিত হইয়াছে যে, শূন্যস্থানে (vacuum) আলোকের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1,86,000 মাইল, অর্থাৎ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। জড় মাধ্যমে আলোকের গতিবেগ শূন্যস্থান অপেক্ষা কিছুটা কম। সূর্য পৃথিবী হইতে প্রায় নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত; সুতরাং সূর্যালোক পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছাইতে সময় লাগে 9,30,00,000/1,86,000 সেকেণ্ড = 8 মিনিট 20 সেকেণ্ড মাত্র। আলোকের গতিবেগ যে কি প্রচণ্ড, তাহার ধারণা করা যাইতে পারে যদি আমরা চিন্তা করি যে, একটি রকেট অবিরত ঘণ্টায় 300 মাইল বেগে চলিলে সূর্যে পৌঁছাইতে উহার সময় লাগিবে প্রায় 35 বৎসর ; অথচ সূর্য হইতে আলোক পৃথিবীতে পৌঁছায় মাত্র 8 মিনিট 20 সেকেণ্ডে। আলোকের গতিবেগই বিশ্ব-চরাচরে যে-কোন-কিছুর গতিবেগের সর্বোচ্চ সীমা।

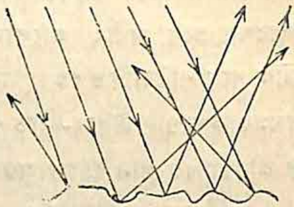
আলোকের প্রতিফলন

(Reflection of Light)

সংজ্ঞা ঃ আলোক কোন একটি মাধ্যমে চলিতে-চলিতে অপর কোন মাধ্যমের উপর আসিয়া পড়িলে উহা মাধ্যম দুইটির সংযোগ-তল হইতে আংশিকভাবে, বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইয়া পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে ; এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের প্রতিফলন (reflection of light)।

দুইটি বিভিন্ন মাধ্যমের যে সংযোগ-তলে আলোকের প্রতিফলন ঘটে, তাহাকে বলা হয় **প্রতিফলক** (reflector, or reflecting surface)। প্রতিফলকটি দর্পণের ন্যায় মসৃণ হইলে আলোক-রশ্মিগুচ্ছ উহাতে প্রতিহত হইয়া কোন সুনির্দিষ্ট পথে ফিরিয়া আসে ; ইহাকে বলা হয় **নিয়মিত প্রতিফলন** (regular reflection), চিত্র (a)। কিন্তু কোন অমসৃণ তলে, যেমন, ঘরের মেঝে, বা

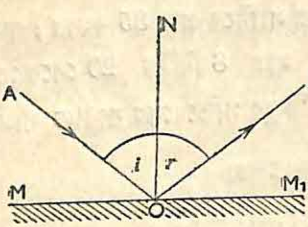

(a)
আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন


(b)
আলোকের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

দেয়ালে প্রতিহত হইলে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিগুলি এলোমেলো যদৃচ্ছভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে ; ইহাকে বলা হয় **অনিয়মিত**, বা **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** (irregular reflection), চিত্র (b)। কম দামী আয়নায় এইরূপ অনিয়মিত প্রতিফলনের জন্যই অনেক সময় বিকৃত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

প্রতিফলন-সংক্রান্ত কয়েকটি রাশির সংজ্ঞা :
(Some Definitions about Reflection)

ধরা যাক, MM_1 একটি সমতল প্রতিফলক। একটি আলোক-রশ্মি AO প্রতিফলকটির O বিন্দুতে আসিয়া পড়িতেছে এবং উহাতে প্রতিফলিত হইয়া OB পথে ফিরিয়া যাইতেছে। AO রশ্মিটিকে বলা হয় **আপতিত রশ্মি** (incident ray) এবং OB রশ্মিটিকে বলে **প্রতিফলিত রশ্মি** (reflected ray)। আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের উপরে যে বিন্দুতে আসিয়া পড়ে, তাহাকে বলা হয় **আপতন-বিন্দু** (point of incidence) ; এই ক্ষেত্রে O হইল আপতন-বিন্দু।



আলোকের প্রতিফলন

O-বিন্দুতে প্রতিফলকের উপরে ON লম্ব টানিলে উহাকে বলা হয় **অভিলম্ব** (normal)। আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যবর্তী যে কোণ উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ $\angle AON$), তাহাকে বলে **আপতন-কোণ** (angle of incidence) ;

আর, প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যবর্তী ∠BON কোণকে বলা হয় **প্রতিফলন-কোণ** (angle of reflection)। প্রচলিত রীতি অনুসারে আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণকে যথাক্রমে i ও r চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

প্রতিফলনের সূত্র (Laws of Reflection) :

আলোকের প্রতিফলন-ক্রিয়া সর্বদাই নিম্নলিখিত দুইটি সূত্র, বা নিয়ম অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে, যেমন—

প্রথম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন-বিন্দুতে প্রতিফলকের উপরে অঙ্কিত অভিলম্ব সর্বদা একই সমতলে অবস্থান করে।

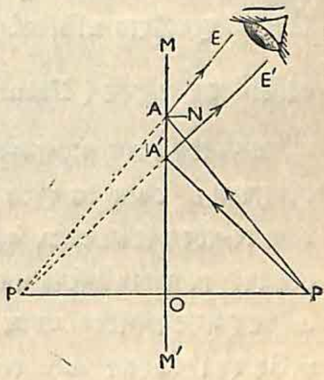
দ্বিতীয় সূত্র : আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণ সর্বদা পরস্পর সমান হয়।

কোন আলোক-রশ্মি যদি প্রতিফলকের উপরে লম্বভাবে পড়ে, অর্থাৎ যদি উহা অভিলম্বের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণ উভয়ের মানই শূন্য হয়, অর্থাৎ প্রতিফলিত রশ্মিটি লম্ব পথেই ফিরিয়া যায়।

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন :

(Formation of Image on a Plane Mirror)

ধরা যাক, MM′ একটি সমতল দর্পণ এবং P উহার সম্মুখে অবস্থিত একটি বিন্দু-উৎস (point-source) ; একজন দর্শক দর্পণটির দিকে তাকাইয়া বিন্দু-উৎসটিকে লক্ষ্য করিতেছে। P বিন্দুটি হইতে নির্গত অসংখ্য আলোক-রশ্মির মধ্যে একটি রশ্মি PA দর্পণের উপরে A বিন্দুতে আপতিত হইতেছে এবং প্রতিফলিত হইয়া AE পথে ফিরিয়া যাইতেছে। অনুরূপভাবে, অপর একটি রশ্মি PA′ দর্পণের A′ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইয়া A′E′ পথে চলিয়া যাইতেছে। এই প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় AE ও A′E′ অপসারী প্রকৃতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ উহারা ক্রমশঃ পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই রশ্মি দুইটিকে দর্পণের পশ্চাদ্দিকে



সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

বাড়াইয়া দিলে উহারা দর্পণের পিছনে কোন একটি বিন্দু P′-এ পরস্পরকে ছেদ করে। সুতরাং, P বিন্দু-উৎসটি হইতে নির্গত PA ও PA′ রশ্মিদ্বয় দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া AE ও A′E′ পথে দর্শকের চোখে আসিয়া পৌঁছায়; কিন্তু দর্শকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই রশ্মিদ্বয় যেন দর্পণের পশ্চাদ্বর্তী P′ বিন্দুটি হইতে আসিতেছে। অতএব, দর্শক P′ বিন্দুতে P বিন্দুটির একটি **প্রতিবিম্ব** (image) দেখিতে পায়। দর্শকের চোখ যদি অন্য কোন স্থানে থাকিত, তাহা হইলেও প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, P বিন্দুটি হইতে নির্গত অন্য কোন আলোক-রশ্মিগুচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া অপর কোন ভিন্ন পথে চোখে আসিয়া পৌঁছাইত, কিন্তু দর্শক ঐ একই P′ বিন্দুতে P বিন্দুটির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইত।

বিন্দু-উৎস নিতান্তই একটি কাল্পনিক ব্যাপার, ইহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যে-কোন বস্তুকেই মূলতঃ অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে এবং বস্তুর প্রত্যেকটি বিন্দুই বিন্দু-উৎসের অনুরূপভাবে দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বস্তুটির সামগ্রিক প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে।

প্রতিবিম্বের অবস্থান (Position of Image) :

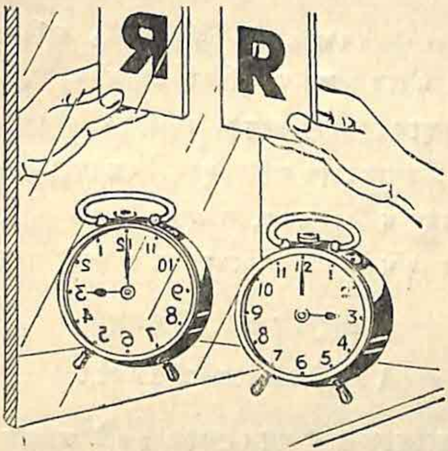
জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়, কোন বিন্দু-উৎস ও তাহার প্রতিবিম্বের সংযোগকারী সরলরেখা দর্পণের উপরে লম্বভাবে থাকে এবং বিন্দু-উৎসটি দর্পণের সম্মুখে যত দূরে অবস্থান করে, দর্পণের পশ্চাদ্দিকে ঠিক তত দূরে উহার প্রতিবিম্বটি গঠিত হয়।

প্রতিবিম্বের প্রকৃতি (Nature of Image) :

প্রকৃতপক্ষে কোন আলোক-রশ্মিই দর্পণ ভেদ করিয়া উহার পশ্চাতে গিয়া পৌঁছায় না। কোন বস্তু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মি সমতল দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া যে-পথে দর্শকের চোখে আসিয়া পড়ে, দর্শকের কাছে মনে হয়, আলোক যেন সেই পথ বরাবর দর্পণের পশ্চাদ্বর্তী অপর কোন বিন্দু হইতে আসিতেছে। এইজন্যই সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে দর্পণের পশ্চাতে বস্তুর প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়। এইরূপ প্রতিবিম্বকে বলা হয় **অসদ্ প্রতিবিম্ব** (virtual image)। এই ধরনের প্রতিবিম্বের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই; ইহা চোখে দেখা যায় মাত্র, কিন্তু ইহাকে পর্দায় ফেলা যায় না।

কোন বস্তু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ কোন প্রতিফলকে প্রতিফলিত, অথবা এক মাধ্যম হইতে অন্য কোন মাধ্যমে প্রতিসৃত (refracted ; ৪২ পৃষ্ঠায় আলোচিত) হইবার পরে যদি প্রকৃতই অপর কোন বিন্দুতে মিলিত হইয়া সেখানে বস্তুটির প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই প্রতিবিম্বকে বলা হয় **সদ্ প্রতিবিম্ব** (real image)। এই ধরনের প্রতিবিম্বের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং উহাকে চোখেও দেখা যায়, পর্দায়ও ফেলা যায়। ক্যামেরায় কোন কিছুর যে ছবি তোলা হয় তাহা এইরূপ সদ্ প্রতিবিম্ব।

সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের আকৃতি বস্তুর আকৃতির ঠিক উল্টা ধরনের হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রতিবিম্বের **পার্শ্ব-পরিবর্তন** (lateral inversion) ঘটে। বস্তুর যে বিন্দু দর্পণের যত কাছে অবস্থিত, তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণের পিছনদিকে ঠিক তত কাছেই গঠিত হয় এবং এই জন্যই বস্তুর উল্টা ধরনের



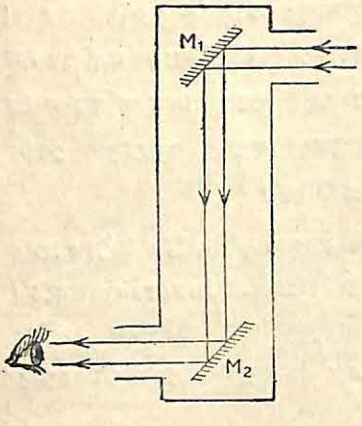
সমতল দর্পণে প্রতিবিম্বের পার্শ্ব-পরিবর্তন

প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দর্পণে ডান হাতকে বাম হাতের ন্যায় এবং বাম হাতকে ডান হাতের ন্যায় দেখাইবার ইহাই তথ্যগত মূল কারণ। প্রতিসম (symmetrical) বস্তুর ক্ষেত্রে অবশ্য এইরূপ ঘটে না ; যেমন—O, বা S অক্ষরের প্রতিবিম্ব O, বা S-ই দেখায়, পার্শ্ব-পরিবর্তন লক্ষিত হয় না।

পেরিস্কোপ (Periscope) :

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠনের ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য

উদাহরণ হইল পেরিস্কোপ (periscope) নামক একটি সরল যান্ত্রিক ব্যবস্থা। ইহা প্রকৃতপক্ষে কাঠ, বা ধাতুনির্মিত দীর্ঘায়ত একটি বাক্স, যাহার উপরে-নীচে দুই বিপরীত পার্শ্বে দুইটি প্রশস্ত ছিদ্র-পথ করা থাকে। এই ছিদ্র দুইটির সম্মুখে বাক্সটির দৈর্ঘ্যের সহিত 45° কোণ করিয়া দুইটি সমতল দর্পণ পরস্পর মুখোমুখীভাবে সংলগ্ন থাকে। বাক্সটিকে খাড়াভাবে ধরিলে উপরের ছিদ্রের সম্মুখস্থ বিভিন্ন বস্তু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ বাক্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পর্যায়ক্রমে M_1 ও M_2 দর্পণ দুইটিতে পর-পর প্রতিফলিত হইয়া নীচের ছিদ্রপথে দর্শকের চোখে আসিয়া পড়ে; সুতরাং, দর্শকের চোখের সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধক থাকিলেও এইরূপ কৌশলে পেরিস্কোপের নিম্নবর্তী ছিদ্রপথে চোখ রাখিয়া দূরবর্তী বস্তু দেখা সম্ভব হয়। খেলার মাঠে ভিড়ের পশ্চাতে থাকিয়া খেলা, বা জলের তলায় সাবমেরিনের ভিতর হইতে উপরের দৃশ্য দেখিবার জন্য পেরিস্কোপ যন্ত্র প্রায়শঃই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।



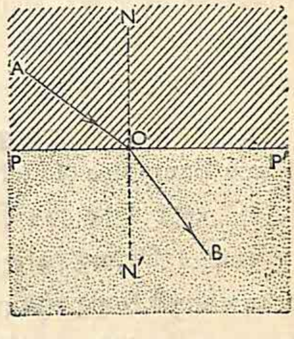
পেরিস্কোপ যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার

আলোকের প্রতিসরণ
(Refraction of Light)

সংজ্ঞা : আলোক-রশ্মি যখন কোন একটি মাধ্যম হইতে অপর কোন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন উহার অভিমুখ পরিবর্তিত হয়; এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের প্রতিসরণ (refraction of light)।

যে-কোন একক মাধ্যমে আলোক সর্বদাই সরল পথে চলে; কিন্তু কোন একটি মাধ্যমে সরলরৈখিক পথে চলিতে চলিতে আলোক-রশ্মি যখন দ্বিতীয় কোন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন মাধ্যম দুইটির সংযোগ-তলে আলোক-রশ্মিটির গতিপথ কিছুটা বাঁকিয়া যায়; অবশ্য দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করিবার পরে সেই রশ্মি পুনরায় যথারীতি অপর কোন সরল পথে অগ্রসর হয়। এই ঘটনাকেই বলা হয় আলোকের প্রতিসরণ।

ধরা যাক, দুইটি বিভিন্ন মাধ্যমের সংযোগ-তল হইল PP'। একটি আলোক-রশ্মি AO প্রথম মাধ্যমের মধ্য দিয়া সরল পথে আসিয়া সংযোগ-তলের উপর O বিন্দুতে আপতিত হইতেছে। প্রতিসরণের ফলে AO রশ্মিটির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটিবে, অর্থাৎ উহা বাঁকিয়া অন্য কোন ভিন্ন পথে OB সরলরেখায় দ্বিতীয় মাধ্যমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবে। প্রথম মাধ্যমের AO রশ্মিটিকে বলা হয় **আপতিত রশ্মি** (incident ray), O **আপতন-বিন্দু** (point of incidence) এবং দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবিষ্ট OB রশ্মিটকে বলা হয় **প্রতিস্থত রশ্মি** (refracted ray)। আপতন-বিন্দু O-তে PP' বিভেদ-তলের উপর NN' লম্ব টানিলে উহাকে বলা হয় **অভিলম্ব** (normal)। অভিলম্বের সহিত আপতিত ও প্রতিস্থত রশ্মি দুইটির মধ্যবর্তী AON ও BON' কোণ দুইটিকে বলা হয় যথাক্রমে **আপতন-কোণ** (angle of incidence) ও **প্রতিসরণ-কোণ** (angle of refraction)।



আলোকের প্রতিসরণ

প্রতিসরণের সূত্র (Laws of Refraction):

বিভিন্ন মাধ্যমে আলোকের প্রতিসরণ-ক্রিয়া সর্বদাই নিম্নলিখিত দুইটি সূত্র, বা নিয়ম মানিয়া চলে, যথা—

প্রথম সূত্র : **আপতিত রশ্মি, প্রতিস্থত রশ্মি এবং আপতন-বিন্দুতে বিভেদ-তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।**

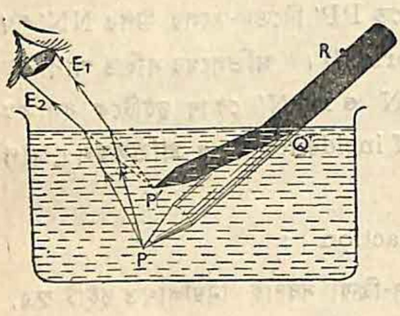
দ্বিতীয় সূত্র : **আলোক-রশ্মি লঘু হইতে ঘন মাধ্যমে, অথবা ঘন হইতে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করিলে প্রতিসরণ-কোণ আপতন-কোণ অপেক্ষা যথাক্রমে ক্ষুদ্রতর, বা বৃহত্তর হইয়া থাকে।**

দ্বিতীয় সূত্রটি হইতে বুঝা যায়, লঘু হইতে ঘন মাধ্যমে (যেমন, বায়ু হইতে কাঁচে) প্রতিসরণ-কালে প্রতিস্থত রশ্মিটি অভিলম্বের অপেক্ষাকৃত নিকটে সরিয়া আসে, অর্থাৎ আপতন-কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ-কোণ ক্ষুদ্রতর হয়। বিভিন্ন বর্ণের আলোকের প্রতিসরণের মাত্রা বিভিন্ন। লঘু হইতে ঘনতর মাধ্যমে প্রতিসরণ-কালে সাধারণ আলোক-রশ্মির একই আপতন-কোণের জন্য

উহার সংগঠক লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, আসমানী ও বেগুনী এই সপ্তবর্ণ রশ্মিগুলির প্রতিসরণ-কোণের মান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ণালী সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, ঘন হইতে লঘু মাধ্যমে (যেমন, কাঁচ হইতে বায়ুতে) আলোক প্রবেশকালে প্রতিসৃত রশ্মিটি অভিলম্ব হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে সরিয়া যায়, অর্থাৎ আপতন-কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ-কোণটি বৃহত্তর হয়।

প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ
(Some Examples of Refraction)

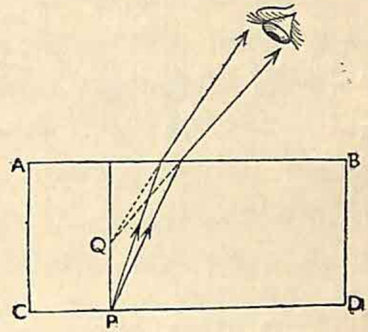
(1) **বস্তুর আকারের বিকৃতি ঃ** একটি লম্বা পেন্সিল, বা লাঠি জলে আংশিকভাবে নিমজ্জিত করিলে জল ও বায়ুর সংযোগ-তল হইতে উহার নিমজ্জিত অংশটি কিছুটা বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রদত্ত চিত্র হইতে ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পেন্সিলটির নিম্নতম বিন্দু P হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ জল হইতে বায়ুতে প্রবেশকালে প্রতিসৃত হয় এবং জলের তুলনায় বায়ু যেহেতু যথেষ্ট লঘুতর মাধ্যম, অতএব প্রতিসরণের পর সেই আলোক-রশ্মিগুচ্ছ অভিলম্ব হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে সরিয়া যায়। এই প্রতিসৃত রশ্মিগুচ্ছ অপসারী প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ার ফলে উহা যখন দর্শকের চোখে আসিয়া পৌঁছায়, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাহার মনে হয় যে, রশ্মিগুচ্ছ যেন P বিন্দুর কিছুটা উপরে অবস্থিত অপর কোন বিন্দু P′ হইতে নির্গত হইতেছে; অর্থাৎ দর্শকের চোখে P′ বিন্দুতে P বিন্দুটির একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। পেন্সিলের যে-অংশ জলে নিমজ্জিত আছে তাহার প্রত্যেকটি বিন্দুই এইভাবে প্রতিসরণের দরুণ আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা উপরে লক্ষিত হইবার ফলে উহার নিমজ্জিত অংশটি উপরের দিকে কিছুটা বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে এবং ঐ অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বলিয়াও বোধ হয়।



প্রতিসরণের ফলে সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়

(2) **গভীরতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি ঃ** বইয়ের পাতার উপরে একটি মোটা কাঁচফলক রাখিয়া উপর হইতে দেখিলে পাতার হরফগুলি কিছুটা

উপরে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রদত্ত চিত্রটি লক্ষ্য করিলে ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ABDC কাঁচ-ফলকটির নীচে অবস্থিত P বিন্দু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ AB তলে প্রতিসৃত হইয়া যে-পথে দর্শকের চোখে আসিয়া পৌঁছায়, দর্শকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে P বিন্দুটি সরাসরি সেই পথেই অন্য কোন বিন্দু Q-তে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই P বিন্দুটি কাঁচ-ফলকটির উপরিতল হইতে প্রকৃতপক্ষে যত নীচে আছে, উপর হইতে দেখিলে উহাকে ঠিক তত নীচে বলিয়া মনে হয় না; অর্থাৎ কাঁচ-ফলকটির গভীরতা আপাতদৃষ্টিতে কিছু কমিয়া যায়। এই একই কারণে কোন জল-পূর্ণ চৌবাচ্চার উপর হইতে দেখিলে চৌবাচ্চাটি প্রকৃতপক্ষে যত গভীর উহাকে তদপেক্ষা কম গভীর বলিয়া বোধ হয়।



প্রতিসরণের ফলে বস্তুর গভীরতা কম দেখায়

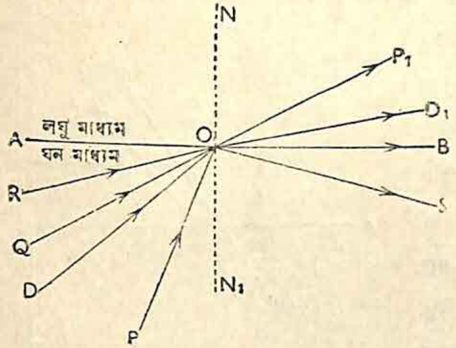
আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন

(Total Internal Reflection)

আলোক যখন এক মাধ্যমের মধ্য দিয়া আসিয়া অন্য কোন মাধ্যমের উপর আপতিত হয়, তখন উহার কিয়দংশ মাধ্যম দুইটির সংযোগ-তলে প্রতিফলিত হইয়া প্রথম মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে এবং অপর অংশ প্রতিসৃত হইয়া দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে। কিন্তু কোন-কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আপতিত আলোক মাধ্যম দুইটির বিভেদ-তলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া প্রথম মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে; আলোকের প্রতিসরণ কিছুমাত্রও ঘটে না। এইরূপ ঘটনাকে বলা হয় আলোকের **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন**।

পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে AB তলের উপরের মাধ্যমটি লঘু মাধ্যম এবং নীচেরটি ঘন মাধ্যম। একটি আলোক-রশ্মি PO ঘন মাধ্যমের মধ্য দিয়া সরলরৈখিক পথে আসিয়া বিভেদ-তলের O বিন্দুতে আপতিত হইতেছে এবং প্রতিসরণের পর উহা লঘু মাধ্যমের মধ্য দিয়া OP_1 পথে অগ্রসর হইতেছে। NON_1 রেখাটি আপতন-বিন্দু O-তে বিভেদ-তলের উপর অভিলম্ব। প্রতিসরণের

সূত্র অনুযায়ী, লঘু মাধ্যমে প্রতিসরণ-কোণ NOP_1 ঘন মাধ্যমে আপতন-কোণ N_1OP অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে, অর্থাৎ আপতিত রশ্মি PO-র তুলনায় প্রতিসৃত রশ্মি OP_1 অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। এখন, ঘন মাধ্যমস্থিত আপতিত রশ্মিটিকে যদি অভিলম্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে সরানো হয় (যেমন DO), অর্থাৎ আপতন-কোণের মান যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়, তাহাহইলে প্রতিসরণ-কোণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মিটি অভিলম্ব হইতে ক্রমশঃ আরও দূরে সরিয়া যায় (যেমন OD_1)। আপতিত রশ্মিটিকে এইভাবে অভিলম্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া অবশেষে এমন কোন একটি বিশেষ অবস্থানে আনা যাইতে পারে (যেমন QO), যখন প্রতিসৃত রশ্মিটি বিভেদ-তল ঘেঁষিয়া OB পথে অগ্রসর হইবে ; এই অবস্থায় QON_1 হইল আপতন-কোণ এবং NOB প্রতিসরণ-কোণ। আপতন-কোণের এইরূপ যে-মানের ক্ষেত্রে প্রতিসৃত রশ্মিটি বিভেদ-তল ঘেঁষিয়া অগ্রসর হয়, অর্থাৎ প্রতিসরণ-কোণের মান দাঁড়ায় 90°, তাহাকে বলা হয় **সংকট-কোণ** (critical angle)। এই ক্ষেত্রে QON_1 হইল সংকট-কোণ। আপতন-কোণের মান যদি সংকট-কোণ অপেক্ষা আরও বৃদ্ধি করা হয় (যেমন RON_1), তাহা হইলে প্রতিসরণ ঘটিবার আর কোন অবকাশ থাকে না এবং আপতিত রশ্মি RO বিভেদ-তলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া OS পথে পুনরায় ঘন মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে। এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন** (total internal reflection of light)।

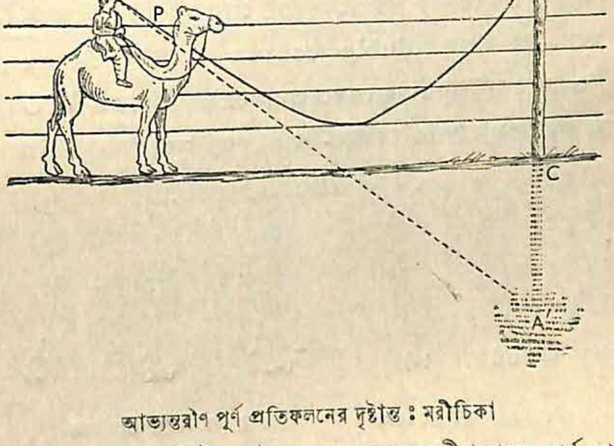


আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আলোকের আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিতে হইলে দুইটি অত্যাবশ্যক শর্ত পূর্ণ করিতে হয় ; যথা—
(i) আলোক-রশ্মি ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে আপতিত হইতে হইবে ;
(ii) ঘন মাধ্যমে আপতন-কোণের মান মাধ্যম দুইটির সংকট-কোণ অপেক্ষা অধিক হইতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত ঃ
(Example of Total Internal Reflection)

মরীচিকা (Mirage) ঃ মরুভূমির বালুকারাশি দিনের বেলায় সূর্যালোকে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। উহার সংস্পর্শস্থিত বিভিন্ন বায়ু-স্তরের উত্তাপের মাত্রা অবশ্যই উপরের দিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এই কারণে মরুভূমির উপরিস্থিত বায়ু-স্তরগুলি উপরের দিকে ক্রমশঃ শীতলতর ও ঘনতর অবস্থায় থাকে। ধরা যাক, মরুভূমিতে ভ্রাম্যমাণ কোন যাত্রী হইতে বহু দূরে যেন একটি খেজুরগাছ AC রহিয়াছে। গাছটির শীর্ষবিন্দু A হইতে নির্গত আলোক-রশ্মি ঘনতর হইতে ক্রমশঃ লঘুতর বায়ু-স্তরের মধ্য দিয়া প্রতিসরণের নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ তির্যকভাবে নীচের দিকে বাঁকিয়া অগ্রসর হইবে। ঘন হইতে লঘু মাধ্যমে প্রতিসরণ-কালে প্রতিসৃত রশ্মি যেহেতু অভিলম্ব হইতে সরিয়া যায়, অতএব আলোক-রশ্মিটি যতই নীচে নামে ততই উহা অভিলম্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিতে থাকে, অর্থাৎ আপতন-কোণের মান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিশেষে কোন একটি নির্দিষ্ট বায়ু-স্তরে পেঁাছিয়া আপতন-কোণের মান যখন সংকট-কোণ অপেক্ষা অধিক হইয়া



আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত ঃ মরীচিকা

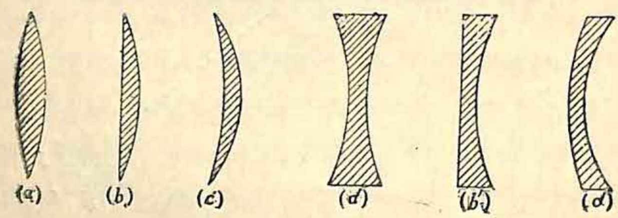
পড়ে, তখন আলোক-রশ্মিটি সেই স্তরে আভ্যন্তরীণভাবে পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এই ঊর্ধ্বগামী রশ্মিটি তখন

আবার পর্যায়ক্রমে লঘুতর হইতে ঘনতর মাধ্যম অতিক্রম করিবার ফলে উহা ক্রমশঃ অভিলম্বের দিকে বাঁকিতে থাকে। রশ্মিটি পরিশেষে যে-পথে যাত্রীর চোখে আসিয়া পৌঁছায়, সেই পথ বরাবর সোজা সম্মুখ দিকে A′ স্থানে A-বিন্দুটির একটি প্রতিবিম্ব যাত্রীটির চোখে পড়ে। খেজুরগাছটির প্রতিটি বিন্দু হইতে আলোক-রশ্মি অনুরূপভাবে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া আসিবার ফলে যাত্রীর চোখে গাছটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব CA′ লক্ষিত হয়। দূর হইতে দেখিলে ইহাকে জলাশয়ে কোন বস্তুর কম্পনশীল প্রতিবিম্বের মত দেখায় এবং অদূরে কোন জলাশয় আছে মনে করিয়া তৃষ্ণার্ত যাত্রী এই অপস্রয়মান প্রতিবিম্ব, বা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হয়।

লেন্স (Lens)

দুই দিকে দুইটি সুনির্দিষ্ট তল দ্বারা সীমাবদ্ধ কোন স্বচ্ছ মাধ্যমকে বলা হয় লেন্স (lens)। লেন্সের দুইটি তলই গোলকীয় (spherical) ধরনের, অথবা একটি তল গোলকীয় ও অপরটি সমতল হইতে পারে। লেন্স সাধারণতঃ স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত হইয়া থাকে। লেন্স মূলতঃ দুই প্রকার: (ক) উত্তল লেন্স (convex lens) ও (খ) অবতল লেন্স (concave lens)।

(ক) **উত্তল লেন্স** (Convex Lens): **যে লেন্সের মধ্যভাগটি মোটা এবং প্রান্তভাগ অপেক্ষাকৃত সরু, তাহাকে বলা হয় উত্তল লেন্স।** তল দুইটির প্রকৃতি অনুসারে উত্তল লেন্স আবার তিন প্রকার হইতে পারে; যথা—উভ-উত্তল (duble convex), সমতল-উত্তল (plano-convex) ও অবতল-উত্তল (concavo-convex) (চিত্রের a, b, c)। অবশ্য উত্তল লেন্স বলিতে সাধারণভাবে উভ-উত্তল লেন্সই বুঝায়।



(a) (b) (c) (a) (b) (c)

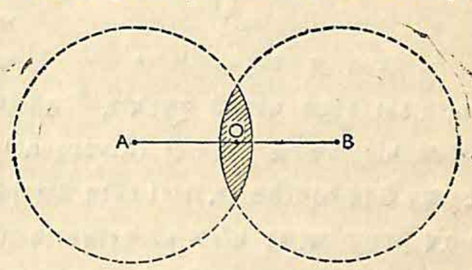
বিভিন্ন ধরনের উত্তল লেন্স বিভিন্ন ধরনের অবতল লেন্স

(খ) **অবতল লেন্স** (Concave Lens)): **যে লেন্সের মধ্যভাগটি সরু এবং প্রান্তদ্বয় অপেক্ষাকৃত মোটা, তাহাকে বলা হয় অবতল**

লেন্স। উত্তল লেন্সের ন্যায় অবতল লেন্সও তিন প্রকার হইতে পারে; যথা— উভ-অবতল (duble concave), সমতল-অবতল (plano-concave) ও উত্তল-অবতল (convexo-concave) (চিত্রের a', b', c')। অবতল লেন্স বলিতে অবশ্য সাধারণভাবে উভ-অবতল লেন্সই বুঝায়।

লেন্স-সংক্রান্ত কয়েকটি রাশির সংজ্ঞা ঃ
(Some Definitions about Lens)

উত্তল, বা অবতল যে-কোন লেন্সেরই বক্রতল দুইটি সাধারণতঃ পরস্পর প্রতিসম (symmetrical) হইয়া থাকে। লেন্সের প্রত্যেকটি গোলকীয় তলকে কোন একটি পূর্ণ গোলকের অংশবিশেষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, যাহার কেন্দ্রকে বলা হয় ঐ তলটির **বক্রতা-কেন্দ্র** (centre of curvature)। কোন লেন্সের উভয় গোলকীয় তলের বক্রতা-কেন্দ্র দুইটিকে যুক্ত করিলে যে সরলরেখা পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় লেন্সটির **প্রধান অক্ষ** (principal axis)। প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত যে বিন্দুটি লেন্সের পৃষ্ঠ-তলদ্বয় হইতে সম-দূরবর্তী, তাহাকে বলা হয় লেন্সটির **আলোক-কেন্দ্র** (optical centre)।

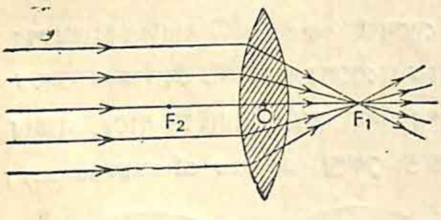


বক্রতা-কেন্দ্র : A ও B ; প্রধান অক্ষ :AB ;
আলোক-কেন্দ্র : O

উত্তল লেন্সের ফোকাসীয় ক্রিয়া ও ফোকাস-দূরত্ব ঃ
(Focussing Action of Convex Lens and Focal Length)

ধরা যাক, একটি উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে একগুচ্ছ আলোক-রশ্মি লেন্সটির উপরে আপতিত হইয়াছে। যে-কোন আলোক-রশ্মি উত্তল লেন্সে প্রতিসরণের ফলে সর্বদাই লেন্সের প্রধান অক্ষের দিকে বাঁকিয়া যায়; যে-রশ্মি প্রধান অক্ষ হইতে যত দূরে, তাহা প্রতিসরণের ফলে প্রধান অক্ষের দিকে তত বেশী বাঁকে। ইহার ফলে লেন্স হইতে নির্গত রশ্মিগুচ্ছ অভিসারী ধরনের হইয়া থাকে এবং প্রধান অক্ষের উপরে কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু F_1-এ পরস্পর মিলিত হয়। এই বিন্দুটিকে বলা

হয় লেন্সটির **ফোকাস** (focus) এবং আলোক-কেন্দ্র O হইতে ফোকাসের দূরত্ব OF_1-কে বলা হয় লেন্সটির **ফোকাল-দূরত্ব** (focal length)। সহজেই বুঝা যায়, লেন্সের যে-দিকে F_1 বিন্দুটি আছে, যদি সেই দিক হইতে একগুচ্ছ আলোক-রশ্মি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে লেন্সের উপরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহাও অনুরূপভাবে লেন্সটির অপর দিকে প্রধান অক্ষের উপর কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু F_2-তে আসিয়া মিলিত হইবে ; এই বিন্দুটিও লেন্সের অন্যতম ফোকাস। যে-কোন লেন্সেরই দুইটি ফোকাস থাকে, যাহারা আলোক-কেন্দ্র হইতে সমান দূরে লেন্সের দুই বিপরীত পার্শ্বে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থান করে। উপরোক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায়, উত্তল লেন্সের যে-কোন ফোকাস-বিন্দু হইতে যদি একগুচ্ছ অপসারী (divergent) আলোক-রশ্মি নির্গত হইয়া লেন্সের উপর আপতিত হয়, তাহা হইলে উহারা প্রতিসৃত হইয়া লেন্সের অপর পার্শ্বে প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে বাহির হইয়া থাকে। যে-কোন ক্যামেরার সম্মুখভাগে একটি উত্তল লেন্স সংলগ্ন থাকে। ক্যামেরায় যে বস্তুর ছবি তোলা হয় সেই বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিগুলি লেন্সের মধ্য দিয়া অভিসারীভাবে প্রতিসৃত হয় এবং ফোকাস-দূরত্বে স্থিত ক্যামেরার ফিল্মের উপর একটি সদ্ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।



উত্তল লেন্সে আলোকের প্রতিসরণ

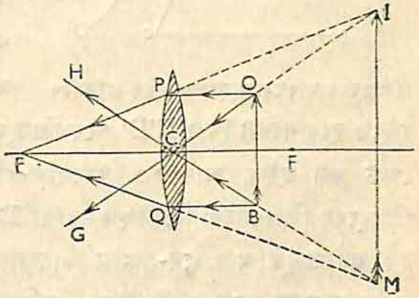
উত্তল লেন্সে আপতিত যে-কোন রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের ভিতর দিয়া প্রতিসরণের ফলে অভিসারী হইয়া বহির্গত হয় বলিয়া এই ধরনের লেন্সকে অনেক সময় **অভিসারী লেন্স** (converging lens) বলা হয়।

বিবর্ধক কাঁচ (Magnifying Glass) :

অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোন বস্তু দেখিবার জন্য অনেক সময় বিশেষ এক প্রকার কাঁচ ব্যবহার করা হয়, যাহাকে বলা হয় **বিবর্ধক কাঁচ** (magnifying glass)। এইরূপ কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে যে-কোন বস্তুকেই অপেক্ষাকৃত অনেক বড় দেখায়। ইহার কারণ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হইল।

বিবর্ধক কাঁচ প্রকৃতপক্ষে সাধারণ একখানা উত্তল লেন্স মাত্র। ইহার কার্য-প্রণালী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্র হইতে সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাক, একটি

উত্তল লেন্সের সম্মুখে ফোকাস-দূরত্বের মধ্যে একটি বস্তু OB রাখা হইয়াছে। বস্তুটির শীর্ষবিন্দু O এবং নিম্নবিন্দু B হইতে প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে যে দুইটি রশ্মি OP ও BQ নির্গত হইতেছে, তাহারা অবশ্যই লেন্সের অপর পার্শ্বে ফোকাস-বিন্দু F-এ মিলিত হয়। অনুরূপভাবে, O ও B হইতে নির্গত OC ও BC রশ্মিদ্বয় আলোক-কেন্দ্র C-এর মধ্য দিয়া যাইবার ফলে উহারা নিজ-নিজ গতিপথ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হইয়া সোজা একই পথে লেন্স হইতে বহির্গত হইয়া যায়। লেন্সের যে দিকে বস্তুটি আছে তাহার বিপরীত দিক হইতে দেখিলে মনে হইবে, PF ও CG রশ্মিদ্বয় যেন I বিন্দু হইতে, এবং QF ও CH রশ্মিদ্বয় যেন M বিন্দু হইতে নির্গত হইতেছে; অর্থাৎ দর্শকের চোখে লেন্সের অপর দিকে বস্তুটির একটি বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব IM গঠিত হইবে। এইরূপ প্রতিবিম্ব অসদ্ (virtual), সম-পার্শ্বীয় এবং বস্তুটি অপেক্ষা বড় আকারের হইয়া থাকে।



বিবর্ধক কাঁচের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা

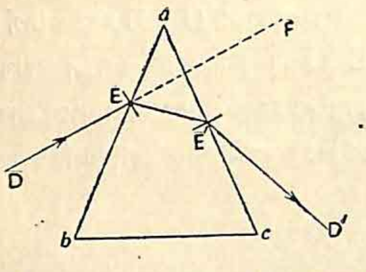
এইজন্যই উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাঁচ হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। উল্লিখিত কারণে ইহাকে অনেক সময় সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (simple microscope) বলে।

আলোকের বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light)

প্রিজ্‌মের মাধ্যমে আলোকের প্রতিসরণঃ
(Refraction of Light through a Prism)

পরস্পরচ্ছেদী তিনটি আয়তাকার সমতলীয় পৃষ্ঠ-তল দ্বারা সীমাবদ্ধ কাঁচ, বা অন্য কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের ত্রিকোণাকৃতি ফলককে বলা হয় **প্রিজ্‌ম** (prism)। ইহার যে আয়তাকার পৃষ্ঠ-তলটি ভূমির সংস্পর্শে থাকে, তাহাকে বলা হয় প্রিজ্‌মের **ভূমি** (base); অপর দুইটি আয়তাকার পৃষ্ঠ-তলের মধ্যবর্তী কোণটিকে বলা হয় **প্রিজ্‌মের কোণ** (angle of prism)। কোন উল্লম্ব সমতল দ্বারা প্রিজ্‌মকে উহার দৈর্ঘ্যের সহিত সমকোণে ছেদ করিলে যে ত্রিভুজাকার প্রস্থচ্ছেদ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে প্রিজ্‌মের **প্রধান ছেদ** (principal section)।

প্রদত্ত চিত্রে একটি প্রিজ্‌মের প্রধান ছেদকে abc ত্রিভুজ আকারে দেখানো হইয়াছে। একটি আলোক-রশ্মি DE বায়ু-মাধ্যমে আসিয়া প্রিজ্‌মের ab তলের উপরে E বিন্দুতে আপতিত হইতেছে এবং বায়ুর তুলনায় কাঁচ ঘনতর মাধ্যম বলিয়া প্রতিসৃত রশ্মিটি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া EE′ পথে প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ac তলের E′ বিন্দুতে পৌঁছিয়া রশ্মিটির পুনরায় প্রতিসরণ ঘটিতেছে এবং এই ক্ষেত্রে ঘন হইতে লঘু মাধ্যমে প্রবেশের দরুণ রশ্মিটি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া E′D′ পথে প্রিজ্‌ম হইতে বাহির হইতেছে। সুতরাং মোট ফল হইল, আপতিত আলোক-রশ্মিটি DEF পথে যাইবার পরিবর্তে প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া প্রতিসৃত হইয়া DEE′D′ পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, **যে-কোন আলোক-রশ্মি প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া প্রতিসরণের ফলে সর্বদা উহার ভূমির দিকে বাঁকিয়া যায়।**



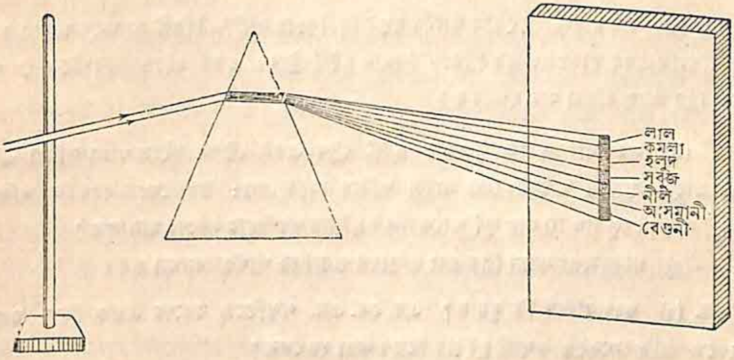
প্রিজ্‌মের মাধ্যমে আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ

বর্ণালী (Spectrum) :

সাধারণ আলোককে আমরা দৃশ্যতঃ সাদা, বা বর্ণহীন বলিয়া মনে করি। কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের একত্র সমাবেশ, বা সংমিশ্রণে গঠিত ; যেমন—লাল (red), কমলা (orange), হলুদ (yellow), সবুজ (green), আকাশী নীল (blue), গাঢ় নীল (indigo) ও বেগুনী (violet)।

সূর্য, বা অপর কোন উৎস হইতে বিকিরিত সাদা আলোকের একটি সমান্তরাল সরু রশ্মিগুচ্ছকে একটি প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত করিলে দেখা যায়, সাদা আলোক তাহার সংগঠক সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকগুচ্ছে বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রিজ্‌মটির পশ্চাদ্দিকে রক্ষিত পর্দার উপরে পড়ে। ইহার কারণ, বিভিন্ন বর্ণের আলোক-রশ্মির প্রতিসরণের কৌণিক মাত্রা বিভিন্ন, অর্থাৎ প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া প্রতিসরণ-কালে বিভিন্ন বর্ণের আলোক-রশ্মি প্রিজ্‌মের ভূমির দিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন কোণে বাঁকিয়া যায়। বস্তুতঃ এই কারণেই সাদা আলোক উহার সংগঠক সাতটি বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্দার উপর এইভাবে যে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকপাত হয়, তাহার এক প্রান্তে থাকে বেগুনী

(violet) বর্ণের স্তর ও অপর প্রান্তে থাকে লাল (red) বর্ণের স্তর। প্রিজ্মের মধ্য দিয়া প্রতিসরণের ফলে সাদা আলোকের সংগঠক সাতটি বিভিন্ন বর্ণের



বর্ণালী গঠনের সহজ পরীক্ষা

আলোকে বিশ্লিষ্ট হইবার এইরূপ ঘটনাকে বলা হয় **আলোকের বিচ্ছুরণ** (dispersion of light), এবং ইহার ফলে প্রিজ্মের পশ্চাতে রক্ষিত সাদা পর্দার উপরে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের যে আলোকিত স্তর গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় **বর্ণালী** (spectrum)।

প্রিজ্মের উপর আপতিত সাদা রশ্মিগুচ্ছের প্রতিটি রশ্মিই সংগঠক সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের রশ্মিগুলি পরস্পর কিছুটা মিশিয়া যাইবার ফলে উপরের চিত্রে প্রদর্শিত বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণের স্তরগুলির পারস্পরিক সীমারেখা বিশেষ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের স্তরগুলির মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটে। এইরূপ অস্পষ্ট বর্ণালীকে বলা হয় **অবিশুদ্ধ বর্ণালী** (impure spectrum)। **বিশুদ্ধ বর্ণালী** (pure spectrum) সৃষ্টি করিতে হইলে সাদা আলোকের একটি সরু রশ্মিগুচ্ছকে একটি উত্তল লেন্সের সাহায্যে সুকৌশলে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছে পরিণত করিয়া অতঃপর প্রিজ্মের উপর আপতিত করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রিজ্ম হইতে নির্গত যে-কোন নির্দিষ্ট বর্ণের সকল রশ্মিই পরস্পর সমান্তরাল থাকে। এখন অপর একটি উত্তল লেন্সের সাহায্যে সুকৌশলে বিভিন্ন বর্ণের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে পর্দার উপরে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ইহার ফলে বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণের স্তরগুলি পরস্পরের সহিত মিশিতে পারে না, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বর্ণালীর উৎপত্তি ঘটে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ স্থিতি ও গতি

1. (a) 'সঠিক বিচারে কোন পার্থিব বস্তুই স্থিরাবস্থায় নাই'—উক্তিটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। পাশাপাশি একই গতিবেগে একই দিকে চলমান দুইটি ট্রেনের একটি হইতে অপরটিকে দেখিলে উহা স্থির আছে বলিয়া মনে হয় কেন ?

(b) সরণ বলিতে কি বুঝায়? দুইটি ট্রেন একই স্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া একটি 100 মাইল উত্তরে ও অপরটি 100 মাইল পশ্চিম দিকে গেল; উভয় ক্ষেত্রে সরণ কি অভিন্ন? একটি ঘড়ির পেণ্ডুলাম 10 বার পূর্ণ আন্দোলিত হইবার পর উহার সরণের মান কত?

(c) গতিবেগের সংজ্ঞা লিখ এবং গতিবেগ ও দ্রুতির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

2. (a) ত্বরণ বলিতে কি বুঝায়? এম. কে. এস. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক কি? ত্বরণের এককে 'প্রতি সেকেণ্ডে' কথাটি দুইবার উল্লেখ করা হয় কেন?

(b) কোন বস্তুকে ভূমি হইতে কিছুটা উপরে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে নীচে পড়িবার সময় উহার ত্বরণ ঘটে কি? উহাকে কি বলা হয়? একটি চলন্ত বাস ব্রেক কষিয়া থামিবার সময় উহার ত্বরণ কোন্ দিকে ঘটে?

(c) ভরবেগ কাহাকে বলে? 2 কিলোগ্র্যাম ও 3 কিলোগ্রাম ভরের দুইটি বস্তু যথাক্রমে 10 মাইল/ঘণ্টা ও 5 মাইল/ঘণ্টা গতিবেগে চলিতেছে; কোন্‌টির ভরবেগ বেশী?

3. (a) বলের সংজ্ঞা লিখ এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে উহার এককগুলি ব্যাখ্যা কর।

(b) নিউটনের প্রথম গতিসূত্রটি লিখ। একটি বল মেঝের উপর গড়াইয়া দিলে প্রথম গতিসূত্র অনুযায়ী উহার চিরকালই সচল থাকা উচিত, কিন্তু উহা কিছু দূর গিয়া থামিয়া যায় কেন?

(c) এরোপ্লেন হইতে প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণকালে প্রথম দিকে উহার গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উহা সম-গতিবেগে পড়িতে থাকে। ইহার কারণ কি?

একটি স্থির বস্তুকে সচল করিতে যে বল প্রয়োজন, উহাকে স্থির গতিবেগে সচল রাখিতে তাহা অপেক্ষা কম বল প্রয়োজন হয় কেন?

4. (a) নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রটি লিখ এবং উহা হইতে কিভাবে বলের পরিমাপ পাওয়া যায় তাহা ব্যাখ্যা কর।

(b) জাড্য কাহাকে বলে এবং উহা কয় প্রকার? স্থিতিজাড্যের একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(c) চলন্ত বাস ব্রেক কষিবার সঙ্গে-সঙ্গেই থামা সম্ভব হয় না কেন? চলন্ত বাস হইতে নামিতে হইলে উহার একই দিকে কিছুটা দৌড়াইয়া আগাইয়া যাওয়া উচিত; ইহার কারণ কি?

(d) ধরা যাক, পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ মেরু বরাবর একটি সুড়ঙ্গ আছে। কোন বস্তুকে উত্তর মেরু হইতে এই সুড়ঙ্গে ফেলিয়া দিলে উহার অবস্থা কি হইবে ব্যাখ্যা কর।

5. (a) কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

(b) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হয় কি? উহাদের অভিমুখ একই দিকে, না পরস্পর বিপরীত দিকে?

(c) বন্দুক হইতে গুলী নিক্ষেপকালে গুলীটির উপর সম্মুখ দিকে যে ক্রিয়া-বল প্রযুক্ত হয় বন্দুকটির উপরেও তাহার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া-বল সৃষ্টি হয়। কিন্তু গুলীটি যে গতিবেগে নিক্ষিপ্ত হয় বন্দুকটি তাহার তুলনায় অতি সামান্য গতিবেগে পিছন দিকে সরিয়া আসে। ইহার কারণ কি?

6. (a) কোন স্থির বস্তু 50 সে.মি./সেকেণ্ড^2 ত্বরণ লইয়া চলিতে শুরু করিলে 10 সেকেণ্ড পর উহার গতিবেগ কত হইবে?

(b) 2 গ্রাম ভরের কোন বস্তুর উপর 2 সে.মি/সেকেণ্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি করিতে কত বল প্রয়োজন?

(c) বাস হঠাৎ চলিতে শুরু করিলে অসাবধান যাত্রীরা পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে কেন? চলন্ত ট্রেনের কামরায় একটি বল হাতে লইয়া উপরে ছুঁড়িয়া দিলে উহা আবার হাতেই আসিয়া পড়ে কেন?

(d) টেবিলের উপর একটি বই রাখা আছে। এই ক্ষেত্রে কোন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কাজ করিতেছে কি-না তাহা ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কার্য, শক্তি ও ক্ষমতা

1. (a) কার্যের সংজ্ঞা লিখ এবং উহার বিভিন্ন এককগুলি ব্যাখ্যা কর।

(b) একই বস্তুকে অনুভূমিকভাবে ও খাড়াভাবে সমান দূরত্ব সরাইতে সমান কার্য করিতে হয় কি? দড়ি ও বালতি দ্বারা কুঁয়া হইতে জল তুলিবার সময় কোন্ বল দ্বারা ও কোন্ বলের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হয়?

(c) দড়ি-টানাটানি খেলায় উভয় পক্ষই সমান জোরে দড়িটিকে টানিলে মূলতঃ কোন পক্ষই কোনরূপ কার্য করে না—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। একটি লাট্টু একই স্থানে দাঁড়াইয়া ঘুরিতে থাকিলে উহার উপর কোনরূপ কার্য করা হয় কি?

2. (a) শক্তি বলিতে কি বুঝায়? শক্তি কয় প্রকার ও কি-কি?

(b) গতি-শক্তি ও স্থিতিশক্তির সংজ্ঞা লিখ এবং প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

(c) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলির কোন্‌টিতে কি ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটে তাহা উল্লেখ কর: (i) কয়লার দহনে, (ii) স্টীম ইঞ্জিনে, (iii) বৈদ্যুতিক বাতিতে, (iv) বৈদ্যুতিক হিটারে, (v) পারমাণবিক বিস্ফোরণে, (vi) রাসায়নিক কোষে।

(d) দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম ও হাত-ঘড়ির ব্যালান্স-স্প্রিঙ কোন্ শক্তির প্রভাবে কার্য করে? পার্বত্য নদীর জল কিভাবে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড অনায়াসে স্থানান্তরিত করিতে পারে?

3. (a) ক্ষমতার সংজ্ঞা লিখ এবং উহার বিভিন্ন এককগুলি ব্যাখ্যা কর। 1 অশ্ব-ক্ষমতা কত ওয়াটের সমান?

(b) লিভার কাহাকে বলে? বিভিন্ন শ্রেণীর লিভারের কার্যপ্রণালী উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

(c) কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর লিভার তাহা উল্লেখ কর: (i) টিউবওয়েলের হাতল, (ii) যাঁতি, (iii) নৌকা বাহিবার দাঁড়, (iv) ঘরের দরজা, (v) মানুষের বাহু, (vi) বেল্‌চা, (vii) ওজন-বাক্সের বাটখারা তুলিবার চিম্‌টা।

4. (a) কোন বস্তুকে সরাসরি খাড়াভাবে উপরে না তুলিয়া আনত তলের সাহায্যে তুলিলে কার্য কম করিতে হয় কি? দুইটি আনত তলের একটি অপেক্ষাকৃত বেশী খাড়া, অপরটি বেশী ঢালু; কোন্‌টির যান্ত্রিক সুবিধা বেশী?

(b) কুঁয়া হইতে জল তুলিতে হইলে কপি-কল, অথবা চক্র-অক্ষদণ্ড কোন্‌টির ব্যবহার বেশী সুবিধাজনক, তাহা ব্যাখ্যা কর। চক্র ও অক্ষদণ্ডের সমন্বয়ে অক্ষদণ্ডটি সরু হইলে যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি, না হ্রাস পায়?

(c) তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধার পরিবর্তে যান্ত্রিক অসুবিধা ঘটা সত্ত্বেও উহা ব্যবহারের সার্থকতা কি?

5. (a) একটি বস্তুকে ভূমি হইতে কিছুটা উপরে তুলিয়া কোনরূপ বল প্রয়োগ না করিয়া আলগাভাবে ছাড়িয়া দিলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির কোন্‌টিতে বস্তুটির কি প্রকার শক্তি থাকিবে তাহা উল্লেখ কর: (i) বস্তুটি ছাড়িবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, (ii) বস্তুটি কিছুটা নীচে পড়িবার পরে, (iii) বস্তুটি ভূমি স্পর্শ করিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, (iv) বস্তুটি ভূমি স্পর্শ করিবার পরে।

(b) 1 কিলোগ্র্যাম ও 10 কিলোগ্র্যাম ভরের দুইটি বস্তুকে ভূমি হইতে যথাক্রমে 100 মিটার ও 50 মিটার উপরে তুলিলে কোন্‌টির স্থিতিশক্তি বেশী হইবে?

(c) যে কোন দুইটি সচল বস্তুর মধ্যে যেটির গতিবেগ বেশী তাহার গতিশক্তি বেশী না-ও হইতে পারে। ইহার কারণ ব্যাখ্যা কর।

(d) বিভিন্ন ওজনের দুই ব্যক্তি একটি বাড়ীর সিঁড়ি বাহিয়া একই সময়ে একতলা হইতে তিনতলায় উঠিল। উহাদের ক্ষমতা কি সমান? যুক্তি সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: তাপ

1. (a) তাপ যে এক প্রকার শক্তি, তাহার সমর্থনে যুক্তি দেখাও। বস্তুর উপরে তাপের বিভিন্ন প্রভাব উল্লেখ কর।

(b) তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। পরস্পরের সংস্পর্শে রক্ষিত দুইটি বস্তুর মধ্যে তাপ-প্রবাহের মূল শর্ত কি—তাপের পার্থক্য, না তাপমাত্রার পার্থক্য?

(c) ক্যালোরির সংজ্ঞা লিখ। 2 গ্র্যাম জলের তাপমাত্রা 2°C বৃদ্ধি করিতে কত তাপ প্রয়োজন?

2. (a) একই তাপমাত্রায় রক্ষিত দুইটি বস্তুর তাপ সমান না-ও হইতে পারে,—ইহার সমর্থনে একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(b) আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা লিখ। সমান ভরের জল ও লোহাতে একই পরিমাণ তাপ সরবরাহ করিলে কাহার তাপমাত্রা বেশী বৃদ্ধি পাইবে ?

(c) সাধারণ তাপমাত্রায় রক্ষিত এক বালতি জলে এক বাটি ফুটন্ত জল মিশ্রিত করিলে তাপ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইবে ? সাধারণ তাপমাত্রার সমান ওজনের তামা ও লোহার মধ্যে কোন্‌টিতে তাপ বেশী ?

3, (a) তাপ ও কার্যের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি সমীকরণের আকারে প্রকাশ কর। তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক বলিতে কি বুঝায় ? উহার মান কত ?

(b) তাপ প্রয়োগ করিলে যে-কোন বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি পায়। ইহার মূল কারণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

(c) তাপ সরবরাহের ফলে কোন বস্তুর তাপমাত্রা-বৃদ্ধির মাত্রা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপরে নির্ভর করে তাহা ব্যাখ্যা কর।

4. (a) 'তামার আপেক্ষিক তাপ 0·1'— ইহার অর্থ কি ?

(b) কয়লার উনানে ও বৈদ্যুতিক বাতিতে কোন্ শক্তির বিনিময়ে তাপশক্তি পাওয়া যায় ?

(c) $8{\cdot}4\times10^7$ আর্গ পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তিকে পুরাপুরিভাবে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করিলে কত তাপ পাওয়া যাইবে ? স্টীম ইঞ্জিনে যে পরিমাণ তাপশক্তি ব্যয়িত হয় তাহার ঠিক তুল্যাংক পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায় কি ? যুক্তিসহকারে উত্তর দাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আলোক

1. (a) আলোকের সরলরৈখিক গতিপথ পরীক্ষার সাহায্যে কিভাবে প্রমাণ করিবে ?

(b) অভিসারী ও অপসারী আলোক-রশ্মিগুচ্ছ বলিতে কি বুঝায়, তাহা পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

(c) সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার পর্দা ব্যতীত ভিতরের অংশ কালো রঙ করা থাকে কেন ? এই ক্যামেরার সম্মুখের ছিদ্রটি বড় করিলে কি অসুবিধা ঘটে ? ক্যামেরাটি কোন বস্তুর ক্রমশঃ নিকটে আনিলে প্রতিবিম্বের আকারের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিবে ?

2. (a) সদ্ ও অসদ্ প্রতিবিম্বের মূল পার্থক্য কি ? সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা ও দর্পণে যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহা সদ্, না অসদ্ ?

(b) সিনেমার পর্দা বিশেষ মসৃণ নহে, কিছুটা খসখসে ; ইহাতে কি সুবিধা ঘটে ? কম দামী আয়নায় অনেক সময় প্রতিবিম্বটি কিছুটা বিকৃত দেখায়, ইহার কারণ কি ?

(c) আলোক-রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হইলে আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণের মান কত ?

3. (a) বায়ু হইতে জলে আলোকের প্রতিসরণ-কালে আপতন-কোণের তুলনায় প্রতিসরণ-কোণ বড় না ছোট হইবে ? আলোক-রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হইলে প্রতিসরণ-কোণ কত হইবে ?

(b) একটি লম্বা লাঠি জলে আংশিকভাবে নিমজ্জিত করিলে উহা বাঁকা দেখায়। ইহার কারণ চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

(c) বেগুনী ও লাল আলোক-রশ্মি একই আপতন-কোণে বায়ু হইতে জলে প্রতিসৃত হইলে কোন্ ক্ষেত্রে প্রতিসরণ-কোণ বেশী হইবে ?

4. (a) সংকট-কোণ কাহাকে বলে ? আলোক-রশ্মি সংকট-কোণে আপতিত হইলে প্রতিসরণ-কোণের মান কত হইবে ?

(b) আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিবার শর্তগুলি উল্লেখ কর। আলোক-রশ্মি বায়ু হইতে জলে আপতিত হইলে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কখনই ঘটিতে পারে না; যুক্তিসহকারে ইহার কারণ ব্যাখ্যা কর।

(c) সূর্যাস্তকালে অনেক সময় সূর্য দিগন্ত-রেখার নীচে নামিয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণ উহা দেখা যায়। ইহার কারণ কি ? পদ্মপাতায় জলের ফোঁটা চকচক করে কেন ?

(d) মরুভূমিতে মরীচিকার উৎপত্তি রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

5. (a) শূন্যস্থানে আলোকের গতিবেগ কত ? শূন্যস্থান অপেক্ষা জড় মাধ্যমে আলোকের গতিবেগ কম, না বেশী ? একই মাধ্যমে লাল ও নীল আলোকের মধ্যে কোন্‌টির গতিবেগ বেশী ?

(b) উত্তল লেন্সের আলোক-কেন্দ্র ও ফোকাস বলিতে কি বুঝায় তাহা চিত্র আঁকিয়া ব্যাখ্যা কর।

(c) উত্তল লেন্সের ফোকাস-দূরত্বের মধ্যে কোন বস্তু রাখিলে উহার প্রতিবিম্ব কিরূপ হইবে ? উত্তল লেন্স বিবর্ধক কাঁচ হিসাবে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তাহা পরিষ্কার রশ্মি-চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

6. (a) প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া সাদা আলোকের প্রতিসরণ-কালে উহা বিচ্ছুরিত হয়, কিন্তু আয়তাকার কাচ-খণ্ড ব্যবহার করিলে আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটে না। ইহার কারণ কি ? আলোকের বিচ্ছুরণের মূল কারণ কি ?

(b) বর্ণালী বলিতে কি বুঝায় ? বর্ণালীর সংগঠক বর্ণগুলির ক্রমপর্যায় লিখ। শুদ্ধ বর্ণালী গঠনের একটি সহজ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(c) উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়া আলোকের প্রতিসরণ-কালে প্রতিসৃত রশ্মিগুচ্ছ কেন অভিসারী হয়, তাহা চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

7. (a) সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে বস্তু-দূরত্বের তুলনায় প্রতিবিম্ব-দূরত্ব বেশী, কম, না সমান হয় ? আয়নায় ডান হাতকে বাম হাতের ন্যায় এবং বাম হাতকে ডান হাতের ন্যায় দেখায় কেন ?

(b) জলপূর্ণ কোন চৌবাচ্চার গভীরতা উহার প্রকৃত গভীরতা অপেক্ষা কম মনে হয় কেন, তাহা চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

(c) একটি লাল ফুল বর্ণহীন কাঁচ, লাল কাঁচ ও নীল কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে কোন ক্ষেত্রে ফুলটির রঙ কিরূপ দেখাইবে ?

(d) মানুষের অক্ষি-গোলক কি ধরনের লেন্স ? অক্ষি-পটে যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহা খাড়া, না উল্টানো ? উহা সদ, না অসদ ?

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

রসায়ন-বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদার্থ (Matter)

পদার্থের ভৌত অবস্থা

(Physical States of Matter)

পাঠ্যসূচী ঃ (i) পদার্থের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা ; তিনটি অবস্থার অস্তিত্বের কারণ ; স্ফুটনাংক ও গলনাংক ; (ii) পদার্থের সনাক্তকরণ ; ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ঃ বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম ; (iii) পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ; রাসায়নিক পরিবর্তনের সহায়ক, বা নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন উপায় ; তাপ-উদ্গারী ও তাপ-শোষক বিক্রিয়া ; (iv) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ ঃ ধাতু ও অ-ধাতু।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সাধারণ হিসাবে যাবতীয় পদার্থের মাত্র তিনটি ভৌতাবস্থা সম্ভব ; যেমন—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা। সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে যে-কোন পদার্থ স্বভাবতঃ এই ত্রিবিধ ভৌতাবস্থার কোন একটিতে থাকে। মাটি, বালি, পাথর, গন্ধক, সোরা, লোহা প্রভৃতি **কঠিন** (solid) পদার্থ ; জল, তেল, পারদ, স্পিরিট প্রভৃতি পদার্থ **তরল** (liquid) ; আর, বায়ু, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি **গ্যাসীয়** (gaseous) পদার্থ।

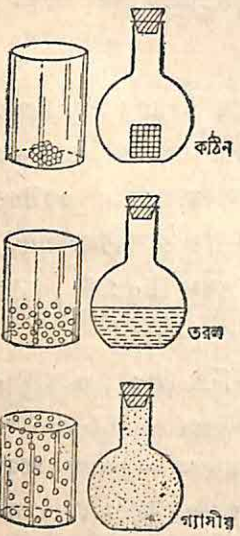
দেখা যায়, যে-কোন কঠিন পদার্থের কোন সুনির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার থাকে না, কিন্তু উহার আয়তন সুনির্দিষ্ট ; কোন তরল পদার্থ যে-পাত্রে রাখা যায়, উহা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। পক্ষান্তরে, গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার, বা আয়তন কোনটিই নাই ; কোন গ্যাস যে-পাত্রে রাখা যায়, উহা তাহার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে-কোন গ্যাস সর্বদা তাহার ধারক পাত্রের আকার ও আয়তন প্রাপ্ত হয়। পদার্থের বিভিন্ন ভৌতাবস্থার এইরূপ বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতা বস্তুতঃ তাহার ভৌত গঠনের বিভিন্নতার ফল মাত্র। ইহার মূল কারণ নিম্নে আলোচনা করা হইল।

পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থার কারণ ; পদার্থের ভৌত গঠন ঃ

(Reasons for the Existence of the Three States ; Physical Structure of Matter)

যে-কোন পার্থিব পদার্থই উহার অসংখ্য ক্ষুদ্রতম কণিকার সমবায়ে গঠিত। কোন পদার্থের সম-ধর্মী ক্ষুদ্রতম কণিকাকে বলা হয় পদার্থটির **অণু** (molecule)। যে-কোন পদার্থ তাহার এইরূপ অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অণুর সংঘবদ্ধ অবস্থানের ফলে গঠিত হইয়া থাকে। লবণের একটি দানাকে ক্রমাগত ভাঙিয়া যদি এমন সূক্ষ্মতম কণিকায় পরিণত করা যায়, যখন প্রত্যেকটি কণিকাতে লবণের যাবতীয় গুণ ও ধর্ম বজায় থাকে ; আরও ভাঙিলে লবণের বৈশিষ্ট্য আর থাকে না ; তাহা হইলে সেই কণিকাই হইবে লবণের অণু।

কোন পদার্থেরই অণুগুলি কিন্তু পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ নিরেট অবস্থায় থাকে না, পরস্পরের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ফাঁক, বা ব্যবধান থাকে। পদার্থের সংগঠক অণুসমূহের এইরূপ পারস্পরিক ব্যবধানকে বলা হয় **আন্তঃআণবিক ব্যবধান** (inter-molecular space)। এই ব্যবধানের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া অণুগুলি স্বভাবতঃ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে ; পদার্থের অণুসমূহের এইরূপ পারস্পরিক আকর্ষণকে বলা হয় **আন্তঃআণবিক আকর্ষণ** (inter-molecular attraction)।



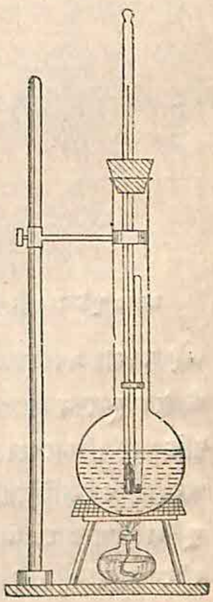
স্বাভাবিক অবস্থায়, অর্থাৎ সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা ও চাপে যে পদার্থের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ ও ব্যবধান যেরূপ থাকে, বস্তুতঃ তাহার উপরেই পদার্থটির স্বাভাবিক ভৌতাবস্থা নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে কোন পদার্থেরই নির্দিষ্ট কোন ভৌতাবস্থা নাই ; পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা ও চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সাধারণতঃ সকল পদার্থেরই আন্তঃআণবিক ব্যবধান ও আকর্ষণ পরিবর্তিত হইয়া উহার ভৌতাবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে কঠিন অবস্থায় পদার্থের আন্তঃআণবিক ব্যবধান সর্বাপেক্ষা কম এবং আন্তঃআণবিক আকর্ষণ সর্বাধিক থাকে। তরল পদার্থের অণুসমূহের

আন্তঃআণবিক ব্যবধান অপেক্ষাকৃত বেশী এবং আন্তঃআণবিক আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম। আর, গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা কম এবং আন্তঃআণবিক ব্যবধান সর্বাধিক হয়। পূর্ব-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্র হইতে পদার্থের আণবিক গঠন ও তাহার ত্রিবিধ ভৌতাবস্থার উল্লিখিত মূল কারণ সম্পর্কে সহজে ধারণা করা যাইবে।

গলনাংক (Melting Point) :

কোন কঠিন পদার্থ যে সুনির্দিষ্ট স্থির তাপমাত্রায় গলে, তাহাকে বলা হয় ঐ পদার্থটির **গলনাংক** (melting point)। বিভিন্ন পদার্থের গলনাংকের মান বিভিন্ন ; যেমন—লোহার গলনাংক 1539°C, কপারের 1083°C, ন্যাপ্-থালিনের ৪0°C, খাদ্য-লবণের 815°C, বরফের 0°C, ইত্যাদি। পরীক্ষাগারে ন্যাপ্থালিনের গলনাংক নির্ণয়ের একটি সহজ পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা : একটি কাঁচ-নির্মিত এক-মুখ-বন্ধ কৈশিক নলের (capillary tube) কিছু অংশ ন্যাপ্থালিনের গুঁড়া দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এই নলটিকে এখন রবার-বন্ধনীর সাহায্যে একটি থার্মোমিটারের সঙ্গে এমনভাবে আঁটিতে হইবে, যাহাতে থার্মোমিটারের পারদ-বাল্বটি কৈশিক নলের ন্যাপ্থালিন-পূর্ণ অংশের সঙ্গে জুড়িয়া থাকে। এইবার একটি দীর্ঘ-নাল কাঁচ-কুপীতে রক্ষিত জলে পরস্পর সংযুক্ত ঐ কৈশিক নল ও থার্মোমিটারটির নিম্নাংশ নিমজ্জিত রাখিয়া কাঁচ-কুপীর মুখে সংযুক্ত একটি কর্কের সাহায্যে উহাকে দণ্ডায়মান রাখিতে হইবে। এখন, এই অবস্থায় কাঁচ কুপীটিকে স্পিরিট-ল্যাম্পের মৃদু শিখায় ধীরে-ধীরে উত্তপ্ত করিতে হইবে। তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া 80°C-এ পৌঁছিবা মাত্র দেখা যাইবে, কৈশিক নলের ন্যাপ্থালিন গলিয়া স্বচ্ছ হইতে শুরু করিয়াছে এবং সম্যক ন্যাপ্থালিন গলিয়া তরল না হওয়া পর্যন্ত তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও উষ্ণতা আর বাড়িতেছে না। এই পরীক্ষা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ন্যাপ্থালিনের গলনাংক হইল 80°C।

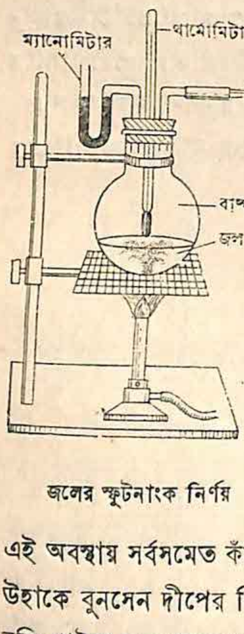


ন্যাপ্থালিনের গলনাংক নির্ণয়

স্ফুটনাংক (Boiling Point) :

কোন তরল পদার্থ যে সুনির্দিষ্ট স্থির উষ্ণতায় ফুটিয়া বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তাহাকে বলা হয় তরলটির **স্ফুটনাংক** (boiling point)। স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রত্যেক তরলেরই কোন সুনির্দিষ্ট স্ফুটনাংক থাকে ; যেমন—মার্কারীর স্ফুটনাংক 357°C, জলের স্ফুটনাংক 100°C, ইথাইল অ্যালকোহলের 78.5°C, ইথারের 34·5°C ইত্যাদি। পরীক্ষাগারে জলের স্ফুটনাংক নির্ণয়ের একটি সহজ পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা : একটি কাঁচ-কুপীর মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিশুদ্ধ পাতিত জলে পূর্ণ করিতে হইবে। কুপীটির মুখ তিনটি ছিদ্রযুক্ত একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করিতে হইবে ; মধ্যবর্তী ছিদ্রে একটি থার্মোমিটার, এক পার্শ্বের ছিদ্রে একটি U-আকৃতি সরু কাঁচ-নল ও অপর পার্শ্বের ছিদ্রে বাষ্প-নির্গমনের জন্য একটি সমকোণী কাঁচ-নল থাকিবে। থার্মোমিটারটির পারদ-বাল্ব কুপীটির জলের উন্মুক্ত তলের সামান্য উপরে থাকিতে হইবে, অপর নল দুইটির নিম্ন-প্রান্ত কর্কের ঠিক নীচে শেষ হইবে। এখন, U-নলটির বাহিরের খোলা-মুখে কিছু পারদ ঢালিলে নলটির দুই বাহুতে পারদ স্বভাবতঃ সমান উচ্চতায় থাকিবে।



জলের স্ফুটনাংক নির্ণয়

এই অবস্থায় সর্বসমেত কাঁচ-কুপীটিকে একটি তার-জালির উপরে স্থাপন করিয়া উহাকে বুনসেন দীপের শিখায় উত্তপ্ত করিতে হইবে। তাপমাত্রা ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে যখন জল ফুটিতে শুরু করিবে, তখন দেখা যাইবে, এই অবস্থায় থার্মোমিটারটি 100°C তাপমাত্রা নির্দেশ করিতেছে, এবং সম্যক জল ফুটিয়া বাষ্পাকারে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত উহার উষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্তন হইতেছে না। এই তাপমাত্রাই হইল জলের **স্ফুটনাংক**।

পদার্থের সনাক্তকরণ

(Identification of Matter)

রসায়ন-বিজ্ঞানে অজানা পদার্থকে জানিবার, অর্থাৎ কোন পদার্থের প্রকৃত রাসায়নিক স্বরূপ নির্ধারণ করিবার পদ্ধতিকে বলা হয় **অভীক্ষণ** (testing), বা **সনাক্তকরণ** (identification)। ইহার জন্য বিভিন্ন পদার্থের নিজস্ব বিশেষ-বিশেষ গুণ, বা ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পদার্থের ধর্ম (Properties of Matter) :

পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, বা গুণ থাকে, যাহাদের বলা হয় পদার্থটির **ধর্ম** (properties)। একই ধর্ম একাধিক বিভিন্ন পদার্থে থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পদার্থেরই নিজস্ব এমন কিছু-কিছু বিশেষ ধর্ম থাকে, যাহা অপর কোন পদার্থে থাকে না। কোন পদার্থের এইরূপ স্বকীয় অনন্য ধর্মগুলি লক্ষ্য করিয়া পদার্থটির সঠিক পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়।

পদার্থের ধর্ম দুই **প্রকার** ; যেমন, (a) ভৌত ধর্ম ও (b) রাসায়নিক ধর্ম।

(a) **ভৌত ধর্ম** (Physical Properties) : যে-সকল ধর্ম পদার্থের ভৌত প্রকৃতি, বা অবস্থার উপরে নির্ভরশীল, এবং যাহাতে পদার্থটির রাসায়নিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য, বা পরিচয় কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না, তাহাদের বলা হয় পদার্থের **ভৌত ধর্ম** (Physical properties)।

বিভিন্ন পদার্থের **স্পর্শগত** (touch) অনুভূতি বিভিন্ন। গ্র্যাফাইট, ট্যাল্ক, বোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি স্পর্শ করিলে বেশ নরম, মোলায়েম ও পিচ্ছিল বোধ হয় ; কিন্তু একখণ্ড প্রস্তর, বা চকের স্পর্শানুভূতি যথেষ্ট অমসৃণ, খস্‌খসে।

বিভিন্ন পদার্থের **বর্ণের** (colour) মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা থাকে। তুঁতে নীল বর্ণ, চুন সাদা, সাধারণ খাদ্য-লবণ বর্ণহীন। সোনা (গোল্ড) উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ, রূপা (সিলভার) ঝকঝকে সাদা, তামা (কপার) লাল্‌চে, লোহা (আয়রন) ধূসর। ক্লোরিন হরিদ্রাভ-সবুজ বর্ণ, আয়োডিন-বাষ্প বেগুনী, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাদামী, অ্যামোনিয়া বর্ণহীন।

কোন-কোন পদার্থের নিজস্ব এক প্রকার বিশেষ **গন্ধ** (smell) থাকে, যাহা দ্বারা অনেক সময় পদার্থটিকে সনাক্ত করা যায়। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি গন্ধহীন ; ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি তীব্র ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত ;

আবার, হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ পচা ডিমের ন্যায়। অনেক তরল পদার্থেরও বিশেষ-বিশেষ গন্ধ থাকে ; যেমন, কেরোসিন, ক্লোরোফর্ম, অ্যালকোহল, ইথার ইত্যাদি তরল পদার্থের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্ন গন্ধ আছে।

দ্রাব্যতা (solubility)-র বিচারেও বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা বর্তমান। বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন দ্রাবকে (solvent) দ্রবীভূত হয়। সাধারণ খাদ্য-লবণ, চিনি ইত্যাদি জলে দ্রবণীয়, কিন্তু সালফার, আয়োডিন ইত্যাদি জলে দ্রবীভূত হয় না ; সালফার কার্বন-ডাইসালফাইড নামক তরলে এবং আয়োডিন কার্বন-ডাইসালফাইড, বা কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড নামক তরলে দ্রবীভূত হয়। ক্লোরোফর্ম জলে দ্রবণীয় নহে, কিন্তু উহা অ্যালকোহল, ইথার, বা কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের সহিত স্বচ্ছন্দে মেশে ; বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যেও দ্রাব্যতার যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় ; যেমন—হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস জলে প্রায় অদ্রবণীয়, অথচ ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, বা সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে যথেষ্ট মাত্রায় দ্রবীভূত হয়।

কোন-কোন ধাতু বিশেষতঃ লোহা (আয়রন), নিকেল ও কোবাল্ট চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় ইহাদের চুম্বকে পরিণত করাও যায় ; কিন্তু কপার, জিঙ্ক ইত্যাদি ধাতুর এইরূপ **চৌম্বক ধর্ম** (magnetic property) নাই। ইহা কোন-কোন ধাতব পদার্থের এক বিশেষ ভৌত ধর্ম।

(b) **রাসায়নিক ধর্ম** (Chemical Properties) : যে-সকল ধর্মে পদার্থের রাসায়নিক উপাদানগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহাদের বলা হয় পদার্থের **রাসায়নিক ধর্ম** (Chemical properties)।

প্রায় সকল পদার্থকেই বায়ুতে যথোচিত **উত্তপ্ত করিলে** (on heating) বায়ুর অক্সিজেনের সহিত উহাদের রাসায়নিক সংযোগ, বা দহন-ক্রিয়ার ফলে সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ (বিভিন্ন অক্সাইড যৌগ) গঠিত হয়। ম্যাগ্‌নেসিয়ামের তার জ্বালাইলে উহার অক্সাইডের সাদা ভস্ম পড়িয়া থাকে ; উত্তাপ প্রয়োগে লাল্‌চে কপার (তামা) কালো কপার অক্সাইডে পরিণত হয়। চিনি, মোম, কেরোসিন, স্পিরিট ইত্যাদি জ্বালাইলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

বিভিন্ন পদার্থের উপরে **অ্যাসিড ও ক্ষারের ক্রিয়া** (action of acids and alkalies) বিভিন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অধিকাংশ ধাতুই

হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক, নাইট্রিক প্রভৃতি কোন-না-কোন খনিজ অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়। কেবল ধাতুই নহে, বস্তুতঃ খনিজ অ্যাসিডে অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থই দ্রবীভূত হয় এবং রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় বিভিন্ন লবণ-উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার, ক্ষার-জাতীয় পদার্থের সহিত বিভিন্ন অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায়ও বিভিন্ন লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় পদার্থের বিভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম প্রকাশ পায় এবং ইহার সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

(Physical and Chemical Changes)

পৃথিবীতে অহরহঃ নানাভাবে পদার্থের নানা রূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। উত্তপ্ত করিলে জল বাষ্পীভূত হয়, ঠাণ্ডা করিলে জমিয়া কঠিন বরফে পরিণত হয়। জলে চিনি, বা লবণ যোগ করিলে স্বচ্ছ দ্রবণ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম ধাতব তারের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে তাহা উত্তপ্ত ও ভাস্বর হইয়া উঠে। আবার, আর্দ্র বায়ুতে কিছুকাল রাখিলে লোহায় মরিচা ধরে; কাঠ, বা কয়লা পোড়াইলে সামান্য মাত্র ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। এই সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝা যায়, পদার্থের পরিবর্তন, বা রূপান্তর দুই প্রকার। যেমন—

(i) **ভৌত পরিবর্তন** (Physical Change): জল, বাষ্প ও বরফ রাসায়নিক বিচারে মূলতঃ একই; উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে জলের কেবল ভৌত অবস্থাগত রূপান্তর ঘটে। চিনি, বা লবণের দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে জল বাষ্পীভূত হইয়া উবিয়া গিয়া চিনি, বা লবণ আবার কঠিন আকারে ফিরিয়া পাওয়া যায়। তড়িৎ-প্রভাবে প্রদীপ্ত ধাতব তার তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে; তারের কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে পদার্থের রাসায়নিক উপাদানের কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন ঘটে না। পদার্থটির সাময়িক একটি ভৌত রূপান্তর ঘটে মাত্র, মূল পদার্থ একই থাকে। পদার্থের ভৌত অবস্থাগত এইরূপ পরিবর্তনকে বলা হয় **ভৌত পরিবর্তন**।

(ii) **রাসায়নিক পরিবর্তন** (Chemical Change): লোহায় যে মরিচা ধরে তাহা লোহা নহে, রাসায়নিক বিচারে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ,—লোহার একটি অক্সাইড যৌগ; মরিচা হইতে লোহা পুনরুদ্ধার করা দুঃসাধ্য। কয়লা, বা কাঠ

পোড়াইলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে তাহা কয়লা, বা কাঠ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ; সেই ভস্ম হইতে কয়লা, বা কাঠ আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে পদার্থের উপাদানগত স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ যে-সকল পরিবর্তনের ফলে পদার্থের উপাদানগত মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়া পৃথক ধর্ম-বিশিষ্ট সম্পূর্ণ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহাদের বলে **রাসায়নিক পরিবর্তন**।

পদার্থের উক্ত দ্বিবিধ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে সংক্ষেপে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
1. পদার্থের রাসায়নিক উপাদানগত কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না, মূল পদার্থটি পরিবর্তিত ভিন্ন কোন অবস্থায় থাকে মাত্র।	1. পদার্থের রাসায়নিক উপাদানগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে এবং এক, বা একাধিক নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়।
2. ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী; পরিবর্তনের কারণ,—যথা চাপ, তাপ, দ্রাবক, তড়িৎ-শক্তি প্রভৃতি অপসারিত করিলে পদার্থটি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে।	2. রাসায়নিক পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী; পরিবর্তনের কারণ, বা সহায়ক অবস্থার অপসারণে উৎপন্ন পদার্থকে সহজে মূল পদার্থে পরিণত করা যায় না।
3. ইহাতে কেবল পদার্থের ভৌত ধর্মের পরিবর্তন ঘটে, রাসায়নিক ধর্ম ও উপাদানিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে।	3. পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তিত হয় এবং পদার্থটির মৌলিক রূপান্তর ঘটে।
4. ভৌত পরিবর্তনে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতেও পারে, না-ও পারে।	4. রাসায়নিক পরিবর্তনে উষ্ণতার হ্রাস, বা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; ইহাতে তাপ উদ্ভূত, বা শোষিত হইবেই।

রাসায়নিক পরিবর্তনের সহায়ক, বা নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন উপায়ঃ
(Factors influencing Chemical Action)

বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া বিভিন্ন উপায়, বা পদ্ধতিতে সংঘটিত হইয়া থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনের সহায়ক এইরূপ বিভিন্ন উপায়গুলি নিম্নে আলোচিত হইলঃ

(i) **সংস্পর্শ** (Contact): যে-কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাইতে

হইলে বিক্রিয়ক পদার্থগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ, বা সংযোগ অবশ্যই প্রয়োজন। বিক্রিয়ক পদার্থসমূহ পরস্পরের সংস্পর্শে না আসিলে উহাদের মধ্যে কোনরূপ বিক্রিয়া ঘটা স্বভাবতঃই সম্ভব হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক খণ্ড আয়োডিনকে এক টুক্‌রা ফস্‌ফরাসের পার্শ্বে রাখিলে কোন বিক্রিয়া ঘটে না; কিন্তু ফস্‌ফরাসের সহিত আয়োডিন মিশাইলে, অর্থাৎ উভয়ের সংস্পর্শ ঘটাইলেই পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ফস্‌ফরাস স্বতঃই জ্বলিয়া উঠে এবং আয়োডিনের সংযোগে ফস্‌ফরাস ট্রাই-আয়োডাইড যৌগ উৎপন্ন হয়: $P_4 + 6 I_2 = 4PI_3$।

(ii) **দ্রবণ** (Solution): কোন-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইলে বিক্রিয়ক পদার্থগুলিকে কোন উপযুক্ত দ্রাবকে (সাধারণতঃ জলে) দ্রবীভূত করিতে হয়; শুষ্ক অবস্থায় তাহাদের বিক্রিয়া ঘটে না।

সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও টার্টারিক অ্যাসিডের শুষ্ক মিশ্রণে [ইহাকে বলা হয় সিড্‌লিজ পাউডার (Seidlitz powder)] পদার্থ দুইটির মধ্যে কোন বিক্রিয়া ঘটে না; কিন্তু মিশ্রণটি জলে দ্রবীভূত করিলে সঙ্গে-সঙ্গে উভয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হইতে থাকে: $2NaHCO_3 + C_4H_6O_6 = Na_2C_4H_4O_6 + 2H_2O + 2CO_2$।

(iii) **তাপ** (Heat): সাধারণতঃ উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে নিষ্পন্ন হয় এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগ না করিলে রাসায়নিক ক্রিয়া কোনক্রমেই সম্ভব হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পারদ, বা মার্কারি বায়ু, বা অক্সিজেনের মধ্যে উত্তপ্ত করিলে মার্কিউরিক অক্সাইডের লাল চূর্ণ (পারদ-ভস্ম) পাওয়া যায়; আরও তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে উহা আবার বিয়োজিত হইয়া পুনরায় মার্কারি ও অক্সিজেনে পৃথক হইয়া যায়। $2Hg + O_2 \rightleftharpoons 2HgO$।

(iv) **অনুঘটন** (Catalysis): কোন-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বিশেষ-বিশেষ কোন পদার্থের উপস্থিতি মাত্রেই ত্বরান্বিত, বা মন্দীভূত হয়; অথচ পদার্থটি সেই বিক্রিয়ায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে না, তাহার রাসায়নিক, বা পরিমাণগত কোন পরিবর্তনও ঘটে না; উহা যেমন ছিল তেমনিই থাকে। এইরূপ পদার্থকে বলা হয় **অনুঘটক** (catalyst) এবং এই প্রক্রিয়াকে বলে **অনুঘটন** (catalysis)। অনুঘটন-ক্রিয়া বস্তুতঃ দুই প্রকার। যে-ক্ষেত্রে অনুঘটকের উপস্থিতির ফলে বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, তাহাকে বলে **ধনাত্মক**

অনুঘটন (positive catalysis) ; সাধারণভাবে ইহাকেই **অনুঘটন** বলা হয়। পক্ষান্তরে, যে-ক্ষেত্রে অনুঘটকের প্রভাবে বিক্রিয়ার গতিবেগ মন্দীভূত হয়, তাহাকে বলে **ঋণাত্মক অনুঘটন**, বা **মন্দন** (negative catalysis)।

পটাশিয়াম ক্লোরেটকে যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে তাহা বিয়োজিত হইয়া অক্সিজেন গ্যাস বিমুক্ত হয়। কিন্তু উহার সহিত সামান্য কিছু পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশাইলে অনেক কম তাপমাত্রায়ই পটাশিয়াম ক্লোরেটের তাপীয় বিয়োজন-ক্রিয়া যথেষ্ট দ্রুত নিষ্পন্ন হয় ; অথচ বিক্রিয়া-অন্তে দেখা যায়, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক গঠন, বা পরিমাণের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না : $2KClO_3\ [+MnO_2]=2KCl+3O_2\ [+MnO_2]$। এই ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ধনাত্মক অনুঘটকের কাজ করে।

হাইড্রোজেন পারক্সাইড একটি অস্থায়ী যৌগ ; জলীয় দ্রবণে উহা সাধারণ তাপমাত্রাতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যথেষ্ট দ্রুত বিয়োজিত হইয়া জল ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয় : $2H_2O_2=2H_2O+O_2$। কিন্তু হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সঙ্গে সামান্য গ্লিসারল, বা ফস্‌ফরিক অ্যাসিড মিশাইলে উহার বিয়োজন-ক্রিয়ার হার যথেষ্ট হ্রাস পায়, অর্থাৎ যৌগটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রে গ্লিসারল, বা ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ঋণাত্মক অনুঘটকের কাজ করে।

তাপ-উদ্‌গারী ও তাপ-শোষক বিক্রিয়া :
(Exothermic and Endothermic Reactions)

রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে কেবল যে এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাহাই নহে, পদার্থের তাপীয় অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। বস্তুতঃপক্ষে, যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায়ই তাপমাত্রার কিছু-না-কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই হিসাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই প্রকার ; যথা—

(i) **তাপ-উদ্‌গারী বিক্রিয়া** (Exothermic Reactions) : যে-সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ বিক্রিয়ার ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহাদের বলা হয় **তাপ-উদ্‌গারী বিক্রিয়া**।

কার্বন, বা কয়লার দহন-কালে কার্বনের সহিত অক্সিজেনের সংযোগে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে প্রচুর তাপের উদ্ভব ঘটে :

$C + O_2 = CO_2 + 97,000$ ক্যালোরি তাপ। অনুরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কাঠ, মোম, পেট্রোল প্রভৃতির দহনেও প্রচুর তাপের উদ্ভব হইয়া থাকে।

শুষ্ক পোড়া-চুন, বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO)-এর সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় কলি-চুন, বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$], উৎপন্ন হয় এবং তাহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে ; ইহাও একটি তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়া।

(ii) **তাপ-শোষক বিক্রিয়া** (Endothermic Reactions) : যে-সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়, অর্থাৎ বিক্রিয়ার ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়, তাহাদের বলে **তাপ-শোষক বিক্রিয়া**।

কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস শ্বেত-তপ্ত কোক-কয়লার উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন হয় ; সেই সঙ্গে যথেষ্ট তাপ শোষিত হয় এবং ইহার ফলে কোক-কয়লার তাপমাত্রা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে : $CO_2 + C = 2CO - 39,000$ ক্যালোরি তাপ। ইহা একটি তাপ-শোষক বিক্রিয়া।

বৈদ্যুতিক আর্ক-শিখার (electric arc) মধ্য দিয়া বায়ু প্রবাহিত করিলে বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সংযোজনের ফলে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহা তাপ-শোষক বিক্রিয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত : $O_2 + N_2 = 2NO - 43,200$ ক্যালোরি তাপ।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ

(Elements and Compounds)

পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য অগণিত পদার্থ রহিয়াছে। বিভিন্ন পদার্থকে নানা-ভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাদি করিয়া জানা গিয়াছে, উপাদানগত গঠনের বিচারে যাবতীয় পার্থিব পদার্থকে মূলতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :— **মৌলিক** পদার্থ ও **যৌগিক** পদার্থ।

(i) **মৌলিক পদার্থ** (Elements) : **যে-সকল পদার্থ একটি মাত্র উপাদানে গঠিত, অর্থাৎ কোন রকম ভৌত, বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিয়াও যে-সকল পদার্থ হইতে পৃথক গুণ ও ধর্ম-বিশিষ্ট অপর কোন ভিন্ন পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাদের বলা হয় মৌলিক পদার্থ, বা মৌল** (element)। লোহা, সোনা, পারদ, তামা, হাইড্রোজেন,

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ ; কারণ, ইহারা একক মূল পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহাদের মধ্যে অপর কোন ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। কোন প্রকার বিশ্লেষণেই বিশুদ্ধ লোহা হইতে লোহা, অথবা হাইড্রোজেন হইতে হাইড্রোজেন ব্যতীত অপর কোন ভিন্ন পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে না।

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মূল উপাদান এইরূপ কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা অতি সীমিত ; এযাবৎ মাত্র 104-টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার 92-টি মৌল কোন-না-কোন অবস্থায় পৃথিবীতে পাওয়া যায় ; অবশিষ্টগুলি কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করা হইয়াছে, যেমন—কুরিয়াম (Curium), ক্যালিফোর্নিয়াম (Californium) ইত্যাদি। এই সকল মৌল অস্থায়ী বলিয়া পৃথিবীতে ইহাদের স্বাভাবিক কোন অস্তিত্ব নাই। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র মৌল পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ; অবশিষ্ট অধিকাংশ মৌলই অপরাপর বিভিন্ন মৌলের সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক পদার্থের আকারে রহিয়াছে।

(ii) **যৌগিক পদার্থ** (Compounds) : যাবতীয় পার্থিব পদার্থের মধ্যে বস্তুতঃ মাত্র 92-টি পদার্থ মৌলিক শ্রেণীভুক্ত ; অবশিষ্ট সকল পদার্থই দুই, বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পারস্পরিক রাসায়নিক মিলনে গঠিত কোন যৌগিক পদার্থ, বা যৌগ। সুতরাং, উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিলে এই ধরনের যে-কোন যৌগ হইতে ভিন্ন প্রকৃতি ও ধর্ম-বিশিষ্ট একাধিক বিভিন্ন মৌল পাওয়া যাইবেই। অতএব বলা যায়, **যে বিশুদ্ধ ও সমসত্ব পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিলে একাধিক বিভিন্ন মৌল পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় যৌগিক পদার্থ, বা যৌগ** (compound)।

কোন যৌগে তাহার সংগঠক মৌল উপাদানগুলির নিজস্ব কোন গুণ, বা ধর্ম বর্তমান থাকে না, মৌলগুলি পরস্পর একীভূতভাবে মিলিয়া গিয়া সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম-বিশিষ্ট নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জল একটি যৌগিক পদার্থ ; কারণ, জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে উহা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। হাইড্রোজেন দাহ্য গ্যাস, আর অক্সিজেন গ্যাস দাহক ; কিন্তু উহাদের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন জলের দাহ্য, বা দাহক কোন ধর্মই নাই,—পরন্তু জল একটি তরল পদার্থ। সাধারণ পরিচিত অধিকাংশ পদার্থ, যথা খাদ্য-লবণ,

চিনি, বালি, তেল, অ্যালকোহল, অ্যাসিড, ক্ষার ইত্যাদি হইল যৌগিক পদার্থ ; আর দুধ, সিমেন্ট ইত্যাদি একাধিক যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ।

একাধিক মৌলের পারস্পরিক রাসায়নিক মিলনে যৌগের সৃষ্টি হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু মৌলগুলি যে-কোন অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হয় না। দুই, বা ততোধিক মৌল উহাদের ওজন, বা আয়তনের কোন **সুনির্দিষ্ট অনুপাতে** রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরস্পর মিলিত হইয়া যৌগ উৎপন্ন করে, ইহাই রাসায়নিক সংযোগের নিয়ম ; যেমন — হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দুইটির ওজন-ভিত্তিক 1 : 8 অনুপাতে রাসায়নিক মিলনের ফলে যৌগিক পদার্থ জল উৎপন্ন হয় ; বিক্রিয়াকালে কোন একটি মৌল এই অনুপাত অপেক্ষা অতিরিক্ত থাকিলে তাহা অপরিবর্তিত অবিকৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। রাসায়নিক সংযোগের এই নিয়মের কখনই কোন ব্যতিক্রম ঘটা সম্ভব নহে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে-কোন নির্দিষ্ট যৌগের উপাদানগত গঠন সর্বদা সুনির্দিষ্ট।

মৌলিক, বা যৌগিক যে-কোন পদার্থই উহার অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর পাশাপাশি সংঘবদ্ধ অবস্থানের ফলে গঠিত। **অণু** (molecule) হইল **যে-কোন পদার্থের** ক্ষুদ্রতম কণিকা, যাহাতে পদার্থটির নিজস্ব যাবতীয় গুণ ও ধর্ম বজায় থাকে। অণুকে আরও ভাঙিলে পাওয়া যায় পরমাণু, কিন্তু উহাতে মূল পদার্থটির গুণ, বা ধর্ম আর অক্ষুণ্ণ থাকে না। **পরমাণু** (atom) হইল **মৌলিক পদার্থের** ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা, যাহা রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু যাহার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। পরমাণু সর্বদা জোটবদ্ধভাবে অণু-আকারে থাকে। যে-কোন যৌগিক পদার্থের অণু একাধিক (অন্ততঃপক্ষে দুইটি) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু লইয়া গঠিত ; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের অণুতে স্বভাবতঃই কেবলমাত্র ঐ মৌলটিরই পরমাণু থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দুইটির প্রত্যেকটির অণু দুইটি করিয়া নিজ-নিজ পরমাণুর সমবায়ে গঠিত ; কিন্তু যৌগিক পদার্থ জলের এক-একটি অণুতে একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত থাকে।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতাসমূহের নিম্নলিখিতরূপ তুলনা করা যাইতে পারে।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

মৌলিক পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
1. মৌলিক পদার্থের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত; স্থায়ী প্রাকৃতিক মৌলের সংখ্যা মাত্র 92-টি।	1. যৌগিক পদার্থের সংখ্যা অগণিত; পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থ-ই যৌগিক।
2. মৌলিক পদার্থ একক ও স্বাভাবিক মূল বস্তু; কোন প্রকার বিশ্লেষণেই তাহা হইতে ভিন্ন ধর্ম-বিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না।	2. যৌগিক পদার্থ একাধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে গঠিত; কাজেই যে-কোন যৌগিক পদার্থকে উপযুক্ত রূপে বিশ্লেষণ করিয়া সংগঠক বিভিন্ন মৌল উপাদানে বিভক্ত করা যায়।
3. স্থায়ী প্রাকৃতিক মৌলগুলি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ই সৃষ্টি করা যায় না; উহাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক যৌগ হইতে মৌল-গুলিকে পৃথক করা যায় মাত্র।	3. যৌগিক পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা যায়; বিভিন্ন মৌলের সুনির্দিষ্ট আনুপাতিক রাসায়নিক মিলনের ফলে বিভিন্ন যৌগ গঠিত হয় এবং গঠন-কালে তাপীয় পরিবর্তন ঘটে।
4. মৌলিক পদার্থের অণু একই ধরনের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত; যে-কোন মৌলের অণু সেই মৌলেরই এক বা একাধিক পরমাণুর সমষ্টি মাত্র।	4. যে-কোন যৌগিক পদার্থের অণু উহার সংগঠক বিভিন্ন মৌলের একাধিক বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত।

ধাতু ও অ-ধাতু
(Metals and Non-metals)

মৌলিক পদার্থগুলিকে তাহাদের বিশেষ-বিশেষ কতকগুলি ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের প্রভেদ অনুসারে মূলতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে;— **ধাতু** (metals) ও **অ-ধাতু** (non-metals)। কোন-কোন মৌলের ধর্ম অবশ্য ধাতু ও অ-ধাতুর মাঝামাঝিও হয়, উভয়ের ধর্মই তাহাতে কিছু-কিছু বর্তমান থাকে; এই সকল মৌলিক পদার্থকে বলা হয় উপ-ধাতু, বা **ধাতুকল্প** (metalloid)।

পৃথিবীতে মোট মৌলিক পদার্থের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ধাতু, অবশিষ্টগুলি অ-ধাতু। সাধারণতঃ ধাতু মাত্রই কঠিন, উজ্জ্বল ও যথেষ্ট ভারী। ধাতু আঘাতে প্রসারিত হয়, ভাঙে না; উত্তাপে নরম হয়, টানিলে বাড়ে। ধাতুর

এইরূপ কাঠিন্য, ঔজ্জ্বল্য, ঘাতসহতা, অ-ভঙ্গুরতা, প্রসারণশীলতা প্রভৃতি ভৌত ধর্ম অ-ধাতুতে সচরাচর দেখা যায় না। বিভিন্ন রাসায়নিক ধর্মের বিচারেও ধাতু ও অ-ধাতুর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পর্যায়ে পড়ে ; কার্বন, ফসফরাস, সালফার, আয়োডিন, ব্রোমিন, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি **অ-ধাতু** শ্রেণীভুক্ত ; আর অ্যান্টিমনি, বিস্‌মাথ, আর্সেনিক প্রভৃতি কয়েকটি মৌলে ধাতু ও অ-ধাতু উভয়ের ধর্মই কিছু-কিছু লক্ষ্য করা যায় ; ইহাদের বলা হয় **ধাতুকল্প**।

যাহা হউক, যে-সকল ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে মৌলগুলিকে ধাতু ও অ-ধাতুতে বিভক্ত করা হইয়াছে নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা হইল।

ধাতু ও অ-ধাতুর পার্থক্য :
(Distinction between Metals and Non-metals)

1. স্বাভাবিক অবস্থায় ধাতুগুলি সাধারণতঃ কঠিন আকারে থাকে, সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় কোন ধাতুই গ্যাসীয় হয় না ; পক্ষান্তরে, অ-ধাতুগুলি কঠিন ও গ্যাসীয় দুই-ই হইতে পারে। **ব্যতিক্রম :** ধাতুর মধ্যে পারদ ও অ-ধাতুর মধ্যে ব্রোমিন তরল অবস্থায় থাকে।

2. ধাতু সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ভারী এবং উচ্চ স্ফুটনাংক ও গলনাংক বিশিষ্ট হয় ; অ-ধাতুগুলি অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা এবং নিম্ন গলনাংক ও স্ফুটনাংক-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। **ব্যতিক্রম :** সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ধাতু যথেষ্ট হাল্‌কা এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন গলনাংক ও স্ফুটনাংক-বিশিষ্ট।

3. ধাতু মাত্রেরই এক প্রকার বিশেষ ধাতব ঔজ্জ্বল্য (metallic lustre) থাকে ; অ-ধাতুর সাধারণতঃ এইরূপ কোন ঔজ্জ্বল্য লক্ষিত হয় না। **ব্যতিক্রম :** আয়োডিন ও হীরক (কার্বন) অ-ধাতু হইলেও ধাতুর ন্যায় উজ্জ্বল, ঝক্‌ঝকে এবং আলোক-প্রতিফলনে সক্ষম।

4. ধাতু মাত্রেই সাধারণতঃ ঘাতসহ, প্রসারণশীল ও অ-ভঙ্গুর হয়। উহারা উত্তাপে নরম হয় ও গলে, আঘাতে ভাঙে না, প্রসারিত হয় এবং উহাদের টানিয়া সরু তারে পরিণত করা যায়। অ-ধাতুর এইরূপ ঘাতসহতা, প্রসারণ-শীলতা ও অ-ভঙ্গুরতা কোন ক্ষেত্রেই দেখা যায় না।

5. ধাতু সাধারণতঃ তড়িৎ ও তাপের সু-পরিবাহী (good conductor), আর অ-ধাতুগুলি কু-পরিবাহী (bad conductor)। **ব্যতিক্রম ঃ** পারদ ধাতু-শ্রেণীভুক্ত হইলেও উহার তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা সামান্য ; আবার, গ্র্যাফাইট ও গ্যাস-কার্বন অ-ধাতু হইলেও উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ।

6. ধাতু মাত্রেই **ধন-তড়িদ্বাহী** (electro-positive) ; অর্থাৎ, ধাতব যৌগের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ-কালে ধাতু সর্বদাই **ঋণ-তড়িদ্‌দ্বার,** বা ক্যাথোডে (cathode) বিমুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, অ-ধাতুগুলি **ঋণ-তড়িদ্বাহী** (electro-negative) ; অর্থাৎ, কোন যৌগের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যৌগের অ-ধাতব অংশ **ধন-তড়িদ্‌দ্বার,** বা অ্যানোডে (anode) বিমুক্ত হয়। **ব্যতিক্রম ঃ** হাইড্রোজেন অ-ধাতু হইয়াও ধাতুর ন্যায় ধন-তড়িদ্বাহী।

7. সকল ধাতুই সাধারণতঃ হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক, নাইট্রিক ইত্যাদি খনিজ অ্যাসিডে (mineral acids) দ্রবীভূত হইয়া থাকে ; অ-ধাতু সচরাচর সাধারণ তাপমাত্রায় কোন খনিজ অ্যাসিডে আক্রান্ত হয় না। **ব্যতিক্রম ঃ** সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু কোন একক খনিজ অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না ; উহাদের দ্রবীভূত করিতে হইলে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের আয়তন-ভিত্তিক 3 : 1 মিশ্রণ (**অ্যাকোয়া রিজিয়া,** Aqua Regia) প্রয়োজন হয়।

8. ধাতব অক্সাইড সাধারণতঃ ক্ষার-ধর্মী ও অ-ধাতব অক্সাইড অ্যাসিড-ধর্মী হইয়া থাকে ; অর্থাৎ, ধাতব অক্সাইড অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ায় এবং অ-ধাতব অক্সাইড ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়ায় লবণ ও জল গঠন করে। **ব্যতিক্রম ঃ** জল অ-ধাতুর অক্সাইড হইলেও উহার অ্যাসিড, বা ক্ষারকীয় কোন ধর্মই নাই। আবার, টিন, জিংক, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর অক্সাইড যৌগের অ্যাসিড ও ক্ষারকীয় উভয় ধর্মই বর্তমান ; উহাদের বলা হয় উভ-ধর্মী অক্সাইড (amphoteric oxide)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, মৌলগুলির এইরূপ শ্রেণী বিভাগ তেমন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে ; ধাতু ও অ-ধাতুগুলির ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য-সমূহের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই কিছু-কিছু ব্যতিক্রম রহিয়াছে। ধাতু ও অ-ধাতুর প্রধান-প্রধান ধর্মগুলি যাহাতে যেমন প্রাধান্য লাভ করে তাহাকে তদনুযায়ী ধাতু, বা অ-ধাতু বলা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্রবণ ও দ্রাব্যতা

(Solution and Solubility)

পাঠ্যসূচী ঃ দ্রবণঃ দ্রাবক ও দ্রাব ; সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ; তাপমাত্রার সহিত দ্রাব্যতার সম্পর্ক।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, লবণ, চিনি, সোরা প্রভৃতি কঠিন পদার্থে, অথবা অ্যালকোহল, গ্লিসারিন প্রভৃতি তরল পদার্থে জল মিশাইলে পদার্থগুলি জলে গলিয়া-মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় ; জল যেমন স্বচ্ছ পরিষ্কার ছিল, দৃশ্যতঃ তেমনই থাকে। কেবল জলই নহে, বিভিন্ন তরল পদার্থে বিভিন্ন কঠিন, তরল, বা গ্যাসীয় পদার্থ এইরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া দৃশ্যতঃ একীভূত হইয়া যায় ; যেমন—কার্বন ডাইসালফাইডে সালফার, অ্যালকোহলে আয়োডিন, জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রভৃতি।

দ্রবণ ঃ দ্রাবক ও দ্রাব

(Solution : Solvent and Solute)

দুই, বা ততোধিক পদার্থ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া-মিশিয়া সমসত্ত্ব (homogenous) **মিশ্রণ গঠন করিলে তাহাকে বলা হয় দ্রবণ** (solution)। দ্রবণ বস্তুতঃ এক প্রকার **সমসত্ত্ব মিশ্র পদার্থ** ; সংগঠক পদার্থসমূহের অণুগুলি ইহাতে সর্বত্র সমভাবে মিশিয়া থাকে, অর্থাৎ দ্রবণের যে-কোন অংশেই পদার্থগুলির অনুপাত সমান হয়। যে পদার্থের মধ্যে অপর কোন পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া দ্রবণ গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় **দ্রাবক** (solvent) ; আর, যে-পদার্থ টি দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত থাকে, তাহাকে বলে **দ্রাব** (solute)। অতএব বলা যায় ঃ **দ্রবণ = দ্রাবক + দ্রাব।**

দ্রবণ বলিতে যদিও সাধারণতঃ কোন তরল দ্রাবকে (যথা, জলে) কোন কঠিন, তরল, বা গ্যাসীয় দ্রাবের সমসত্ত্ব মিশ্রণ বুঝায়, কিন্তু দ্রাবক ও দ্রাব্যের ভৌত অবস্থার বিভিন্নতার বিচারে বহু বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ গঠিত হইতে পারে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধরনের দ্রবণের উদাহরণ প্রদত্ত হইল ঃ

(i) তরল পদার্থে কঠিন পদার্থের দ্রবণ (সাধারণ দ্রবণ) : জলে চিনি, লবণ ইত্যাদি ; বেনজিনে রবার ; কার্বন ডাইসালফাইডে সালফার।

(ii) তরল পদার্থে তরল পদার্থের দ্রবণ : জলে অ্যালকোহল।

(iii) তরল পদার্থে গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ : জলে অ্যামোনিয়া, বা ক্লোরিন।

(iv) কঠিন পদার্থে কঠিন পদার্থের দ্রবণ : কাঁসা (bell metal) [কপার (তামা) ও টিন], পিতল (brass) [কপার (তামা) ও জিংক (দস্তা)] ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতু-সংকর (alloy)।

(v) কঠিন পদার্থে গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ : প্যালাডিয়াম ধাতুতে অন্তঃধৃত (occluded) হাইড্রোজেন গ্যাস।

(vi) গ্যাসীয় পদার্থে গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ : যে-কোন দুইটি, বা ততোধিক গ্যাসের মিশ্রণ ; যেমন বায়ু।

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ
(Saturated and Unsaturated Solution)

সংজ্ঞা : কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকিলে সেই দ্রবণকে বলে সম্পৃক্ত দ্রবণ (saturated solution)। পক্ষান্তরে, **নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বোচ্চ পরিমাণ অপেক্ষা কম দ্রাব থাকিলে, অর্থাৎ দ্রবণে আরও দ্রাব দ্রবীভূত করা সম্ভব হইলে সেই দ্রবণকে বলা হয় অসম্পৃক্ত দ্রবণ** (unsaturated solution)।

একটি বীকারে কিছু পরিমাণ জল লইয়া তাহাতে অল্প-অল্প করিয়া সাধারণ খাদ্য-লবণ মিশাইয়া নাড়িলে প্রথম দিকে দেখা যাইবে, লবণের চিহ্ন মাত্র নাই, সম্যক লবণই দ্রবীভূত হইয়াছে। ক্রমে এক সময় দেখা যাইবে, লবণ আর দ্রবীভূত হইতেছে না, পাত্রের নীচে থিতাইয়া পড়িতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ পরিমাণ জলে স্থানীয় সাধারণ উষ্ণতায় সর্বোচ্চ পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ জল লবণে সম্পৃক্ত হইয়াছে। ইহাই হইল ঐ উষ্ণতায় লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণ এবং এই অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বে উহাকে বলা হয় অসম্পৃক্ত দ্রবণ। কোন একটি দ্রবণ কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সম্পৃক্ত হইলেও উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে, অথবা

উহাতে আরও দ্রাবক যোগ করা হইলে তাহাই আবার অসম্পৃক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে আরও দ্রাব দ্রবীভূত করা যাইতে পারে।

কোন দ্রবণ সম্পৃক্ত না অসম্পৃক্ত, তাহা বুঝিতে হইলে উহাতে আরও সামান্য কিছু পরিমাণ দ্রাব যোগ করিতে হয়। যদি এই অতিরিক্ত দ্রাব দ্রবীভূত হইয়া যায় (অর্থাৎ, দ্রবণের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়), তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দ্রবণটি অসম্পৃক্ত ছিল; কিন্তু যদি এই অতিরিক্ত দ্রাব দ্রবীভূত না হইয়া অপরিবর্তিত অবস্থায় নীচে থিতাইয়া পড়ে (অর্থাৎ, দ্রবণের গাঢ়ত্ব অপরিবর্তিত থাকে), তাহা হইলে বুঝা যায়, আলোচ্য দ্রবণটি সম্পৃক্ত।

দ্রাব্যতা (Solubility)

একই দ্রাবকে বিভিন্ন দ্রাব সম-মাত্রায় দ্রবীভূত হয় না। সম-পরিমাণ জলে একই উষ্ণতায় চিনি, লবণ, বা সোরা বিভিন্ন পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কোন নির্দিষ্ট দ্রাবকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণ-শক্তি, বা দ্রাব্যতার এই বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য একটি পরিমাণগত হিসাব নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

সংজ্ঞা : **কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় প্রতি 100 গ্র্যাম দ্রাবকে যত গ্র্যাম দ্রাব দ্রবীভূত হইলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হয়, অর্থাৎ সর্বাধিক যত গ্র্যাম পরিমাণ দ্রাব প্রতি 100 গ্র্যাম দ্রাবকে দ্রবীভূত হইতে পারে, সেই সংখ্যাটিকে ঐ উষ্ণতায় ঐ নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রাব পদার্থটির দ্রাব্যতা** (solubility) **বলা হয়।**

'30°C উষ্ণতায় জলে খাদ্য-লবণের দ্রাব্যতা 36' বলিলে বুঝা যায়, এই উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম জলে সর্বাধিক 36 গ্র্যাম পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হইতে পারে; অর্থাৎ 30°C উষ্ণতায় খাদ্য-লবণের সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রতি 100 গ্র্যাম জলে 36 গ্র্যাম লবণ দ্রবীভূত করা প্রয়োজন হইবে।

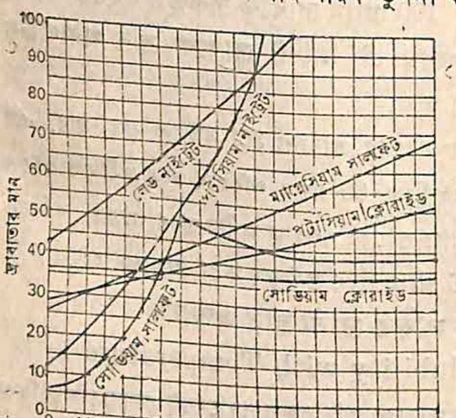
তাপমাত্রার সহিত দ্রাব্যতার সম্পর্ক
(Relation of Solubility with Temperature)

সাধারণতঃ উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সকল পদার্থেরই দ্রাব্যতা অল্পাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে তাহার উষ্ণতা অনুযায়ী কম-বেশী পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকিতে পারে; উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে অধিকতর পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হয়, উষ্ণতা হ্রাস করিলে দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। পরীক্ষায় দেখা যায়, 50°C উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম জলকে সম্পৃক্ত করিতে 85 গ্র্যাম সোরা দ্রবীভূত করা প্রয়োজন। এই সম্পৃক্ত দ্রবণটিকে ঠাণ্ডা করিয়া 45°C উষ্ণতায়

আনিলে এই উষ্ণতায় সর্বাধিক মাত্র 65 গ্র্যাম সোরা ঐ পরিমাণ জলে দ্রবীভূত থাকিতে পারে ; স্থতরাং 65 গ্র্যাম সোরা দ্রবীভূত থাকিয়া অতিরিক্ত 20 গ্র্যাম পরিমাণ দ্রাব দ্রবণ হইতে পৃথক হইয়া যায় ; কিন্তু দ্রবণটি সম্পৃক্তই থাকে। উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে তরল দ্রাবকে সাধারণতঃ সকল কঠিন দ্রাব পদার্থের দ্রাব্যতার এইরূপ পরিবর্তন ঘটে।

তরল দ্রাবকে গ্যাসীয় দ্রাব পদার্থের দ্রবণের ক্ষেত্রে অবশ্য ইহার বিপরীত পরিবর্তন ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিলে তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা হ্রাস পায় এবং উষ্ণতা হ্রাস করিলে দ্রাব্যতার বৃদ্ধি ঘটে।

তাপমাত্রার পরিবর্তনের সহিত কোন দ্রাব পদার্থের দ্রাব্যতার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাহা দ্রাব্যতা-লেখ রেখা-চিত্র হইতে সহজেই জানা যায়। বিভিন্ন উষ্ণতায় কোন একটি দ্রাবকে কোন নির্দিষ্ট দ্রাব পদার্থের দ্রাব্যতার বিভিন্ন মান নিরূপণ করিয়া গ্রাফ-কাগজে উষ্ণতা ও দ্রাব্যতার বিভিন্ন স্থচক-সংখ্যাকে স্থানাঙ্ক ধরিয়া রেখাঙ্কন করিলে যে রেখা পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় ঐ দ্রাবকে দ্রাব পদার্থটির **দ্রাব্যতা-লেখ** (solubility curve)। এইরূপ দ্রাব্যতা-লেখ হইতে যে-কোন উষ্ণতায় নির্দিষ্ট দ্রাব পদার্থটির দ্রাব্যতা সহজেই জানা যায়। বিভিন্ন পদার্থের এইরূপ দ্রাব্যতা-লেখ অঙ্কন করিলে ইহা হইতে পদার্থগুলির দ্রাবতার পারস্পরিক তুলনা করাও সম্ভব হয়।



বিভিন্ন দ্রাব-পদার্থের দ্রাব্যতা-লেখ

প্রদত্ত চিত্রে জল-দ্রাবকে কয়েকটি বিভিন্ন লবণের দ্রাব্যতা-লেখ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রাব্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ; সোডিয়াম ক্লোরাইড, বা খাদ্য-লবণের দ্রাব্যতা অতি সামান্য বাড়ে। আবার, সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে 35°C উষ্ণতা পর্যন্ত দ্রাব্যতা যথেষ্ট দ্রুত বাড়িতে থাকে, তারপর ক্রমশঃ হ্রাস পায় ; সাধারণ নিয়মের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসায়নিক সমীকরণ
(Chemical Equation)

পাঠ্যসূচী ঃ প্রতীক, সংকেত, রাসায়নিক সমীকরণ ; রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য ও প্রকাশ-পদ্ধতি।

রসায়নের আলোচনা-কালে প্রায়শঃই দুই, বা ততোধিক পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হয়। প্রতি বারই তাহাদের সম্পূর্ণ নাম লেখা, বা বলা বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে ; কাজেই সময় ও শ্রম লাঘব করিবার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এক-একটি সংক্ষিপ্ত প্রতীক ও তাহাদের সংযোগে গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের এক-একটি সংকেত স্থির করিয়াছেন। কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিষয়-বস্তু এইভাবে অপেক্ষাকৃত সহজে ও সংক্ষেপে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

প্রতীক (Symbol)

কোন মৌলিক পদার্থের পূর্ণ নামের সংক্ষেপিত রূপকে বলা হয় উহার প্রতীক (symbol)। 1813 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস (Berzelius) মৌলের প্রতীক লিখিবার একটি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইহাতে যে-কোন মৌলের সাধারণতঃ ইংরেজী নামের প্রথম অক্ষরটি উহার প্রতীক হিসাবে ধরিয়া মৌলটিকে চিহ্নিত করা হয়। যে-সকল ক্ষেত্রে একাধিক মৌলের আদ্যক্ষর একই, সেই সকল ক্ষেত্রে কোন একটি মৌলকে আদ্যক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া অন্য মৌলগুলির ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষরের সহিত সুবিধামত আরও একটি অক্ষর যুক্ত করা হয়। নিম্নে কয়েকটি মৌলের প্রতীক প্রদত্ত হইল :

হাইড্রোজেন (Hydrogen), H
অক্সিজেন (Oxygen), O
কার্বন (Carbon), C
ক্লোরিন (Chlorine), Cl

নাইট্রোজেন (Nitrogen), N
ক্যালসিয়াম (Calcium), Ca
বোরন (Boron), B
ব্রোমিন (Bromine), Br ইত্যাদি

আবার, অনেক মৌলিক পদার্থের প্রতীক উহাদের ইংরেজী নাম হইতে না

লইয়া ল্যাটিন নামের সাধারণতঃ এক, বা একাধিক আত্তক্ষর দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে ; যেমন—

মৌল	ল্যাটিন নাম	প্রতীক
আয়রন (Iron)	Ferrum	Fe
পটাশিয়াম (Potassium)	Kalium	K
সোডিয়াম (Sodium)	Natrium	Na ইত্যাদি

প্রতীকের তাৎপর্য ঃ (i) কোন মৌলিক পদার্থের প্রতীক দ্বারা তাহার এক-একটি পরমাণু বুঝায় ; একাধিক সংখ্যক পরমাণু বুঝাইতে হইলে মৌলের প্রতীকের বাম পার্শ্বে প্রয়োজনায় সূচক-সংখ্যা বসাইতে হয় ; যেমন,—H, বা 2H, লিখিলে হাইড্রোজেনের একটি, বা দুইটি পরমাণু বুঝায়।

(ii) কোন মৌলের প্রতীক হইতে তাহার একটি পরিমাণগত, বা মাত্রিক (quantitative) তাৎপর্যও সূচিত হয়। যে-কোন মৌলের প্রতীকটি গ্র্যাম-এককে উহার পারমাণবিক ওজন (ইহাকে বলা হয় মৌলটির গ্র্যাম-পরমাণু) পরিমাণ পদার্থ বুঝায় ; যেমন, O লিখিলে এক গ্র্যাম-পরমাণু, অর্থাৎ 16 (পারমাণবিক ওজন) গ্র্যাম পরিমাণ অক্সিজেন বুঝায়।

সংকেত (Formula)

মৌলিক, বা যৌগিক যে-কোন পদার্থের অণুকে যে-সকল প্রতীক-সমষ্টির সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়, তাহাকে বলে পদার্থের আণবিক সংকেত (molecular formula)।

যে-কোন যৌগের অণু একাধিক মৌলের কিছু সংখ্যক পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কোন যৌগের সংগঠক মৌলগুলির প্রতীকসমূহ পর-পর লিখিয়া তাহাদের প্রত্যেকটির পরমাণু-সংখ্যা নিজ-নিজ প্রতীকের দক্ষিণ পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নীচে লিখিলেই যৌগটির আণবিক সংকেত প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দুইটির রাসায়নিক সংযোগে গঠিত জলের এক-একটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু ও একটি অক্সিজেন-পরমাণু রহিয়াছে ; সুতরাং, জলের আণবিক সংকেত লিখিতে হয় H_2O। যে-কোন মৌলের অণু যেহেতু উহারই এক, বা একাধিক পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, অতএব মৌলের প্রতীকের দক্ষিন পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নীচে নির্দিষ্ট সূচক-সংখ্যা বসাইলে মৌলটির আণবিক সংকেত প্রকাশিত

হয়; যেমন, ক্লোরিন-অণুর সংকেত Cl_2, অক্সিজেনের O_2, ফসফরাসের P_4 ইত্যাদি। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর অণু এক-পরমাণুক (mono-atomic); এই সকল ক্ষেত্রে মৌলের প্রতীকটি উহার পরমাণু, বা অণু উভয়ই নির্দেশ করে, যেমন—Na, K, Fe ইত্যাদি।

কয়েকটি সাধারণ যৌগের আণবিক সংকেত নিম্নে প্রদত্ত হইল:

নাইট্রিক অ্যাসিড : HNO_3 সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ) : NaCl

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড : HCl অ্যামোনিয়া : NH_3

আণবিক সংকেতের তাৎপর্য : (i) যে-কোন পদার্থের আণবিক সংকেত দ্বারা পদার্থটির একটি মাত্র অণু বুঝায়। একাধিক সংখ্যক অণু বুঝাইতে হইলে আণবিক সংকেতের বাম দিকে নির্দিষ্ট সূচক-সংখ্যাটি বসাইতে হয়; যেমন, $2H_2O$ লিখিলে জলের 2-টি অণু বুঝায়।

(ii) কোন পদার্থের আণবিক সংকেত দ্বারা উহার গ্র্যাম-অণু, অর্থাৎ গ্র্যাম-এককে প্রকাশিত আণবিক ওজন-পরিমাণ বুঝায়; যেমন, H_2SO_4 লিখিলে সালফিউরিক অ্যাসিডের এক গ্র্যাম-অণু পরিমাণ, অর্থাৎ $1 \times (2 \times 1 + 32 + 4 \times 16) = 98$ গ্র্যাম বুঝায়।

যোজ্যতা (Valency) :

কোন মৌলের রাসায়নিক সংযোগের ক্ষমতাকে বলা হয় উহার যোজ্যতা (valency), এবং মৌলটির একটি পরমাণু যে-কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া অণু গঠন করে, তাহাই হইল উহার যোজ্যতার মান।

পরীক্ষায় দেখা যায়, ক্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন মৌলের এক-একটি পরমাণু যথাক্রমে একটি, দুইটি, তিনটি ও চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), জল (H_2O), অ্যামোনিয়া (NH_3) ও মিথেন (CH_4) যৌগের অণু গঠন করে; অতএব, ক্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বনের যোজ্যতার মান যথাক্রমে 1, 2, 3 ও 4। প্রত্যেক মৌলেরই এইরূপ কোন নির্দিষ্ট যোজ্যতা আছে; অবশ্য কোন-কোন মৌলের যোজ্যতার মান বিভিন্ন যৌগে বিভিন্ন হইতেও পারে। যাহা হউক, নিম্নে কয়েকটি সাধারণ মৌলের যোজ্যতা প্রদত্ত হইল:

H : 1; O : 2; N : 1, 2, 3, 4, 5; Fe : 2 (ফেরাস), 3 (ফেরিক)।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একাধিক বিভিন্ন মৌলের কয়েকটি পরমাণু

পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জোটবদ্ধ আকারে একক পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে; এইরূপ পরমাণু-জোটের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, উহা যৌগের অংশ মাত্র, এবং অধিকাংশ সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে উহা সমষ্টিগতভাবে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, অর্থাৎ ঐ জোটের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। এইরূপ পরমাণু-জোটকে বলা হয় **মূলক** (radical); যথা, হাইড্রক্সিল (OH), অ্যামোনিয়াম (NH_4), নাইট্রেট (NO_3), সালফেট (SO_4), কার্বোনেট (CO_3), বাই-কার্বোনেট (HCO_3) ইত্যাদি। মৌল-পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক মূলকেরও কোন নির্দিষ্ট যোজ্যতা থাকে; যথা, OH : 1; NH_4 : 1; NO_3 : 1; SO_4 : 2; CO_3 : 2; HCO_3 : 1 ইত্যাদি।

যৌগের সংকেত লিখিবার নিয়ম: দুইটি মৌল, বা মূলক A ও B-এর যোগ্যতার মান যদি যথাক্রমে x ও y হয়, তাহা হইলে উহাদের পারস্পরিক সংযোগে গঠিত যৌগের আণবিক সংকেত হইবে A_yB_x; অর্থাৎ, কোন যৌগের আণবিক সংকেত লিখিতে হইলে উহার সংগঠক মৌল, বা মূলক-সমূহের প্রতীকগুলি পর-পর পাশাপাশি লিখিয়া একটির যোজ্যতার মান অপরটির প্রতীকের অপেক্ষাকৃত নীচে দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইতে হয়। নিম্নের উদাহরণগুলি হইতে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে।

যৌগের নাম	সংগঠক মৌল, বা মূলকের যোজ্যতা	যৌগের সংকেত
জল	H : 1 ; O : 2	H_2O
কার্বন ডাইঅক্সাইড	C : 4 ; O : 2	CO_2
ক্যালসিয়াম কার্বোনেট	Ca : 2 ; CO_3 : 2	$CaCO_3$
ফেরিক ক্লোরাইড	Fe : 3 (ফেরিক) ; Cl : 1	$FeCl_3$

রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical Equation)

কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও উৎপন্ন পদার্থগুলিকে প্রতীক ও সংকেতের সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার পদ্ধতিকে বলা হয় রাসায়নিক সমীকরণ (chemical equation)। যে-সকল পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাহাদের যোগ চিহ্ন (+) দিয়া বাম দিকে এবং বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে-সকল পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদেরও

যোগ চিহ্ন (+) দিয়া ডান দিকে প্রতীক ও সংকেতের সাহায্যে লেখা হয় এবং ডান ও বাম উভয় পক্ষকে সমান চিহ্ন (=) দ্বারা সংযুক্ত করিতে হয়।

রাসায়নিক সমীকরণের সঠিক প্রকাশপদ্ধতি ঃ
(Balancing Chemical Equations)

যে-কোন রাসায়নিক সমীকরণকে সঠিকভাবে প্রকাশ করিতে হইলে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নিয়ম মানিয়া চলা দরকার ; যেমন—(i) বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলি প্রত্যেকটির আণবিক সংকেত লিখিতে হইবে। (ii) সমীকরণের ডান ও বাম উভয় দিকে প্রত্যেক মৌলের মোট পরমাণু-সংখ্যা সর্বদা সমান হইতে হইবে। কোন মৌলের পরমাণু-সংখ্যা উভয় পক্ষে সমান করিবার জন্য যে-কোন পার্শ্বে প্রয়োজনানুযায়ী অণু-সংখ্যা লিখিতে হয়।

একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে উপরোক্ত নিয়মগুলির উপযোগিতা সহজেই বুঝা যাইবে। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মৌল দুইটির রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া (NH_3) যৌগটি উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটির সমীকরণ যদি লেখা হয়ঃ $N + H = NH_3$, তাহা হইলে সমীকরণটি যথাযথ প্রকাশিত হইবে না, ভুল হইবে; কারণ, উপরোক্ত প্রথম নিয়মানুযায়ী বিক্রিয়ক মৌল দুইটির আণবিক সংকেত লেখা হয় নাই। আবার, এই নিয়মানুযায়ী যদি লেখা হয়: $N_2 + H_2 = NH_3$, তাহা হইলেও ভুল হইবে ; কারণ, সমীকরণটির ডান দিকে রহিয়াছে একটি নাইট্রোজেন ও তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু, অথচ বাম দিকে রহিয়াছে এই মৌলগুলির প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া পরমাণু ; উভয় পক্ষের পরমাণু-সংখ্যা অ-সমান। এইজন্য দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে নির্ভুল সমীকরণ লিখিতে হইবে: $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$। সরল ধরনের কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

(i) $NaOH + HCl = NaCl + H_2O$

(ii) $2K + 2H_2O = 2KOH + H_2$ ইত্যাদি।

রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য ঃ
(Significance of Chemical Equations)

কোন রাসায়নিক সমীকরণ হইতে বিক্রিয়া সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যাদি সঠিকভাবে জানা যাইতে পারে :

(i) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও উৎপন্ন পদার্থগুলির **রাসায়নিক পরিচয়** বিক্রিয়াটির সমীকরণ হইতে সহজেই জানা যায়। যেমন: $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দুইটির পারস্পরিক রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়।

(ii) কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ হইতে বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির অণুর **সংখ্যানুপাত** বুঝা যায়। যেমন: $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, দুইটি হাইড্রোজেন-অণু ও একটি অক্সিজেন-অণুর সংযোগে জলের দুইটি অণু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(iii) রাসায়নিক সমীকরণ হইতে বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির **ওজন-পরিমাণের অনুপাত** জানা যাইতে পারে। যেমন: $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, 2 গ্র্যাম-অণু [অর্থাৎ $2 \times (2 \times 1) = 4$ গ্র্যাম] হাইড্রোজেন 1 গ্র্যাম-অণু [অর্থাৎ $(2 \times 16) = 32$ গ্র্যাম] অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া 2 গ্র্যাম-অণু [অর্থাৎ $2 \times (2 \times 1 + 16) = 36$ গ্র্যাম] জল উৎপন্ন করে।

(iv) কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও উৎপন্ন পদার্থগুলির সব কয়টিই যদি গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বিক্রিয়াটির সমীকরণ হইতে বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির **আয়তনের অনুপাত** জানা যায়; কিন্তু বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির মধ্যে কোন এক, বা একাধিক পদার্থ যদি কঠিন, বা তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে ঐ কঠিন, বা তরল পদার্থগুলির আয়তন সম্বন্ধে সমীকরণ হইতে কিছুই বুঝা যায় না। যেমন: $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, 2 আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস 1 আয়তন অক্সিজেন গ্যাসের সহিত বিক্রিয়া করিয়া 2 আয়তন **জলীয় বাষ্প** (তরল জল নহে) উৎপন্ন করিবে। উপরোক্ত সমীকরণটি হইতে কেবলমাত্র ইহাই বুঝা যায় যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দুইটি আয়তন-ভিত্তিক 2 : 1 অনুপাতে পরস্পর মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। উৎপন্ন জল যদি তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উহার আয়তন সমীকরণ হইতে জানা যায় না; কিন্তু বাষ্পীয় অবস্থায় থাকিলে তাহা অবশ্যই 2 আয়তন হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তড়িদ্‌বিশ্লেষণ
(Electrolysis)

পাঠ্যসূচী : তড়িদ্‌বিশ্লেষণ : তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য পদার্থ; জলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ; ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (তড়িৎ-প্রলেপন)।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সকল পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ চলাচল করিতে পারে না। কপার, বা অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ সহজেই প্রবাহিত হয়; অথচ কাঠ, বা কাঁচের দণ্ড তড়িৎ-পরিবহনে অক্ষম। আবার, সাধারণ খাদ্য-লবণ, বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া অনায়াসে তড়িৎ চলাচল করে, কিন্তু চিনির জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া কোনক্রমেই তড়িৎ চালনা করা যায় না। এইভাবে তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা অনুযায়ী যাবতীয় পদার্থকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়;—(i) **তড়িৎ-পরিবাহী** (conductor) ও (ii) **তড়িৎ-অপরিবাহী** (non-conductor, or insulator)। কপার, অ্যালুমিনিয়াম, গোল্ড, সিলভার, আয়রন প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় ধাতু, এবং উত্তাপে বিগলিত, বা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় বিভিন্ন অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ জাতীয় পদার্থ তড়িদ্‌পরিবাহী। পক্ষান্তরে, কাঠ, কাঁচ, মাটি, প্লাস্টিক ইত্যাদি পদার্থ তড়িৎ-অপরিবাহী।

তড়িদ্‌বিশ্লেষণ (Electrolysis):

তড়িৎ-পরিবহনের ফলাফলের বিচারে তড়িৎ-পরিবাহী পদাসমূহকে আবার দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

(ক) কোন-কোন পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে পদার্থগুলির কোনরূপ স্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, অস্থায়ী কিছু ভৌত পরিবর্তন ঘটিতে পারে মাত্র। সাধারণতঃ বিভিন্ন ধাতুসমূহ এই শ্রেণীতে পড়ে; ইহাদিগকে বলে **ধাতব পরিবাহী** (metallic conductor)।

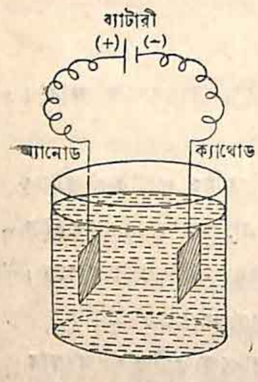
(খ) পক্ষান্তরে, উত্তাপে বিগলিত, বা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় কোন-কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ চালনা করিবার ফলে

পদার্থগুলির রাসায়নিক বিয়োজন ঘটিয়া সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম-বিশিষ্ট একাধিক নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ পরিবাহী পদার্থকে বলা হয় **তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য পদার্থ** (electrolyte) এবং তড়িতের সাহায্যে এইরূপ বিয়োজন-ক্রিয়াকে বলা হয় **তড়িদ্‌বিশ্লেষণ** (electrolysis)। বিভিন্ন অ্যাসিড, ক্ষার ও রাসায়নিক লবণ তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য পদার্থের পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও কঠিন অবস্থায় এইরূপ পদার্থসমূহ তড়িৎ-পরিবহনে সক্ষম হয় না ; কেবলমাত্র উত্তাপে বিগলিত, বা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায়ই উহারা তড়িৎ-পরিবাহী হয় এবং তড়িতের প্রভাবে উহাদের রাসায়নিক বিয়োজন ঘটিয়া বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। চিনি, অ্যালকোহল, ইথার ইত্যাদি যে-সকল রাসায়নিক পদার্থ অনুরূপ অবস্থায় তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম, অর্থাৎ যাহাদের ক্ষেত্রে তড়িদ্‌বিশ্লেষণ সম্ভব নহে, তাহাদের বলা হয় **তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য পদার্থ** (non-electrolyte)।

সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), অর্থাৎ সাধারণ খাদ্য-লবণ তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য পদার্থ। কিন্তু বিশুদ্ধ স্ফটিকাকার লবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হয় না ; যথোপযুক্ত উত্তাপে লবণকে বিগলিত করিলে, অথবা উহাকে জলে দ্রবীভূত করিলে সেই তরল পদার্থ, বা লবণের জলীয় দ্রবণের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে তড়িৎ-প্রবাহ চলে এবং তাহার ফলে খাদ্য-লবণের রাসায়নিক বিয়োজন ঘটিয়া উহার সংগঠক মৌল উপাদানদ্বয় সোডিয়াম ও ক্লোরিন বিমুক্ত হয়।

তড়িদ্‌বিশ্লেষণের পদ্ধতি (Method of Electrolysis) :

কোন পদার্থের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইলে সাধারণতঃ উহার জলীয় দ্রবণ একটি পাত্রে রাখিয়া দুইটি ধাতব (সাধারণতঃ তামা, বা প্ল্যাটিনাম) তারের এক-এক প্রান্তে সংলগ্ন দুইখানা ধাতব চাকৃতি দ্রবণটির মধ্যে পরস্পর কিছু ব্যবধানে নিমজ্জিত রাখা হয়। ধাতব তার দুইটির মুক্ত প্রান্তদ্বয় একটি তড়িৎ-কোষ, বা ব্যাটারীর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ-প্রান্তের সহিত যুক্ত করা হয়। দ্রবণে নিমজ্জিত ধাতব চাকৃতি দুইটিকে বলা হয় **তড়িদ্‌দ্বার** (electrode) ; যে তড়িদ্‌দ্বারটি ব্যাটারীর



পদার্থের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ পদ্ধতি

ধনাত্মক মেরুর সহিত যুক্ত থাকে তাহাকে বলা হয় **ধন-তড়িদ্দ্বার**, বা **অ্যানোড** (anode), এবং ঋণাত্মক মেরুর সহিত সংযুক্ত তড়িদ্দ্বারটিকে বলা হয় **ঋণ-তড়িদ্দ্বার,** বা **ক্যাথোড** (cathode)। তড়িদ্দ্বার দুইটির মাধ্যমে দ্রবণের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, তড়িতের প্রভাবে দ্রবীভূত তড়িদ্বিশ্লেষ্য পদার্থটির রাসায়নিক বিয়োজন, বা বিশ্লেষণ-ক্রিয়া ঘটে, যাহার ফলে তড়িদ্দ্বার দুইটির নিকটে দ্রবণের মধ্যে সূক্ষ্ম বুদবুদ্ সহ সাধারণতঃ কিছু চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়।

তড়িদ্বিশ্লেষণের আয়নীয় মতবাদ ঃ

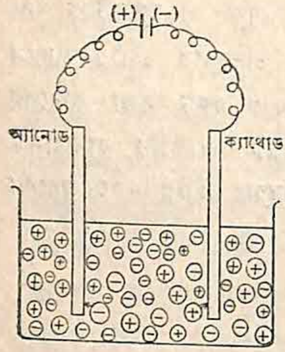
(Ionic Theory of Electrolysis)

তড়িদ্বিশ্লেষণ-ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে 1887 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস (Arrhenius) **তড়িদ্বিয়োজন তত্ত্ব** (theory of electrolytic dissociation) প্রবর্তন করেন। এই তত্ত্বটি বুঝিতে হইলে পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

যে-কোন পরমাণু মূলতঃ তিন প্রকার অতি সূক্ষ্ম কণিকার সমবায়ে গঠিত; ইহাদের মধ্যে ইলেকট্রন (electron) **ঋণাত্মক** তড়িৎ-আধানযুক্ত, প্রোটন (proton) **ধনাত্মক** তড়িৎ-আধানবিশিষ্ট এবং নিউট্রন (neutron) **তড়িৎ-বিহীন**। পরমাণু যেহেতু সামগ্রিকভাবে নিস্তড়িৎ, অতএব যে-কোন পরমাণুতে স্বভাবতঃই ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকা থাকে সম-সংখ্যক। যদি কোন পরমাণু, বা পরমাণু-জোটে কোন কারণে ইলেকট্রনের স্বল্পতা, বা আধিক্য ঘটে তাহা হইলে উহা যথাক্রমে ধনাত্মক, বা ঋণাত্মক তড়িৎ-আধানবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ তড়িতাহিত পরমাণু, বা পরমাণু-জোটকে বলা হয় **আয়ন** (ion)। আয়ন স্বভাবতঃই দুই প্রকার,—ধনাত্মক আয়ন, বা **ক্যাটায়ন** (cation) ও ঋণাত্মক আয়ন, বা **অ্যানায়ন** (anion)।

তড়িদ্বিয়োজন তত্ত্বের মূল তথ্য হইল, যে-কোন তড়িদ্বিশ্লেষ্য পদার্থের অণু বিপরীত-ধর্মী তড়িৎ-আধানবিশিষ্ট একাধিক আয়নের সমবায়ে গঠিত। এইরূপ পদার্থকে জলে দ্রবীভূত, অথবা উত্তাপে বিগলিত করিলে উহার সংগঠক আয়নগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ হ্রাস পাইয়া উহারা পরস্পর হইতে যথেষ্ট দূরে সরিয়া যায় এবং দ্রবণ, বা তরলের মধ্যে অগণিত ক্যাটায়ন ও

অ্যানায়ন পরস্পরের প্রায় প্রভাব-মুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে চলাচল করে।



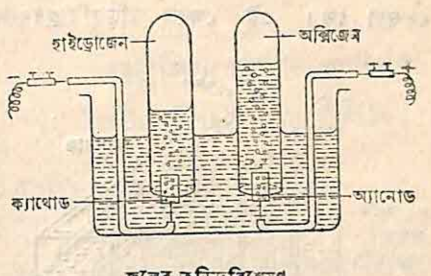
তড়িদ্‌বিশ্লেষণের আয়নীয় ব্যাখ্যা

বিগলিত, বা দ্রবীভূত অবস্থায় যে-কোন তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর এইরূপ বিপরীত-ধর্মী দুই প্রকার আয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লিষ্ট হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় **তড়িদ্‌বিয়োজন** (electrolytic dissociation)। বিপরীত-ধর্মী তড়িৎ-আধানের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ-হেতু দ্রবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনাকালে ধনাত্মক ক্যাটায়নগুলি ঋণাত্মক ক্যাথোডের দিকে ও ঋণাত্মক অ্যানায়নগুলি ধনাত্মক অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয়। অ্যানয়নগুলি তড়িদ্‌দ্বারের সংস্পর্শে আসিয়া প্রয়োজনানুযায়ী তাহা হইতে এক, বা একাধিক সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ, অথবা বর্জন করিয়া নিস্তড়িৎ পরমাণু, বা পরমাণু-জোটে পরিণত হয়; অতঃপর এই সকল পরমাণু, বা পরমাণু-জোটের সমবায়ে অণুর উৎপত্তি ঘটে। এইভাবে তড়িদ্‌বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য পদার্থের বিপরীত তড়িদ্বাহী দুইটি উপাদানিক অংশ দুই বিপরীত তড়িদ্‌দ্বারে গিয়া সঞ্চিত হয়। ইহাই হইল তড়িদ্‌বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মোটামুটি রাসায়নিক তথ্য।

জলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ (Electrolysis of Water):

বিশুদ্ধ জল বিশেষ তড়িদ্‌পরিবাহী নহে। উহার অণু-সংখ্যার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাইড্রোজেন ক্যাটায়ন (H^+) ও হাইড্রক্সিল অ্যানায়নে (OH^-) বিয়োজিত হয়: $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$; এই জন্যই জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ অতি স্বল্প মাত্রায় চলাচল করিয়া থাকে। জলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণের জন্য উহার সহিত সামান্য কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক, বা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইতে হয়; যাহার ফলে জলের তড়িৎ-পরিবাহিতা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপ সামান্য অ্যাসিড মিশ্রিত জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে হাইড্রোজেন ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডের প্রতি ধাবিত হয় এবং ক্যাথোড-গাত্রে পৌঁছিয়া উহা হইতে ইলেক্‌ট্রন গ্রহণ করিয়া প্রথমে নিস্তড়িৎ হাইড্রোজেন-পরমাণু ও পরে হাইড্রোজেন-অণুতে পরিণত হয়;

অর্থাৎ ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উদ্ভূত হইতে থাকে : $H^+ + e$ (ইলেক্‌ট্রন) = H ; $H + H = H_2 \uparrow$। অপর-পক্ষে, হাইড্রক্সিল অ্যানায়নগুলি অ্যানোডের প্রতি অগ্রসর হয় এবং অ্যানোড-গাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া ইলেক্‌ট্রন বর্জন করিয়া নিস্তড়িৎ হাইড্রক্সিল (OH) পরমাণু-জোটে পরিণত হয়।



জলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ

অতঃপর উহাদের পারস্পরিক সংযোগে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন হইয়া অ্যানোডে কেবল অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হইতে থাকে : $OH^- - e$ (ইলেক্‌ট্রন) = OH ; $OH + OH = H_2O + O$; $O + O = O_2 \uparrow$।

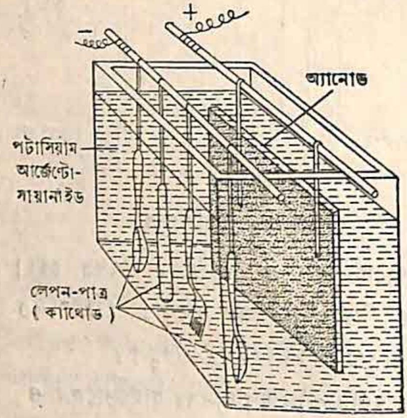
তড়িদ্‌বিশ্লেষণের ফলে জল এইভাবে উহার মৌল উপাদানদ্বয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা যায়, উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন অক্সিজেনের আয়তনের দুই গুণ হইয়া থাকে।

তড়িৎ-প্রলেপন (Electroplating) :

তড়িদ্‌বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক প্রয়োগ হইল তড়িৎপ্রলেপন-ক্রিয়া (electroplating)। তড়িদ্‌বিশ্লেষণের সাহায্যে কোন একটি ধাতব (সাধারণতঃ লোহা, বা পিতল) জিনিসের উপরে অন্য কোন ধাতুর একটি সূক্ষ্ম প্রলেপ, বা আস্তরণ গঠনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় তড়িৎ-প্রলেপন। যে জিনিসের উপর তড়িৎপ্রলেপন করিতে হইবে তাহাকে কোন উপযুক্ত লবণের জলীয় দ্রবণে নিমজ্জিত করা হয়, এবং যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হইবে সেই ধাতুর একটি পাত্‌কে দ্রবণে নিমজ্জিত রাখিয়া উহাকে একটি ব্যাটারীর ধনাত্মক তড়িদ্‌দ্বারের সহিত এবং জিনিসটিকে ঋণাত্মক তড়িদ্‌দ্বারের সহিত সংযুক্ত করা হয় ; অর্থাৎ **লেপন-পাত্রটিকে ক্যাথোডরূপে এবং ধাতুখণ্ডটিকে অ্যানোডরূপে ব্যবহার করা হয়**। দ্রবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনাকালে দ্রবীভূত লবণের তড়িদ্‌বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহৃত জিনিসটির উপরে অ্যানোড হিসাবে ব্যবহৃত ধাতুটির একটি সূক্ষ্ম প্রলেপ গঠিত হয় এবং অ্যানোডটি ধীরে-ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

লোহার মরিচা ধরা নিবারণের উদ্দেশ্যে লৌহ-নির্মিত জিনিসের উপর অনেক

সময় নিকেল ধাতুর একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ, নিকেল-প্রলেপন (nickel plating), দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে তড়িদ্‌বিশ্লেষণ-গাহের (electrolytic bath) মধ্যে সামান্য বোরিক অ্যাসিড সহ নিকেল-অ্যামোনিয়াম সালফেট লবণের জলীয়দ্রবণ লওয়া হয় এবং একটি নিকেল পাত্‌কে অ্যানোডরূপে ও লৌহ-নির্মিত দ্রব্যটিকে ক্যাথোড-রূপে ব্যবহার করা হয়। তড়িদ্‌-বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোড হইতে নিকেল ধাতু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহৃত জিনিসটির উপরে নিকেলের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ, বা প্রলেপ গঠিত হয়। নিকেল-প্রলেপনের ন্যায় সিল্‌ভার-প্রলেপনের ক্ষেত্রে পটাশিয়াম আর্জেণ্টোসায়ানাইডের জলীয় দ্রবণের তড়িদ্‌বিশ্লেষণ করা হয়। অনেক ধাতব দ্রব্যের চাক্‌চিক্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহাদের উপরে মূলতঃ অনুরূপ পদ্ধতিতে অনেক সময় ক্রোমিয়াম ধাতুর প্রলেপনও করা হইয়া থাকে।



তড়িদ্‌প্রলেপন পদ্ধতির যান্ত্রিক কৌশল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ

(Acids, Bases and Salts)

পাঠ্যসূচী : অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা ; প্রশমন-ক্রিয়া।

রাসায়নিক প্রকৃতি ও ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য অনুসারে যাবতীয় যৌগকে প্রধানতঃ অ্যাসিড (acid), ক্ষারক (base) ও লবণ (salt), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের সাধারণ পরিচিতি নিম্নে আলোচিত হইল।

অ্যাসিড (Acid)

সালফার, ফসফরাস, কার্বন ইত্যাদি কোন-কোন মৌল মুক্ত বায়ুতে, বা অক্সিজেনের মধ্যে পোড়াইলে যে সকল গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহাদের জলে দ্রবীভূত করিয়া প্রাপ্ত দ্রবণের দুইটি বিশেষ ধর্ম লক্ষ্য করা যায়,—উহারা অম্ল-স্বাদবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং নীল লিট্‌মাসকে (litmus) লাল করে; ইহাদের বলা হয় অ্যাসিড। হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড এইরূপ অ্যাসিড-ধর্মী পদার্থের অতি সুপরিচিত উদাহরণ।

রাসায়নিক গঠনের বিচারে দেখা যায়, অ্যাসিড মাত্রেরই অণুতে এক, বা একাধিক সংখ্যক হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে, যাহারা ধাতু, বা ক্ষারকের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সম্পূর্ণ, বা আংশিকভাবে কোন ধাতু-পরমাণু, বা যৌগ-মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণ গঠন করে। যেমন : $H_2SO_4 + Zn = ZnSO_4 + H_2$; $HCl + NaOH$ (ক্ষারীয় পদার্থ) $= NaCl + H_2O$।

অতএব বলা যায়, **প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন-পরমাণু-বিশিষ্ট যে-সকল যৌগিক পদার্থের হাইড্রোজেন-পরমাণুসমূহ আংশিক, বা সম্পূর্ণরূপে কোন ধাতু, বা যৌগ-মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণ উৎপন্ন করে, এবং যাহাদের স্বাদ অম্ল হয় ও যাহারা নীল লিটমাসকে লাল করে, তাহাদের বলা হয় অ্যাসিড** (acid)।

নিম্নে কয়েকটি সাধারণ পরিচিত অ্যাসিডের উল্লেখ করা হইল : হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), কার্বোনিক অ্যাসিড (H_3CO_3) ইত্যাদি।

ক্ষারক (Base)

অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড জাতীয় যে-সকল যৌগ বিভিন্ন অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ায় লবণ ও জল গঠন করে, তাহাদের বলা হয় ক্ষারক (base), যেমন : কপার অক্সাইড (CuO), ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ($NaOH$), ম্যাগ্‌নেসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Mg(OH)_2$], অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH) ইত্যাদি। অ্যাসিডের সহিত ইহাদের বিক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল :

$$CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$$

$$NaOH + HNO_3 = NaNO_3 + H_2O$$

জলে দ্রবণীয় হাইড্রক্সাইড ক্ষারককে বলা হয় ক্ষার (alkali) ; যেমন : $NaOH$, KOH, $Ca(OH)_2$, NH_4OH ইত্যাদি। যে কোন ক্ষারের জলীয় দ্রবণের সংস্পর্শে লাল লিট্‌মাস নীল হয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সকল ধাতব অক্সাইড, বা হাইড্রক্সাইডই জলে দ্রবণীয় নহে ; কাজেই বলা যাইতে পারে, **ক্ষার মাত্রেই ক্ষারক, কিন্তু সকল ক্ষারকই ক্ষার নহে।** $NaOH$, KOH, $Ca(OH)_2$ ইত্যাদিকে ক্ষার ও ক্ষারক উভয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় ; কিন্তু CuO, Fe_2O_3, $Fe(OH)_3$, $Al(OH)_3$ ইত্যাদি ক্ষারক পদার্থ (base), ক্ষার (alkali) নহে।

লবণ (Salt)

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন অ্যাসিডের হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলি কোন ধাতু, বা যৌগ-মূলক দ্বারা আংশিক, বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হইলে যে পদার্থ গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় লবণ।

অ্যাসিডের সহিত ক্ষারক, বা ক্ষারের বিক্রিয়ায় জল ও লবণ উৎপন্ন হয়। অ্যাসিডের হাইড্রোজেন-পরমাণুসমূহ আংশিক, বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হইলে যে বিভিন্ন ধরনের লবণ গঠিত হয়, তাহাদের বলে যথাক্রমে **অম্ল-লবণ** (acid salt) ও **শমিত লবণ** (normal salt)। অম্ল-লবণের কিছু অ্যাসিড-

ধর্মিতা অবশিষ্ট থাকে বলিয়া উহা আরও ক্ষার, বা ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অবশেষে শমিত লবণ উৎপন্ন করিতে পারে।

$$H_2SO_4 + NaOH = NaHSO_4 + H_2O$$

(সোডিয়াম বাইসালফেট ; অম্ল-লবণ)

$$NaHSO_4 + NaOH = Na_2SO_4 + H_2O$$

(সোডিয়াম সালফেট ; শমিত লবণ)

কোন ক্ষার, বা ক্ষারক অ্যাসিড দ্বারা আংশিকভাবে প্রশমিত করিলে যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলা হয় **ক্ষারকীয় লবণ** (basic salt)। এইরূপ লবণের কিছু ক্ষারকীয় ধর্ম অবশিষ্ট থাকে এবং উহা আরও অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অবশেষে শমিত লবণ উৎপন্ন করে :

$$Pb(OH)_2 + HNO_3 = Pb(OH)NO_3 + H_2O$$

(বেসিক লেড নাইট্রেট ; ক্ষারকীয় লবণ)

$$Pb(OH)NO_3 + HNO_3 = Pb(NO_3)_2 + H_2O$$

(লেড নাইট্রেট ; শমিত লবণ)

প্রশমন-ক্রিয়া (Neutralisation)

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতিবিশিষ্ট ; উহা লাল লিট্‌মাসকে নীল করে এবং উহার স্পর্শানুভূতি সাবান-জলের ন্যায় পিচ্ছিল। পক্ষান্তরে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের স্বাদ অম্ল এবং উহার সংস্পর্শে নীল লিট্‌মাস লাল হয়। এখন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্রমশঃ ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া যোগ করা হইতে থাকে, তাহা হইলে অবশেষে এমন এক সময় আসিবে যখন মিশ্র দ্রবণটির আম্লিক, বা ক্ষারীয় কোন ধর্মই পরিলক্ষিত হইবে না ; অর্থাৎ এই দ্রবণে নীল লিট্‌মাস লাল হইবে না, লাল লিট্‌মাসও নীল হইবে না। এই দ্রবণটি **প্রশম দ্রবণ** (neutral solution), অর্থাৎ পূর্ণ-প্রশমিত লবণের জলীয় দ্রবণ। অ্যাসিড ও ক্ষারের এইরূপ যে পারস্পরিক বিক্রিয়ায় অ্যাসিডের অম্লত্ব ও ক্ষারের ক্ষারত্ব উভয়ই সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া থাকে, সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **প্রশমন-ক্রিয়া** (neutralisation)।

বস্তুতঃপক্ষে, যে-কোন অ্যাসিড ও ক্ষারের পারস্পরিক প্রশমন-ক্রিয়ায় সর্বদাই কোন লবণ ও জল উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যেমন—

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

$$2NH_4OH + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4 + 2H_2O$$

জারণ ও বিজারণ
(Oxidation and Reduction)

পাঠ্যসূচী ঃ জারণ ও বিজারণ।

জারণ-ক্রিয়া (Oxidation)

কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ-ক্রিয়াকে সাধারণতঃ বলা হয় জারণ ; কিন্তু ব্যাপক অর্থে আরও নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া জারণ-ক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত ; যেমন—

(i) **অক্সিজেন-সংযোগ ঃ** কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়াকে সাধারণতঃ বলা হয় জারণ (oxidation), আর উৎপন্ন পদার্থটিকে বলে **জারিত পদার্থ** (oxidised substance) ; যথা—

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O \qquad P_4 + 5O_2 = 2P_2O_5$$

$$2Mg + O_2 = 2MgO \qquad 2SO_2 + O_2 = 2SO_3$$

(ii) **ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌলের সংযোগ ঃ** অক্সিজেনের ন্যায় ক্লোরিন, সালফার প্রভৃতি কোন ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌল অপর কোন মৌলের সহিত যুক্ত হইলে, অথবা কোন যৌগিক পদার্থের ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌলিক, বা যৌগ-মূলক উপাদানের আনুপাতিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সেই সকল প্রক্রিয়াকেও ব্যাপক অর্থে জারণ-ক্রিয়া বলে ; যথা—

$$2Na + Cl_2 = 2NaCl \; ; \; 2FeCl_2 + Cl_2 = 2FeCl_3$$

(iii) **হাইড্রোজেন অপসারণ ঃ** যে-সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোন যৌগ হইতে তাহার হাইড্রোজেন উপাদান অপসারিত, বা বিদূরিত হয়, তাহাদেরও জারণ-ক্রিয়া বলা হয় ; যেমন—

$$4HCl + MnO_2 = MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$

$$H_2S + Br_2 = S + 2HBr$$

(iv) **ধন-তড়িদ্বাহী মৌলের অপসারণ ঃ** কেবল হাইড্রোজেনই নহে, কোন যৌগ হইতে যে বিক্রিয়ার ফলে উহার ধন-তড়িদ্বাহী ধাতব মৌল উপাদানের অপসারণ ঘটে, তাহাকেও জারণ-ক্রিয়া বলে ; যথা—

$$2KBr + 4HNO_3 = 2KNO_3 + 2NO_2 + 2H_2O + Br_2$$

সংজ্ঞা : যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের সহিত (*a*) অক্সিজেন, বা (*b*) কোন ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌল, অথবা যৌগ-মূলকের সংযোগ ঘটে, অথবা কোন পদার্থ হইতে (*c*) হাইড্রোজেন, বা (*d*) কোন ধন-তড়িদ্বাহী মৌলের অপসারণ ঘটে, তাহাকে বলা হয় জারণ ক্রিয়া (oxidation)।

বিজারণ-ক্রিয়া (Reduction)

বিজারণ-ক্রিয়া জারণ-ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ অর্থে বিজারণ বলিতে অক্সিজেন-অপসারণের প্রক্রিয়া বুঝাইলেও অনুরূপ আরও বহু বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিজারণ পর্যায়ভুক্ত ; যেমন—

(i) **অক্সিজেন-অপসারণ :** যে প্রক্রিয়ায় কোন যৌগ হইতে অক্সিজেন অপসারিত হয়, তাহাকেই সাধারণভাবে বিজারণ-ক্রিয়া বলা হয় ; যথা—

$4H_2O + 3Fe = 4H_2 + Fe_3O_4$; $CuO + H_2 = Cu + H_2O$

(ii) **ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌল, বা যৌগ-মূলকের অপসারণ :** যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন যৌগ হইতে উহার ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌলিক, বা যৌগ-মূলক উপাদান অপসারিত হয়, তাহাকেও বিজারণ-ক্রিয়া বলে ; যথা—

$2HCl + Zn = ZnCl_2 + H_2$

$Fe_2(SO_4)_3 + 2H = 2FeSO_4 + H_2SO_4$

(iii) **হাইড্রোজেন সংযোগ :** কোন মৌলের সহিত হাইড্রোজেনের সংযোগ-ক্রিয়াকেও বিজারণ-ক্রিয়া বলা হয় ; যেমন—

$Cl_2 + H_2 = 2HCl$; $SO_2 + 2H_2O + I_2 = 2HI + H_2SO_4$

(iv) **ধন তড়িদ্বাহী মৌলের সংযোগ :** যে প্রক্রিয়ায় কোন ধাতব ধন-তড়িদ্বাহী মৌল অপর কোন মৌলের সহিত যুক্ত হয়, অথবা কোন যৌগিক পদার্থে তাহার সংগঠক ধন-তড়িদ্বাহী ধাতব মৌল উপাদানের আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটে, তাহাকেও ব্যাপক অর্থে বিজারণ-ক্রিয়া বলা হয় ; যথা—

$2K + Cl_2 = 2KCl$; $Fe + S = FeS$

সংজ্ঞা : যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থ হইতে (*a*) অক্সিজেন, বা (*b*) কোন ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌল, অথবা যৌগ-মূলকের অপসারণ, বা আনুপাতিক পরিমাণের হ্রাস ঘটে, অথবা কোন

পদার্থের সহিত (*c*) হাইড্রোজেন, বা (*d*) কোন ধন-তড়িদ্বাহী মৌলের সংযোগ ঘটে, তাহাকে বিজারণ-ক্রিয়া (reduction) বলা হয়।

জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক :
(Oxidation and Reduction are Complimentary Processes)

জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া পরস্পরের সহায়ক, বা পরিপূরক (complimentary) প্রক্রিয়া। কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে একটি পদার্থ **জারিত** (oxidised) হইলে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অপর কোন একটি পদার্থ অবশ্যই **বিজারিত** (reduced) হইতে হইবে। যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় **জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া সর্বদা একই সঙ্গে ঘটিয়া থাকে ;** কোন বিক্রিয়ায়ই কেবল জারণ, বা বিজারণ ক্রিয়া এককভাবে ঘটিতে পারে না। জারক পদার্থ (oxidising agent) ও বিজারক পদার্থের (reducing agent) পারস্পরিক বিক্রিয়াকালে জারক পদার্থটি বিজারিত হয় এবং বিজারক পদার্থটির জারণ ঘটে। জারক পদার্থের সাধারন পরিচিত কয়েকটি উদাহরণ হইল গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), ক্লোরিন (Cl_2), পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) ইত্যাদি ; বিজারক পদার্থের দৃষ্টান্ত : হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), পটাশিয়াম আয়োডাইড (KI) ইত্যাদি।

জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া যে একই সঙ্গে ঘটে, তাহা নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝা যাইবে :

জারণ

(i) $$H_2S + Cl_2 = 2HCl + S$$

বিজারণ

জারণ

(ii) $$2H_2SO_4 + 2KI = K_2SO_4 + SO_2 + I_2 + 2H_2O$$

বিজারণ

যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারণ ও বিজারন ক্রিয়া যে একই সঙ্গে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, জারণ ব্যতীত বিজারণ ক্রিয়া ঘটিতে পারে না, তাহা উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুইটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বায়ু (Air)

পাঠ্যসূচীঃ তরল বায়ুঃ নাইট্রোজেন চক্র ও কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র (সাধারণ ধারণা) ; বায়ুর বিরল গ্যাসীয় উপাদানগুলির ব্যবহার : নিয়ন-আলোক।

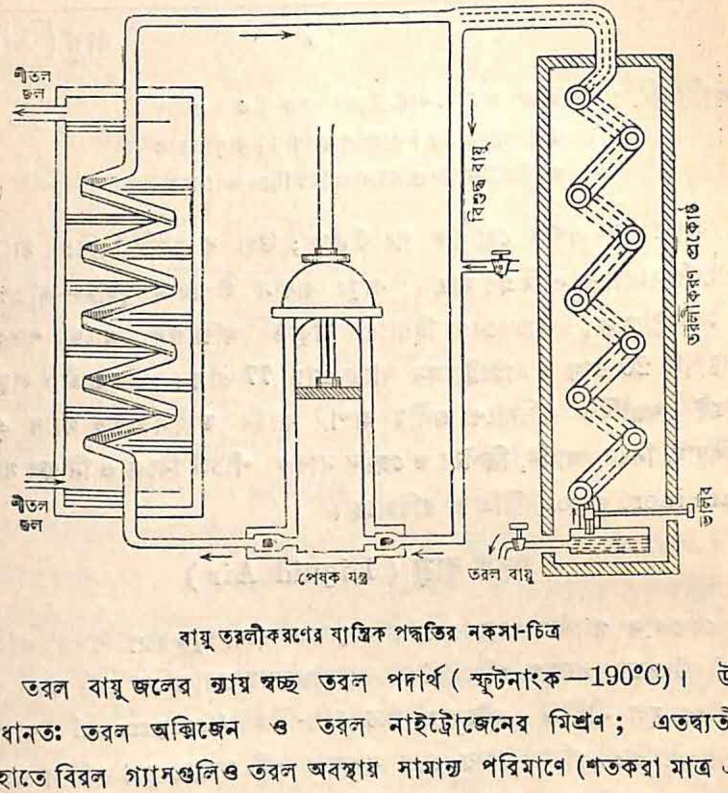
বায়ু কোন একক মৌলিক পদার্থ নহে ; উহা কয়েকটি বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের সাধারণ সংমিশ্রণ মাত্র। বায়ুর প্রধান উপাদান দুইটি—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ; আয়তনের হিসাবে বায়ুতে অক্সিজেন আছে শতকরা মোটামুটি 20 ভাগ ও নাইট্রোজেন আছে প্রায় 77 ভাগ। এতদ্ব্যতীত বায়ুতে সর্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবং হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন ও জেনন নামক পাঁচটি বিরল ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস (rare inert gases) মিশ্রিত রহিয়াছে।

তরল বায়ু (Liquid Air)

যে-কোন গ্যাসীয় পদার্থের ন্যায় বায়ুকেও যথোপযুক্তরূপে শীতল করিয়া যথেষ্ট উচ্চ চাপ প্রয়োগ করিলে উহা তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তরল বায়ু প্রস্তুতির মূল নীতিটি এইরূপ : উচ্চ চাপ-পিষ্ট (compressed) বায়ুকে সহসা প্রসারিত করিয়া উহার চাপ অকস্মাৎ অতি মাত্রায় হ্রাস করিলে বায়ুর তাপমাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পায়, এবং এইভাবে ক্রমশঃ শীতলতর হইতে-হইতে অবশেষে উহা গ্যাসীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

বায়ুকে প্রথমে অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কষ্টিক পটাস-পূর্ণ কয়েকটি স্তম্ভের মধ্য দিয়া পর-পর কয়েক বার চালনা করিয়া উহার জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করা হয়। এই বিশুদ্ধ ও বিশুষ্ক বায়ুকে অতি উচ্চ চাপে পিষ্ট করিয়া বাহিরে ঠাণ্ডা জলস্রোতের সাহায্যে উহাকে শীতল করা হয়। অতঃপর এই শীতল ও উচ্চ চাপ-পিষ্ট বায়ুকে একটি দীর্ঘ কুণ্ডলীকৃত সরু নলের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সহসা সম্প্রসারিত করিলে বায়ু যথেষ্ট শীতল হইয়া পড়ে। এই শীতল বায়ুকে পুনরায় চাপ-পিষ্ট করিয়া উহাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েক বার উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সহসা সম্প্রসারণ করিলে উহা

উত্তরোত্তর অধিকতর শীতল হইতে থাকে। তাপমাত্রা এইভাবে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে যথেষ্ট নিম্ন উষ্ণতায় বায়ু তরলীভূত হইয়া পড়ে।



বায়ু তরলীকরণের যান্ত্রিক পদ্ধতির নকসা-চিত্র

তরল বায়ু জলের ন্যায় স্বচ্ছ তরল পদার্থ (স্ফুটনাংক—190°C)। উহা প্রধানতঃ তরল অক্সিজেন ও তরল নাইট্রোজেনের মিশ্রণ; এতদ্ব্যতীত উহাতে বিরল গ্যাসগুলিও তরল অবস্থায় সামান্য পরিমাণে (শতকরা মাত্র এক ভাগ) মিশ্রিত থাকে। তরল বায়ুর সর্বপ্রধান ব্যবহারিক প্রয়োগ হইল, ইহা বিশুদ্ধ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও বিরল গ্যাসগুলির শিল্পোৎপাদনের প্রধান উৎস। তরল বায়ুর বারংবার আংশিক-পাতন (fractional distillation) প্রক্রিয়ায় অবশেষে প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen Cycle)

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের কোষে **প্রোটিন** (protein) নামক নাইট্রোজেন-ঘটিত এক প্রকার জটিল জৈব যৌগের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক; বস্তুতঃ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য নাইট্রোজেন একটি অপরিহার্য মৌল উপাদান। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রধানতঃ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত

অবস্থায় রহিয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বিভিন্ন উপায়ে এই বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন-উপাদান প্রস্তুত করে। আবার, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ হইতে এই প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হইয়া নাইট্রোজেন বিমুক্ত হয় এবং পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মেশে। এইভাবে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের পরিমাণ সর্বদা মোটামুটি স্থির থাকে। **নানারূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল হইতে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে, এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ হইতে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের চক্রাবর্তনের বিভিন্ন পরিবর্তন-প্রক্রিয়াগুলিকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় নাইট্রোজেন চক্র** (nitrogen cycle)।

(ক) **নাইট্রোজেন আহরণ :** আকাশে মেঘের বিদ্যুৎক্ষরণ ও বজ্রপাত-কালে বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পারস্পরিক রাসায়নিক সংযোগে প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ও পরে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং উহা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড রূপে মাটিতে আসিয়া মেশে। মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্ন ক্ষারীয় পদার্থ এই নাইট্রিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করিয়া বিভিন্ন নাইট্রেট লবণে পরিণত করে এবং উদ্ভিদেরা এই নাইট্রেট লবণের জলীয় দ্রবণ শিকড়ের মাধ্যমে শোষণ করিয়া জটিল জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিজ দেহ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ঘটিত প্রোটিন উপাদান প্রস্তুত করে।

ছোলা, শিম ইত্যাদি লিগুমিনাস (leguminous) জাতীয় কোন-কোন উদ্ভিদ-মূলের গুঁটিতে বর্তমান অ্যাজোটোব্যাক্টর (azotobacter) নামক এক প্রকার জীবাণু বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি নাইট্রেট লবণ রূপে সংবদ্ধ করিয়া এই সকল উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করে।

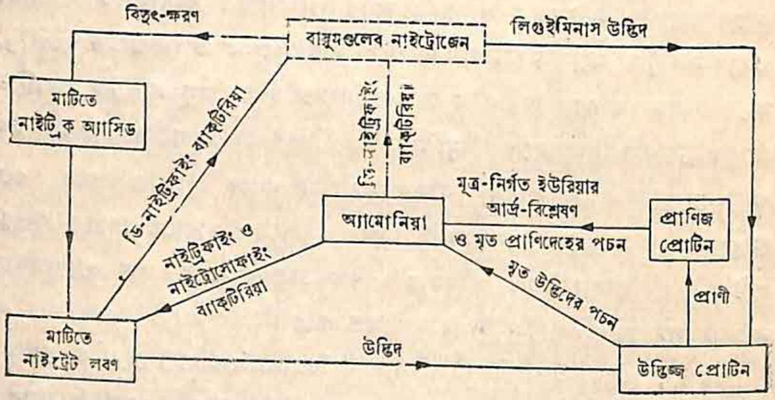
প্রাণীরা উদ্ভিদের ন্যায় নিজ দেহে সরাসরি প্রোটিন উপাদান প্রস্তুত করিতে পারে না। নিরামিষাশী প্রাণীরা বিভিন্ন উদ্ভিদ হইতে, এবং মাংসাশী প্রাণীরা অন্যান্য প্রাণিদেহের মাংস হইতে প্রোটিন আত্মসাৎ করিয়া নিজ দেহ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

(খ) **নাইট্রোজেন বর্জন :** বিভিন্ন প্রাণীর মূত্রে ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$] নামক এক প্রকার জৈব যৌগ থাকে। ইহা জলের সংস্পর্শে আর্দ্র-বিশ্লেষিত (hydrolysed) হইয়া অ্যামোনিয়া (NH_3) বিমুক্ত করে। আবার, মৃত উদ্ভিদ, বা প্রাণিদেহ মাটিতে পচিয়াও অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়। এই

অ্যামোনিয়া মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রিফাইং (nitrifying) ও নাইট্রোসোফাইং (nitrosofying) নামক দুই প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়ার প্রভাবে প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। এই নাইট্রেট লবণের কতকাংশ উদ্ভিদেরা খাদ্য-রসরূপে নিজ দেহে গ্রহণ করে এবং মাটিতে ইহার অবশিষ্টাংশ ও অ্যামোনিয়া মৃত্তিকাস্থিত ডি-নাইট্রিফাইং (de nitrifying) নামক অপর এক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়ার প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া আবার নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং তাহা বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়।

নিম্নের চিত্রটিতে নাইট্রোজেন-চক্রের উল্লিখিত বিভিন্ন ধারাগুলি ছকের সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইল :

নাইট্রোজেন চক্র :



নাইট্রোজেন-চক্রের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রক্রিয়াগুলি নির্দেশিকার সাহায্যে প্রদর্শিত হইল

কার্বন চক্র (Carbon Cycle)

শ্বাস-ক্রিয়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদেরা বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের সংগঠক কার্বনের মৃদু দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া নিঃশ্বাসের সহিত নির্গত হয়। পক্ষান্তরে, নিম্নলিখিত তিনটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে বিমুক্ত হয় এবং উহাদের পারস্পরিক সমতা রক্ষিত হয় :

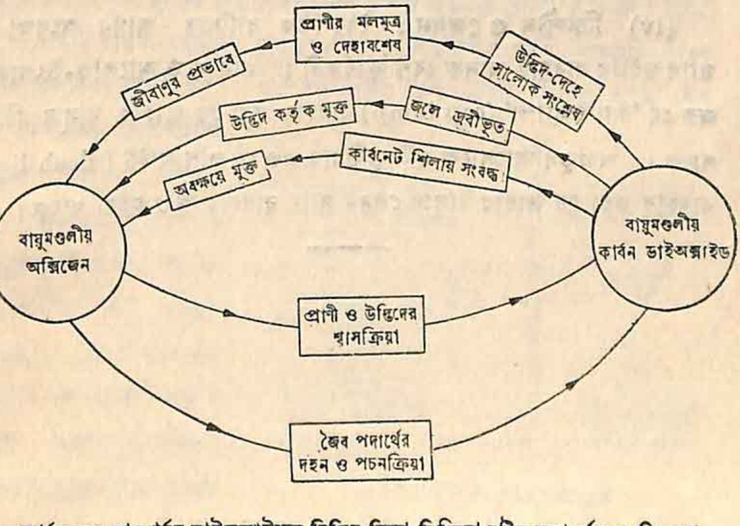
(i) উদ্ভিদেরা দিবাভাগে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং পাতার সবুজ-কণা, বা ক্লোরোফিলের (chlorophyll) অনুঘটন-প্রভাবে সূর্যালোকের

উপস্থিতে উহার সহিত জলের অতি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিজ দেহ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন-ঘটিত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে এবং সম-আয়তন অক্সিজেন পত্র-রন্ধ্রের (stoma) পথে বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদ্ভিদের **সালোকসংশ্লেষ** (photosynthesis), বা **কার্বন-আত্তীকরণ** (carbon-assimilation)।

(ii) কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে সামান্য দ্রবণীয় বলিয়া বৃষ্টি, সমুদ্র ও নদী-নালার জলে দ্রবীভূত হইয়া বায়ু হইতে কিছু পরিমাণে ক্রমে অপসারিত হয়।

(iii) কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অ্যাসিডধর্মী বলিয়া বিভিন্ন প্রকার প্রস্তর-শিলার সঙ্গে ইহার অতি মন্থর বিক্রিয়া ঘটে এবং সুদীর্ঘকালে ক্রমে-ক্রমে বিভিন্ন ধাতব কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট শিলায় পরিণত হয়।

মোট কথা, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা বিধানের জন্য প্রকৃতিতে নানা রূপ জটিল ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলিতেছে। **প্রকৃতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ধারাবাহিক উৎপত্তি ও অপসারণের বিবিধ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার পদ্ধতিসমূহকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় কার্বন ডাই-অক্সাইডের আবর্তন-চক্র** (carbon dioxide cycle), **অথবা সংক্ষেপে কার্বন চক্র** (carbon cycle)। চিত্রের সাহায্যে ইহাকে সংক্ষেপে নিম্ন-লিখিত রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে :



কার্বন চক্র, বা কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটিত চক্রাবর্তনের চিত্ররূপ

বায়ুর বিরল গ্যাসীয় উপাদানগুলির ব্যবহার
(Use of the Rare Gases in Air)

বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সহিত অতি স্বল্প পরিমাণে পাঁচটি বিরল নিষ্ক্রিয় গ্যাস মিশ্রিত রহিয়াছে : হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন ও জেনন। ইহাদের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগ নিম্নে আলোচিত হইল।

(i) **হিলিয়াম :** হিলিয়াম গ্যাস অত্যন্ত হাল্‌কা ও অদাহ্য। আবহ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য বেলুন উত্তোলনে হিলিয়াম প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে তরল হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

(ii) **নিয়ন :** নিয়ন গ্যাসের মধ্য দিয়া অতি নিম্ন চাপে বিদ্যুৎক্ষরণ (electric discharge) করিলে অত্যুজ্জ্বল লাল আলোক নির্গত হয়। নিয়নের সহিত উপযুক্ত অনুপাতে অন্যান্য বিরল গ্যাস মিশ্রিত করিলে অনুরূপ অবস্থায় অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল আলোক পাওয়া যায়। এই প্রকার **নিয়ন-আলোক** (neon light) অতি সুদৃশ্য এবং বহু দূর হইতে ঘন কুয়াশার মধ্যেও দেখা যায়। এইজন্য সুদৃশ্য আলোক-সজ্জা ও সমুদ্রের আলোক-স্তম্ভে আলোক সংকেত রূপে নিয়ন-আলোকের ব্যবহার যথেষ্ট ব্যাপক।

(iii) **আর্গন :** ফিলামেণ্ট-যুক্ত সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতি ও প্রতিপ্রভ (flurescent) বাতি অতি স্বল্প চাপে আর্গন গ্যাস পূর্ণ থাকে।

(iv) **ক্রিপ্টন ও জেনন :** বৈদ্যুতিক বাতিতে আর্গন অপেক্ষা এই গ্যাস দুইটির ব্যবহার অনেক বেশী কার্যকরী। খনি-গর্ভে আলোক-উৎপাদনের জন্য যে 'ক্যাপ-ল্যাম্প' (cap lamp) ব্যবহার করা হয় তাহার বাল্‌বে ক্রিপ্টন থাকে। অপ্রতুল আলোকে ছবি তুলিবার জন্য যে ফ্লাশ লাইট (flash-light) ব্যবহার করা হয় তাহার বাল্‌বে জেনন গ্যাস ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কয়েকটি সাধারণ গ্যাস
(Some Common Gases)

পাঠ্যসূচী : কয়েকটি সাধারণ গ্যাসের সহজ প্রস্তুত-প্রণালী ও ধর্ম : অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড।

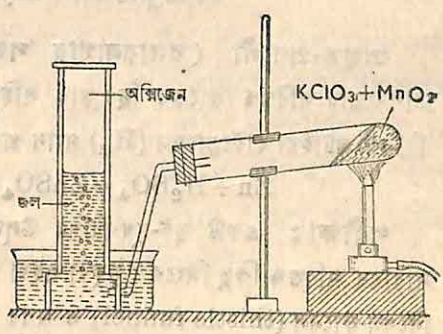
অক্সিজেন (Oxygen)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) : পটাশিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$)-কে যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় (630°C) উত্তপ্ত করিলে উহা বিয়োজিত হইয়া পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl)-এ রূপান্তরিত হয় এবং অক্সিজেন (O_2) গ্যাস বিমুক্ত হইয়া যায় :

$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2 \uparrow$$

কিন্তু উহার সহিত অনুঘটক হিসাবে সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) মিশ্রিত করিলে মাত্র 240°C তাপমাত্রায়ই পটাশিয়াম ক্লোরেট হইতে যথেষ্ট অক্সিজেন গ্যাস বিমুক্ত হইতে থাকে।

পরীক্ষা : সাধারণতঃ চার ভাগ পটাশিয়াম ক্লোরেট ও এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের বিচূর্ণিত মিশ্রণ একটি শক্ত ও মোটা কাঁচ-নলে লইয়া উহাকে একটি ধারক-বন্ধনীর সাহায্যে প্রায় অনুভূমিকভাবে সম্মুখের দিকে সামান্য হেলাইয়া রাখা হয়। পরীক্ষা-নলটির মুখ একটি নির্গম-নলযুক্ত কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া মিশ্রণটিকে বুনসেন বাতির শিখায় উত্তপ্ত করিলে পটাশিয়াম ক্লোরেটের বিয়োজনে অক্সি-জেন গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। নির্গম-নলের বাঁকানো সরু প্রান্তটি একটি পাত্রের জলে নিমজ্জিত রাখিয়া তাহার উপরে একটি জল-পূর্ণ গ্যাস-জার উল্টাইয়া ধরা হয়। গ্যাস-জারে জলের নিম্নাপসারণে



রসায়নাগারে অক্সিজেন প্রস্তুতি

অক্সিজেন গ্যাস উহাতে সংগৃহীত হইয়া থাকে ; এখন জারটির মুখে একখানা কাঁচের ঢাক্‌নি আঁটিয়া এইভাবে প্রস্তুত অক্সিজেন সঞ্চয় করা যাইতে পারে।

ভৌত ধর্ম ঃ অক্সিজেন স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন একটি মৌলিক গ্যাস। ইহা বায়ু অপেক্ষা সামান্য ভারী এবং জলে অতি সামান্য মাত্রায় দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) অক্সিজেন গ্যাস নিজে দাহ্য নহে, কিন্তু উহা অপরাপর দাহ্য পদার্থের দহনে সহায়তা করে ; বস্তুতঃ, যে-কোন দাহ্য পদার্থের দহনকালে উহার সহিত অক্সিজেনের সংযোগে কোন অক্সাইড যৌগ গঠিত হয়।

(a) হাইড্রোজেন, কার্বন, সালফার প্রভৃতি বিভিন্ন অ-ধাতুকে অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে দহন-ক্রিয়ার ফলে যথাক্রমে জল (জলীয় বাষ্প), কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসীয় অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয় :

$2H_2 + O_2 = 2H_2O$; $C + O_2 = CO_2$; $S + O_2 = SO_2$

(b) জ্বলন্ত ম্যাগ্‌নেসিয়াম, উত্তপ্ত সোডিয়াম, বা পটাশিয়াম ধাতু অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করাইলে প্রবলভাবে জ্বলিয়া তীব্র আলোক-শিখার সৃষ্টি করে এবং ধাতব অক্সাইড, বা পার-অক্সাইড যৌগ গঠিত হয়।

$$2Mg + O_2 = 2MgO \; ; \; 2Na + O_2 = Na_2O_2$$

(ii) অক্সিজেন একটি তীব্র জারক পদার্থ। বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড (NO) গ্যাস অক্সিজেনের সংস্পর্শে অতি দ্রুত জারিত হইয়া বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) গ্যাসে পরিণত হয় ; এই বিক্রিয়াটি অক্সিজেন সনাক্তকরণের পক্ষে সহায়ক : $2NO + O_2 = 2NO_2$।

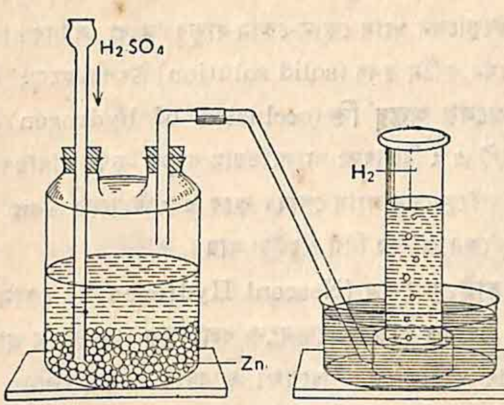
হাইড্রোজেন (Hydrogen)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) ঃ রসায়নাগারে সাধারণ তাপমাত্রায় অবিশুদ্ধ জিংকের ছিব্‌ড়ার সহিত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাইয়া হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাস প্রস্তুত করা হয় :

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \uparrow$$

পরীক্ষা ঃ একটি দুই-মুখ-বিশিষ্ট উল্‌ফ্‌-বোতলে (Woulfe's bottle) সাধারণ অবিশুদ্ধ কিছু জিংকের টুক্‌রা লইয়া তাহার এক মুখে একটি দীর্ঘ-নাল থিসেল-ফানেল (thistle funnel) ও অপর মুখে একটি বাঁকানো নির্গম-নল সছিদ্র কর্কের মধ্য দিয়া বায়ু-নিরুদ্ধভাবে আঁটিয়া দেওয়া হয়। ফানেলটির মধ্য দিয়া বোতলের মধ্যে এমনভাবে জল ঢালা হয় যাহাতে ফানেলের নিম্নপ্রান্তটি

জলে নিমজ্জিত থাকে। এখন থিসেল-ফানেলের ভিতর দিয়া মোটামুটি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ধীরে-ধীরে ঢালিলে জিংকের সহিত অ্যাসিডের বিক্রিয়ায়



রসায়নাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতি

হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নলের পথে বাহির হইতে থাকে। প্রথম দিকে নির্গত এই হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে উল্ফ্-বোতলের অভ্যন্তরস্থ বায়ু মিশ্রিত হইয়া আসে। কিছুক্ষণ পরে সম্যক বায়ু বাহির হইয়া গেলে গ্যাস-জারে জলের নিম্নাপসারণ পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করা হয়।

ভৌত ধর্ম : হাইড্রোজেন বর্ণ ও গন্ধহীন একটি মৌলিক গ্যাস। যাবতীয় গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা হাল্কা এবং জলে প্রায় অদ্রাব্য।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে দাহ্য ; কিন্তু অন্যান্য দাহ্য পদার্থের দহনে ইহা সহায়তা করে না। বায়ু বা অক্সিজেনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালাইলে উহা নীলাভ শিখায় জলে এবং জল (জলীয় বাষ্প) উৎপন্ন হয় : $2H_2+O_2=2H_2O$। শুষ্ক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ অত্যন্ত বিস্ফোরক-ধর্মী ; ইহাতে সামান্য অগ্নিসংযোগ করিলে গ্যাস দুইটির অতি দ্রুত রাসায়নিক সংযুতির ফলে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে।

(ii) অক্সিজেনের প্রতি হাইড্রোজেনের বিশেষ আসক্তির জন্য ইহা বিশেষভাবে **বিজারণ-ধর্মী**। কপার, লেড ইত্যাদি কোন-কোন ধাতুর

উত্তপ্ত অক্সাইড যৌগের উপর দিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত করিলে উহাদের বিজারণের ফলে বিশুদ্ধ ধাতু পাওয়া যায় :

$$CuO + H_2 = Cu + H_2O \quad ; \quad PbO + H_2 = Pb + H_2O$$

(iii) হাইড্রোজেন গ্যাস কোন-কোন ধাতুর মধ্যে সমসত্ত্বভাবে শোষিত হইয়া উভয়ের যেন কঠিন দ্রবণ (solid solution) উৎপন্ন করে ; ইহাকে বলা হয় **হাইড্রোজেনের অন্তর্ধৃতি** (occlusion of hydrogen)। আয়রন, নিকেল, কোবাল্ট এবং বিশেষতঃ প্যালাডিয়াম ধাতুর চূর্ণ সাধারণ তাপমাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করে এবং উহাদের উত্তপ্ত করিলে এই শোষিত হাইড্রোজেন আবার নির্গত হইয়া যায়।

জায়মান হাইড্রোজেন (Nascent Hydrogen): কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় **সদ্য উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে বলা হয় জায়মান হাইড্রোজেন** (H)। সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা জায়মান হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা অনেক বেশী ; ইহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বেগুনী বর্ণের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করিলে দ্রবণের কোন বর্ণ-পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ঐ দ্রবণের মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ও কয়েক টুক্রা জিংক দিলে জিংক ও অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন পারম্যাঙ্গানেটকে বিজারিত করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্রবণটিকে বর্ণহীন করে :

$$2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 10H = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O$$

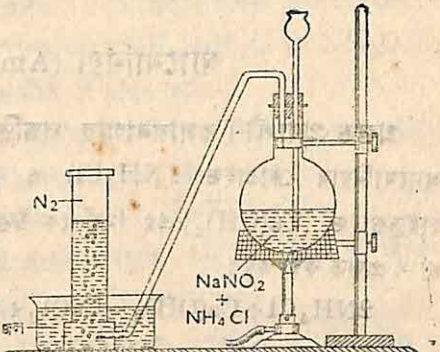
নাইট্রোজেন (Nitrogen)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) : রসায়নাগারে সাধারণতঃ সোডিয়াম নাইট্রাইট ($NaNO_2$) ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl)-এর মিশ্র জলীয় দ্রবণ উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। মিশ্রণের উপাদান দুইটির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রথমে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট (NH_4NO_2)উৎপন্ন হয় এবং উহা অতঃপর উত্তাপে বিয়োজিত হইয়া নাইট্রোজেন ও জলে পরিণত হয় :

$$NaNO_2 + NH_4Cl = NH_4NO_2 + NaCl$$

$$NH_4NO_2 = N_2\uparrow + 2H_2O$$

পরীক্ষা ঃ একটি কাঁচ-কুপীতে তিন ভাগ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও চার ভাগ সোডিয়াম নাইট্রাইটের একটি মিশ্রণ লইয়া উহার মুখে থিসেল-ফানেল ও নির্গম-নল সমন্বিত একটি কর্ক আঁটিয়া দেওয়া হয়। থিসেল-ফানেলের ভিতর দিয়া জল ঢালিয়া কুপীতে মিশ্রণটির একটি গাঢ় দ্রবণ তৈয়ারী করা হয়; থিসেল-ফানেলটির নিম্নপ্রান্ত যেন দ্রবণে নিমজ্জিত থাকে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখন কুপীটিকে বুনসেন বাতির শিখায় উত্তপ্ত করিলে নির্গম-নল দিয়া নাইট্রোজেন গ্যাস বাহির হইতে থাকে এবং জলের নিম্নাপসারণ পদ্ধতিতে একটি গ্যাস-জারে উহা সংগ্রহ করা হয়।



রসায়নাগারে নাইট্রোজেন প্রস্তুতি

ভৌত ধর্ম ঃ নাইট্রোজেন স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন একটি মৌলিক গ্যাস। ইহা জলে অতি সামান্য মাত্রায় দ্রবণীয় এবং বায়ু অপেক্ষা সামান্য হালকা।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) নাইট্রোজেন গ্যাস দাহ্যও নহে, দাহকও নহে; একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করাইলে কাঠিটি নিভিয়া যায়, গ্যাসটিও জ্বলে না।

(ii) সাধারণ তাপমাত্রায় নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা অত্যন্ত কম; কিন্তু উচ্চতর তাপমাত্রায় নাইট্রোজেনের সঙ্গে কোন-কোন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে।

(a) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের আয়তন-ভিত্তিক 1 : 3 আনুপাতিক গ্যাসীয় মিশ্রণকে অতি উচ্চ চাপে (200 বায়ুচাপ) ও 550°C তাপমাত্রায় আয়রন-চূর্ণ অনুঘটকের উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস উৎপন্ন হয়:

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

(b) লোহিত-তপ্ত ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি কোন-কোন ধাতুর সহিত নাইট্রোজেন গ্যাসের বিক্রিয়ায় বিভিন্ন নাইট্রাইড

যৌগ উৎপন্ন হয়; উহারা আবার জলের সংস্পর্শে সহজেই আর্দ্র-বিশ্লেষিত (hydrolysed) হইয়া অ্যামোনিয়া বিমুক্ত করে :

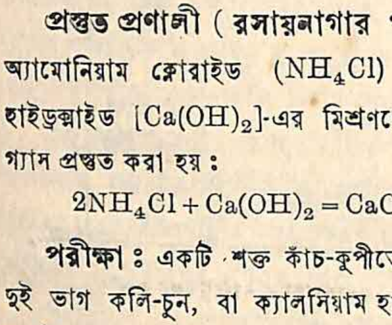
$$3Ca + N_2 = Ca_3N_2 \; ; \; Ca_3N_2 + 6H_2O = 3Ca(OH)_2 + 2NH_3$$

অ্যামোনিয়া (Ammonia)

প্রস্তুত প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) : রসায়নাগারে সাধারণতঃ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) ও শুষ্ক কলি-চুন, বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$]-এর মিশ্রণকে উত্তপ্ত করিয়া অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস প্রস্তুত করা হয় :

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3 \uparrow$$

পরীক্ষা : একটি শক্ত কাঁচ-কুপীতে এক ভাগ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও দুই ভাগ কলি-চুন, বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের মিশ্রণ লইয়া কুপীটির মুখে একটি নির্গম-নলযুক্ত কর্ক দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দেওয়া হয়। কুপীটিকে একটি ধারক-বন্ধনীর সাহায্যে তার-জালির উপরে বসাইয়া বুনসেন দীপের শিখায় উত্তপ্ত করিলে নির্গম-নল দিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস বাহির হয়। এই অ্যামোনিয়ার সহিত কিছু জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া পাইতে হইলে গ্যাসটিকে পোড়া-চুন (CaO)-পূর্ণ একটি বিশুষ্কীকরণস্তম্ভের (drying tower) মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া জলীয় বাষ্প শোষিত করা হয়।



রসায়নাগারে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি

অতঃপর স্তম্ভটির সহিত সংযুক্ত একটি নির্গম-নলের উর্ধমুখী প্রান্তের উপরে একটি গ্যাস-জার উল্টাইয়া ধরিলে বায়ুর নিম্নাপসারণে গ্যাস-জারে বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া গ্যাস সঞ্চিত হয়; কারণ, অ্যামোনিয়া বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা।

ভৌত ধর্ম : অ্যামোনিয়া তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ। ইহা বায়ু অপেক্ষা যথেষ্ট হাল্‌কা এবং জলে সবিশেষ দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) অ্যামোনিয়া দাহ্য, বা দাহক গ্যাস নহে;

কিন্তু অক্সিজেনের মধ্যে অ্যামোনিয়া গ্যাসে অগ্নিসংযোগ করিলে উহা সবুজাভ হলুদ শিখায় জ্বলিতে থাকে এবং নাইট্রোজেন ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়:

$$4NH_3 + 3O_2 = 2N_2 + 6H_2O$$

(ii) অ্যামোনিয়া গ্যাসের জলীয় দ্রবণে উহার সহিত জলের সংযোগে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষার উৎপন্ন হয়: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH$; এই দ্রবণের সংস্পর্শে লাল লিট্‌মাস নীল বর্ণ ধারণ করে।

কোন-কোন ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়া-দ্রবণ যুক্ত করিলে ধাতুগুলি অদ্রাব্য হাইড্রক্সাইড যৌগরূপে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে:

$$FeCl_3 + 3NH_4OH = 3NH_4Cl + Fe(OH)_3 \downarrow$$

(iii) অ্যামোনিয়া **ক্ষারীয়** পদার্থ; উহার সহিত বিভিন্ন অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন হয়।

একটি কাঁচ-দণ্ডের অগ্রভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া উহাকে অ্যামোনিয়া গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করাইলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl)-এর গাঢ় সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়: $NH_3 + HCl = NH_4Cl$। ইহা অ্যামোনিয়া গ্যাস সনাক্তকরণের একটি প্রকৃষ্ট পরীক্ষা।

(iv) অ্যামোনিয়া **বিজারক** পদার্থ। ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া জারিত হইয়া নাইট্রোজেন বিমুক্ত হয়; অ্যামোনিয়ার পরিমাণ অধিক থাকিলে অবশেষে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড গঠিত হইয়া থাকে:

$$2NH_3 + 3Cl_2 = 6HCl + N_2 \uparrow ; \; NH_3 + HCl = NH_4Cl$$

(v) লোহিত-তপ্ত সোডিয়াম ধাতুর উপর দিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস চালিত করিলে হাইড্রোজেন গ্যাস বিমুক্ত হয় এবং কঠিনাকার সোডামাইড ($NaNH_2$) যৌগ উৎপন্ন হয়; ইহা আবার সামান্য জলের সংস্পর্শেই আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া পুনরায় অ্যামোনিয়া বিমুক্ত করে:

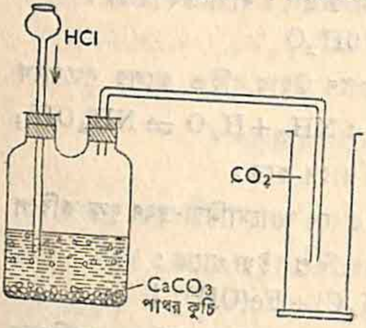
$$2Na + 2NH_3 = 2NaNH_2 + H_2$$
$$NaNH_2 + H_2O = NaOH + NH_3$$

কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon Dioxide)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি): রসায়নাগারে সাধারণতঃ মার্বেল-পাথর (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, $CaCO_3$)-এর সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস প্রস্তুত করা হয়:

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$$

পরীক্ষা : এক মুখে থিসেল-ফানেল ও অপর মুখে নির্গম নল যুক্ত একটি উল্‌ফ্‌-বোতলে কিছু মার্বেল-পাথরের টুক্‌রা ও জল লওয়া হয়; থিসেল-ফানেলের নিম্ন প্রান্ত যেন জলে নিমজ্জিত থাকে। এখন ফানেলটির মধ্য দিয়া মোটামুটি গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অল্প-অল্প করিয়া যোগ করিলে মার্বেল-পাথরের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় বুদবুদের আকারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হইয়া নির্গম-নলের পথে বাহির হয়। নির্গম-নলের খোলা মুখটি একটি গ্যাস-জারে প্রবেশ করাইলে বায়ুর ঊর্ধ্বাপসারণে গ্যাস-জারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সঞ্চিত হয়; কারণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী।



কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতির রসায়নাগার পদ্ধতি

ভৌত ধর্ম : কার্বন ডাইঅক্সাইড ঈষৎ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত একটি বর্ণহীন যৌগিক গ্যাসীয় পদার্থ; ইহার স্বাদ ঈষৎ অম্ল। কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী এবং জলে মোটামুটি দ্রবণীয়; উচ্চ চাপে জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত করিলে যে দ্রবণ পাওয়া যায় তাহাই সাধারণতঃ সোডা-ওয়াটার (soda water) নামে পরিচিত। CO_2 বিষাক্ত নহে, কিন্তু এই গ্যাসের মধ্যে জীবের শ্বাস-ক্রিয়া চলে না। উপযুক্ত উচ্চ চাপ ও নিম্ন তাপমাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। কঠিন CO_2-কে বলা হয় 'শুষ্ক বরফ' (dry ice)। সাধারণ তাপমাত্রায় রাখিয়া দিলে এই শুষ্ক বরফ ঊর্ধ্বপাতিত হইয়া সরাসরি CO_2 গ্যাসে পরিণত হয়, সাধারণ বরফের মত তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য হিমায়ক পদার্থ (refrigerant) রূপে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি অ্যাসিড ধর্মী অক্সাইড। উহার জলীয় দ্রবণে কার্বোনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) নামে একটি মৃদু, অস্থায়ী অ্যাসিড উৎপন্ন হয়: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$; এই দ্রবণের সংস্পর্শে নীল লিট্‌মাস হাল্‌কা লাল্‌চে বর্ণ ধারণ করে।

(ii) কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দাহ্যও নহে, দাহকও নহে; ইহার মধ্যে জলন্ত পাটকাঠি, বা মোমবাতি প্রবেশ করাইলে তাহা নিভিয়া যায়, গ্যাসটিও জলে না। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে জলন্ত ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সোডিয়াম, বা পটাশিয়াম ধাতু দিলে উহারা জলিতেই থাকে; ধাতব অক্সাইড যৌগ গঠিত হয় এবং সূক্ষ্ম কার্বন-কণিকা বিমুক্ত হওয়ার ফলে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়:

$$2Mg + CO_2 = 2MgO + C$$

(iii) কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাসিড-ধর্মী অক্সাইড বলিয়া উহার সহিত ক্ষারের বিক্রিয়ায় কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট লবণ গঠিত হয়। পরিষ্কার স্বচ্ছ চুন-জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করিলে প্রথমে **জলে-অদ্রবণীয়** ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$) লবণ উৎপন্ন হওয়ার ফলে পরিষ্কার চুন-জল অস্বচ্ছ, ঘোলাটে হইয়া যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করিলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অবশেষে **জলে-দ্রাব্য** ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট [$Ca(HCO_3)_2$] লবণে পরিণত হইবার ফলে দ্রবণটি পুনরায় পরিষ্কার স্বচ্ছ হয়।

$$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$$
$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2$$

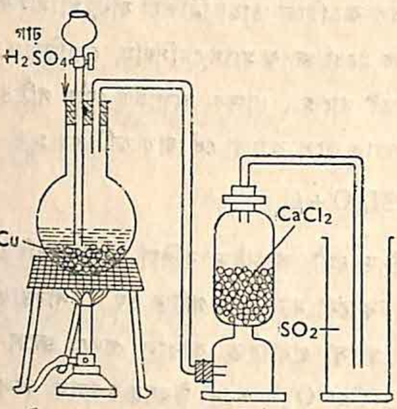
সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur Dioxide)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি): রসায়নাগারে সাধারণতঃ উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডকে ধাতব কপার দ্বারা বিজারিত করিয়া সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস প্রস্তুত করা হয়:

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + 2H_2O + SO_2 \uparrow$$

পরীক্ষা: থিসেল-ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি কাঁচ-কুপীতে ধাতব কপারের কিছু টুক্‌রা লইয়া ফানেলের মধ্য দিয়া গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড এমনভাবে ঢালা হয় যাহাতে ফানেলের নিম্ন-প্রান্তটি অ্যাসিডে নিমজ্জিত থাকে। এখন কুপীটিকে ধারক-বন্ধনীর সাহায্যে একটি তার জালির উপর বসাইয়া উহাকে বুনসেন দীপের শিখায় উত্তপ্ত করিলে কপার ও অ্যাসিডের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নলের পথে বাহির হইতে

থাকে। এইভাবে প্রস্তুত সালফার ডাইঅক্সাইডে কিছু জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে।



রসায়নাগারে সালফার ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতি

বিশুদ্ধ SO_2 গ্যাস পাইতে হইলে উহাকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), বা অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড($CaCl_2$) অথবা ফসফরাস পেণ্টক্সাইড (P_2O_5)-পূর্ণ একটি স্তম্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া জলীয় বাষ্প শোষিত করা হইয়া থাকে অতঃপর বায়ুর উর্ধাপসারণ ব্যবস্থায় গ্যাস-জারে বিশুদ্ধ সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করা হয়; কারণ, ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী।

ভৌত ধর্ম ঃ সালফার ডাইঅক্সাইড এক প্রকার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন, বায়ু অপেক্ষা ভারী গ্যাস। ইহা জলে যথেষ্ট দ্রাব্য।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস দাহ্যও নহে, দাহকও নহে; জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করাইলে কাঠিটি নিভিয়া যায়, গ্যাসটিও জ্বলে না।

(ii) সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসের জলীয় দ্রবণে সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3) নামে একটি মৃদু, অস্থায়ী অ্যাসিড উৎপন্ন হইবার ফলে জলীয় দ্রবণটির আম্লিক ধর্ম পরিলক্ষিত হয়; উহা নীল লিট্‌মাস লাল করে :

$$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$$

(iii) সালফার ডাইঅক্সাইড **অ্যাসিড-ধর্মী** অক্সাইড ; উহার সহিত বিভিন্ন ক্ষারের বিক্রিয়ায় সালফাইট ও বাইসালফাইট লবণ গঠিত হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ন্যায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসকেও পরিষ্কার স্বচ্ছ চুন-জলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে প্রথমে **জলে-অদ্রাব্য** ক্যালসিয়াম সালফাইট লবণ উৎপন্ন হওয়ার ফলে চুন-জল অস্বচ্ছ, ঘোলাটে হয়; কিন্তু গ্যাসটি দীর্ঘক্ষণ চালনা করিলে ক্যালসিয়াম সালফাইট অবশেষে **জলে-দ্রাব্য** ক্যালসিয়াম বাইসালফাইট লবণে পরিণত হওয়ার ফলে দ্রবণটি পুনরায় স্বচ্ছ হয় :

$$Ca(OH)_2 + SO_2 = CaSO_3 + H_2O$$
$$CaSO_3 + H_2O + SO_2 = Ca(HSO_3)_2$$

(iv) সালফার ডাইঅক্সাইড **বিজারক** পদার্থ। ঈষৎ হরিদ্রাভ ক্লোরিন-জল, অথবা আয়োডিনের বেগুনী-বর্ণ জলীয় অবদ্রবণের (suspension) মধ্য দিয়া সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করিলে ক্লোরিন, বা আয়োডিন যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক, বা হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিডে বিজারিত হইবার ফলে দ্রবণের বর্ণ অন্তর্হিত হয়:

$$Cl_2 + SO_2 + 2H_2O = H_2SO_4 + 2HCl$$

$$I_2 + SO_2 + 2H_2O = H_2SO_4 + 2HI$$

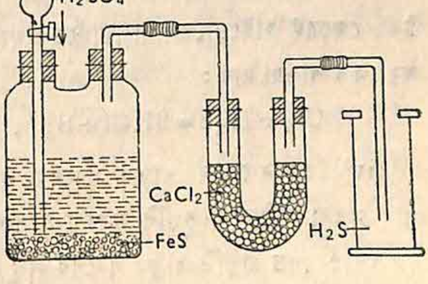
(v) **জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে** সালফার ডাইঅক্সাইডের বিরঞ্জক ধর্ম (bleaching property) লক্ষ্য করা যায়। পরিধেয় বস্ত্রাদি, রঙীন ফুল, ঘাস প্রভৃতি আর্দ্র অবস্থায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উহাদের বর্ণ সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়।

হাইড্রোজেন সালফাইড (Hydrogen Sulphide)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি): রসায়নাগারে সচরাচর সাধারণ তাপমাত্রায় ফেরাস সালফাইডের সহিত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস প্রস্তুত করা হয়:

$$FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S \uparrow$$

পরীক্ষা: একটি উল্ফ্-বোতলের এক মুখে একটি থিসেল-ফানেল ও অপর মুখে একটি নির্গম-নল কর্কের সাহায্যে সংযুক্ত করা হয়। বোতলটিতে কিছু ফেরাস সালফাইডের টুকরা ও জল লওয়া হয়; থিসেল-ফানেলটির নিম্ন-প্রান্ত যেন জলে নিমজ্জিত থাকে। এখন ফানেলের মধ্য দিয়া মোটামুটি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড অল্প অল্প করিয়া যোগ করিলে নির্গম-নলের পথে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। এইভাবে প্রস্তুত গ্যাসের সহিত কিছু জলীয় বাষ্প ও সামান্য হাইড্রোজেন মিশ্রিত থাকে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ



হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুতির রসায়নাগার-পদ্ধতি

হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস পাইতে হইলে উহাকে অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$), বা ফসফরাস পেণ্টক্সাইড (P_2O_5)-পূর্ণ একটি স্তম্ভের, বা U-নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া জলীয় বাষ্প শোষিত করা হয়। অতঃপর বায়ুর ঊর্ধাপসারণ পদ্ধতিতে গ্যাস-জারে গ্যাসটি সংগৃহীত হইয়া থাকে ; কারণ, উহা বায়ু অপেক্ষা ভারী। এইভাবে প্রাপ্ত গ্যাসের মধ্যে অবশ্য সামান্য কিছু হাইড্রোজেন সর্বদা অবিশুদ্ধিরূপে থাকিয়া যায়।

ভৌত ধর্ম ঃ হাইড্রোজেন সালফাইড বর্ণহীন, বায়ু অপেক্ষা ভারী, পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত একটি বিষাক্ত গ্যাস। উহা জলে যথেষ্ট মাত্রায় দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস দাহক নহে ; কিন্তু বায়ু, বা অক্সিজেনের মধ্যে জ্বালাইলে উহা নীলাভ শিখায় জ্বলে এবং জলীয় বাষ্প ও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন সরবরাহ অপ্রতুল হইলে হাইড্রোজেন সালফাইডের দহনে সালফার মৌল বিমুক্ত হয় :

$$2H_2S + 3O_2 = 2H_2O + 2SO_2 ;\ 2H_2S + O_2 = 2H_2O + 2S$$

(ii) হাইড্রোজেন সালফাইডের জলীয় দ্রবণ মৃদু **অ্যাসিড-ধর্মী ;** উহার সংস্পর্শে নীল লিট্‌মাস লাল্‌চে বর্ণ ধারণ করে এবং বিভিন্ন ক্ষারীয় পদার্থের সহিত বিক্রিয়ায় হাইড্রোসালফাইড ও সালফাইড লবণ উৎপন্ন হয় :

$NaOH + H_2S = H_2O + NaHS$ (সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড)

$2NaOH + H_2S = 2H_2O + Na_2S$ (সোডিয়াম সালফাইড)

(iii) হাইড্রোজেন সালফাইড **বিজারক পদার্থ।** ক্লোরিন-জল, অথবা আয়োডিনের জলীয় অবদ্রবণের মধ্য দিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করিলে হাইড্রোক্লোরিক, বা হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই হাইড্রোজেন সালফাইডের জারণে উৎপন্ন সালফারের হলুদ বর্ণের অধঃক্ষেপ পাওয়া যায় :

$$Cl_2 + H_2S = 2HCl + S\downarrow ;\ I_2 + H_2S = 2HI + S\downarrow$$

(iv) কোন-কোন ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করিলে ধাতুগুলি অদ্রাব্য সালফাইড লবণরূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

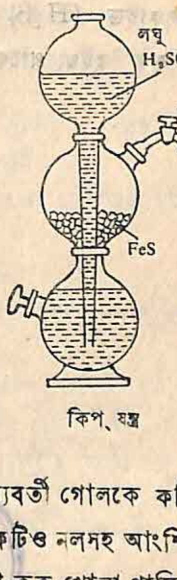
কপার, লেড প্রভৃতি ধাতুর লবণের লঘু **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** যুক্ত দ্রবণ হইতে H_2S-এর বিক্রিয়ায় ধাতব সালফাইড অধঃক্ষিপ্ত হয় :

$CuSO_4 + H_2S = H_2SO_4 + CuS\downarrow$ (কালো)

কিপ্‌যন্ত্র ও তাহার ব্যবহার
(Kipp's Apparatus & its Use)

কোন কঠিন পদার্থের সহিত সাধারণ তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন গ্যাস উৎপন্ন হইলে যে-যন্ত্রের সাহায্যে রসায়নাগারে সহজে গ্যাসটি প্রয়োজনমত যে কোন সময়ে উৎপন্ন করা যায় তাহাকে বলা হয় কিপ্‌যন্ত্র (Kipp's Apparatus)।

কিপ্‌যন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে কাঁচ-নির্মিত তিনটি গোলাকার অংশ থাকে (চিত্র দ্রষ্টব্য); নিম্নবর্তী গোলক দুইটি থাকে পরস্পর সংযুক্ত এবং উহাদের সংযোগস্থলে একটি গোলাকার ছিদ্র-মুখ থাকে। মধ্যবর্তী গোলকটির এক পার্শ্বে গ্যাস-নির্গমনের জন্য ষ্টপ-কক্‌যুক্ত একটি নলপথ থাকে। উপরের গোলকটির নিম্নভাগে দীর্ঘ চোঙাকৃতি একটি কাচনল যুক্ত থাকে। এই গোলকটি মধ্যবর্তী গোলকটির ছিদ্রপথে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাহাতে উহার দীর্ঘ চোঙাকৃতি নলটির নিম্নপ্রান্ত সর্বনিম্নবতী গোলকটিতে রক্ষিত তরলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং উহার উর্ধপ্রান্ত মধ্যবর্তী গোলকটির মুখে বায়ুনিরুদ্ধভাবে আঁটিয়া থাকে।



কিপ্‌ যন্ত্র

সর্বনিম্ন গোলকটিতে বিক্রিয়ক তরল পদার্থ এবং মধ্যবর্তী গোলকে কঠিন পদার্থটি লওয়া হয় ; অবশ্য ঐ তরল পদার্থে উপরের গোলকটিও নলসহ আংশিক ভাবে ভরতি থাকে। মধ্যবর্তী গোলকের নির্গম-নলের ষ্টপ-কক খোলা থাকিলে উপরের গোলক হইতে তরলটি নীচের গোলকে নামিয়া আসে, যাহার ফলে উহার অভ্যন্তরস্থ তরলের তলদেশ উপরে উঠিয়া মধ্যবর্তী গোলকের কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসে এবং উহাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় গ্যাস উৎপন্ন হয়। এখন, ষ্টপ ককটি বন্ধ করিয়া দিলে মধ্যবর্তী গোলকে উৎপন্ন গ্যাসের চাপে তরলটি নীচের গোলকে নামিয়া আসে, কঠিন ও তরল পদার্থের সংস্পর্শ আর থাকে না, কাজেই গ্যাসের উৎপত্তি বন্ধ হয়। নির্গম-নলের ষ্টপ-কক খুলিয়া দিলে পুনরায় কঠিন ও তরল পদার্থের সংস্পর্শ ঘটে, গ্যাস উৎপন্ন হয়।

কিপ্‌যন্ত্রে এইরূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্যাসের পর্যায়ক্রমিক উৎপাদন ও ব্যবহার করা সম্ভব হইয়া থাকে। প্রদত্ত চিত্রটি লক্ষ্য করিলে কিপ্‌যন্ত্রের সাহায্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ও কঠিন ফেরাস সালফাইডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন-সালফাইড (H_2S) গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহারের পদ্ধতিটি সহজেই বুঝা যাইবে।

রসায়নাগারে কঠিন ও তরল পদার্থের বিক্রিয়ায় যে-সকল গ্যাস প্রস্তুত করা হয় তাহাতে কিপ্‌যন্ত্রের ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক। সাধারণতঃ Zn ও H_2SO_4-এর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন, $CaCO_3$ ও HCl-এর বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), FeS ও H_2SO_4-এর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) প্রভৃতি গ্যাস প্রস্তুত করিতে রসায়নাগারে কিপ্‌যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদঃ পদার্থ

1. (a) পদার্থের তিনটি ভৌত অবস্থার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর।

(b) জল, অ্যালকোহল, কেরোসিন বা ক্লোরোফর্ম, যে তরল পদার্থ তাহা একটিমাত্র ভৌত ধর্মের ভিত্তিতে কিভাবে সনাক্ত করিবে? হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, ক্লোরিন ও আয়োডিন-বাষ্প,— কোন্‌টির কি রঙ?

(c) অক্সিজেন ও অ্যামোনিয়ার ভৌত ধর্মের দুইটি বিভিন্নতা উল্লেখ কর। বর্ণের পার্থক্য ব্যতীত লোহা ও তামা অপর কোন্ ভৌত ধর্মের ভিত্তিতে সনাক্ত করা যায়?

2. (a) যে-কোন বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাংক ও হিমাংক অভিন্ন, ইহার সমর্থনে একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(b) কঠিন পদার্থের গলনকালে তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় না কেন? এক-খণ্ড বরফ হাতে ধরিয়া রাখিলে ক্রমশঃ বেশী ঠাণ্ডা লাগে; ইহার কারণ কি?

(c) কলিকাতার তুলনায় দার্জিলিং-এ জল অপেক্ষাকৃত বেশী, না কম তাপমাত্রায় ফুটিবে? বিশুদ্ধ জলের তুলনায় লবণ, জলের স্ফুটনাংক কম, না বেশী?

3. (a) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের পার্থক্য আলোচনা কর।

(b) তামা, বরফ, আয়োডিন, চিনি ও অ্যালকোহল উত্তপ্ত করা হইল; কোন্ ক্ষেত্রে ভৌত পরিবর্তন ও কোন্ ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিবে?

(c) নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ভৌত না রাসায়নিক, তাহা কারণ সহ ব্যাখ্যা কর:

(i) জলে লবণ দ্রবীভূত করিলে, (ii) ম্যাগনেসিয়াম-তার বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে, (iii) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে কষ্টিক সোডা মিশাইলে, (iv) কপার তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালনা করিলে, (v) জলে পোড়াচুন যোগ করিলে, (vi) লোহাকে চুম্বকে পরিণত করিলে, (vii) লোহায় মরিচা ধরিলে, (viii) জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত করিলে।

2. (a) সংস্পর্শ পদ্ধতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

(b) অনুঘটক কাহাকে বলে? ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অনুঘটন-প্রক্রিয়ার দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

(c) $2\,KClO_3 = 2KCl + 3O_2$; $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$; এই বিক্রিয়াদ্বয়ের কোন্‌টিতে কি অনুঘটক ব্যবহার করা হয় তাহাদের নাম লিখ।

(d) তাপ-উদ্গারী ও তাপ-শোষক বিক্রিয়া বলিতে কি বুঝায়? নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলির কোন্‌টি তাপ-উদ্গারী ও কোন্‌টি তাপ-শোষক তাহা উল্লেখ কর। (i) $2H_2 + O_2 = 2H_2O$; (ii) $N_2 + O_2 = 2NO$: (iii) $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$; (iv) $CO_2 + C = 2CO$ ।

5. (a) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা লিখ। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির কোন্‌টি, মৌলিক, কোন্‌টি যৌগিক ও কোন্‌টি মিশ্র পদার্থ তাহা উল্লেখ কর: বায়ু, চিনি, গন্ধক, খাদ্যলবণ, দুধ, কাঠকয়লা, ফসফরাস, ক্লোরিন, অ্যালকোহল, পারদ, হীরক, সীসা, বালি, মার্বেল পাথর।

(b) ধাতু ও অ-ধাতুর প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি লিখ। নিম্নলিখিত মৌলগুলির কোন্‌টি ধাতু কোন্‌টি অ-ধাতু ও কোন্‌টি ধাতুকল্প তাহা উল্লেখ কর: কার্বন, জিংক, মারকারী, অ্যান্টিমনি, সালফার, নাইট্রোজেন, কপার, আয়োডিন, সোডিয়াম।

(c) ধাতুর ন্যায় উজ্জ্বল এমন দুইটি অ-ধাতুর নাম লিখ। কোন্ ধাতু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল? একটি তড়িৎ-ধনাত্মক অ-ধাতুর নাম উল্লেখ কর। কোন্ অ-ধাতু উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ?

দ্বিতীয় অধ্যায়: দ্রবণ ও দ্রাব্যতা

1. (a) জলে চিনির দ্রবণকে যৌগিক পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হয় না কেন? কঠিন পদার্থে গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ ও কঠিন পদার্থে কঠিন পদার্থের দ্রবণের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

(b) দ্রাব্যতার সংজ্ঞা লিখ। একটি নির্দিষ্ট দ্রবণ সম্পৃক্ত, না অসম্পৃক্ত তাহা কিভাবে বুঝিবে?

2. (a) 25°C তাপমাত্রায় জলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা 37,—ইহার অর্থ কি? জলে ক্রমবর্ধমান দ্রাব্যতা অনুযায়ী সাজাও: পটাশিয়াম ক্লোরাইড, লেড নাইট্রেট, পটাসিয়াম, আয়োডাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড।

(b) সাধারণ তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত একটি দ্রবণকে উত্তপ্ত করিলে উহা সম্পৃক্ত থাকিবে না অসম্পৃক্ত হইবে? উত্তপ্ত করিবার পরিবর্তে ঠাণ্ডা করিলে দ্রবণটির দ্রাব্যতা-জনিত কিরূপ পরিবর্তন ঘটিবে?

3. (a) দ্রাব্যতা-লেখ বলিতে কি বুঝায়? উহার উপযোগিতা কি?

(b) জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও চিনির দ্রাব্যতা তাপমাত্রার সহিত কিভাবে পরিবর্তিত হয় এবং দ্রাব দুইটির কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ অবস্থা ঘটে?

(c) তাপমাত্রার সহিত জলে দ্রাব্যতা অতি সামান্য বৃদ্ধি পায় এমন একটি লবণের নাম লিখ। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিলে কোন্ লবণের জলে দ্রাব্যতা হ্রাস পায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: রাসায়নিক সমীকরণ

1. (a) নিম্নলিখিত মৌলগুলির প্রতীক লিখ: কার্বন, ক্যালসিয়াম, হিলিয়াম, জিংক, লেড, পটাশিয়াম, আয়রন, মার্কারী, সোডিয়াম, ব্রোমিন।

(b) উপযুক্ত একটি উদাহরণসহ আণবিক সংকেতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 2Cl ও Cl_2 —ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

(c) যোজ্যতার সংজ্ঞা লিখ। একাধিক যোজ্যতা বিশিষ্ট দুইটি মৌলের নাম লিখ এবং উদাহরণসহ উহাদের যোজ্যতাগুলি উল্লেখ কর।

2. (a) নিম্নলিখিত যৌগিক পদার্থগুলির আণবিক সংকেত লিখ :—
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া, ফেরিক হাইড্রক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, লেড নাইট্রেট, সোডিয়াম হাইড্রাইড, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বোনেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট।

(b) সোডিয়াম ও হাইড্রোজেনের সংযোগে সোডিয়াম হাইড্রাইড গঠনের সঠিক সমীকরণ লিখ।

3. রাসায়নিক সমীকরণ বলিতে কি বুঝায়? $N_2+3H_2=2NH_3$ এবং $C+O_2=CO_2$ সমীকরণ দুইটি হইতে কি-কি তথ্যাদি জানিতে পারা যায় সবিস্তারে লিখ।

4. (a) $2CO+O_2=2CO_2$ সমীকরণটি হইতে উল্লিখিত বিক্রিয়া-সংক্রান্ত কোন্-কোন্ বিষয় জানা যায় না তাহা লিখ।

(b) নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সম্পূর্ণ বা সংশোধন কর :—
(i) $Cu+O=CuO$, (ii) $Na+H_2=NaOH+H$, (iii) $Fe+\cdots\cdots=Fe_3O_4+H_2$, (iv) $H_2S+\cdots\cdots=HCl+S$ ।

5. নিম্নলিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির সঠিক সমীকরণ লিখ :—
(i) ম্যাগনেসিয়াম+অক্সিজেন→ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড; (ii) সোডিয়াম+হাইড্রোজেন → সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড; (iii) ক্যালসিয়াম+নাইট্রোজেন→ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড; (iv) ক্যালসিয়াম কার্বোনেট+হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড → ক্যালসিয়াম ক্লোরাইট+জল; (v) পটাসিয়াম আয়োডাইড+ক্লোরিন → পটাসিয়াম ক্লোরাইড+আয়োডিন; (vi) কপার+সালফিউরিক অ্যাসিড → কপার সালফেট+সালফার ডাইঅক্সাইড+জল; (vii) ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড+কার্বন ডাইঅক্সাইড → ক্যালসিয়াম কার্বোনেট+জল; (viii) পটাশিয়াম ক্লোরেট → পটাশিয়াম ক্লোরাইড+অক্সিজেন; (ix) অ্যামোনিয়াম সালফেট+সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড → অ্যামোনিয়া+সোডিয়াম বাইসালফেট+জল; (x) লেড নাইট্রেট → লেড মনোক্সাইড+নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড+অক্সিজেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তড়িদ্‌বিশ্লেষণ

1. (a) তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য পদার্থ ও তড়িদ্‌বিশ্লেষণ বলিতে কি বুঝায়? তড়িদ্‌বিশ্লেষণ ভৌত, না রাসায়নিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া?

(b) নিম্নলিখিত পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য ও কোন্‌টি অ-তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য তাহা উল্লেখ কর: খাদ্যলবণ, চিনি, গ্রাফাইট, কষ্টিক সোডা, কপার, সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যালকোহল, আয়োডিন, কেরোসিন।

2. (a) জলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণে ক্যাথোডে ও অ্যানোডে কি-কি গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং উহাদের আয়তনের অনুপাত কত?

(b) কষ্টিক সোডা কোন্ অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করিতে পারে—কঠিন অবস্থায়, উত্তাপে, বিগলিত অবস্থায়, জলীয় দ্রবণে?

(c) তড়িদ্‌বিশ্লেষণকালে ব্যাটারী হইতে তড়িৎ ক্যাথোডের মাধ্যমে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং অ্যানোডের মাধ্যমে বাহির হইয়া পুনরায় ব্যাটারীতে ফিরিয়া যায়,—উক্তিটি ভুল না নির্ভুল?

3. (a) আয়ন কাহাকে বলে? Na পরমাণু ও Na^+ আয়নের ধর্মের একটি পার্থক্য উল্লেখ কর।

(b) Ca^{++}, Al^{+++}, Cl^- ও S^{--} আয়নে যথাক্রমে Ca, Al, Cl ও S পরমাণুর তুলনায় কয়টি ইলেকট্রন বেশী বা কম আছে?

(c) জলীয় দ্রবণে সালফিউরিক অ্যাসিডের তড়িদ্‌বিয়োজনের সমীকরণটি লিখ। তড়িদ্‌-বিয়োজনের সহিত তাপীয় বিয়োজনের একটি পার্থক্য উল্লেখ কর।

4. তড়িৎপ্রলেপন বলিতে কি বুঝায়? একটি উদাহরণ সহযোগে প্রক্রিয়াটি আলোচনা কর। তড়িৎপ্রলেপনের দুইটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর।

5. যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর :—

(a) বিশুদ্ধ জল অতি স্বল্প তড়িৎ-পরিবাহী, কিন্তু কয়েক ফোঁটা লঘু H_2SO_4 যোগ করিলেই জলের তড়িৎ-পরিবাহিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

(b) কঠিন NaCl তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে না; কিন্তু উহার জলীয় দ্রবণে তড়িৎ অনায়াসে চলাচল করিতে পারে।

(c) খাদ্য-লবণের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-পরিবাহী, কিন্তু চিনির জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-অপরিবাহী।

(d) ধাতব লবণের তড়িদ্‌বিশ্লেষণকালে ধাতব অংশ ক্যাথোডে ও অধাতব অংশ অ্যানোডে বিমুক্ত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ

1. (a) অ্যাসিড ও ক্ষারকের সংজ্ঞা লিখ।

(b) ক্ষার ও ক্ষারকের মধ্যে পার্থক্য কি? নিম্নলিখিত ক্ষারকগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি ক্ষার তাহা উল্লেখ কর :—

CuO, CaO, NaOH, $Fe(OH)_3$, NH_4OH।

2. (a) কোন পদার্থ অ্যাসিড, না ক্ষার তাহা কিরূপে পরীক্ষা করিবে?

(b) নিম্নলিখিত অক্সাইডগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি আম্লিক ও কোন্‌গুলি ক্ষারকীয় প্রকৃতিবিশিষ্ট তাহা উল্লেখ কর :—

CuO, Na_2O, CO_2, ZnO, P_2O_5, SO_2, MgO।

3. (a) প্রশমন-ক্রিয়া বলিতে কি বুঝায়? প্রশমন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইল কি-না তাহা কিরূপে নির্ধারণ করা যায়?

(b) সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত কষ্টিক সোডার বিক্রিয়ায় কি-কি লবণ উৎপন্ন হয়? লবণগুলির নাম লিখ এবং কোন্‌টি কোন্‌ ধরনের লবণ তাহা উল্লেখ কর।

4. (a) লবণ কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার লবণের প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও এবং উহা কোন্‌ অ্যাসিড ও কোন্‌ ক্ষার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা লিখ।

(b) নিম্নলিখিত লবণগুলির সংকেত লিখ এবং কোন্‌টি কোন্‌ প্রকার লবণ তাহা উল্লেখ কর: পটাশিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, বেসিক লেড নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, বেসিক কপার সালফেট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : জারণ ও বিজারণ

1. জারণ ও বিজারণ বলিতে কি বুঝায় তাহা উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

2. (a) নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির কোন্‌টি জারণ ও কোন্‌টি বিজারণ তাহা উল্লেখ কর: $KI \rightarrow I_2$; $Cl_2 \rightarrow HCl$; $H_2S \rightarrow S$; $CO \rightarrow CO_2$; $MnO_2 \rightarrow MrCl_2$; $CuO \rightarrow Cu$; $Zn \rightarrow ZnCl_2$; $Fe_2(SO4)_3 \rightarrow FeSO_4$; $H_2SO_4 \rightarrow SO_2$; $H_2O \rightarrow H_2$ ।

(b) 'জারণ ও বিজারণ পরস্পরের পরিপূরক প্রক্রিয়া'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

3. (a) জারক ও বিজারক পদার্থ বলিতে কি বুঝায়? উহাদের পারস্পরিক বিক্রিয়াকালে কোন্‌টির কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?

(b) নিম্নলিখিত পদার্থগুলির কোন্‌টি জারক ও কোন্‌টি বিজারক তাহা উল্লেখ কর: Cl_2, H_2SO_4, H_2S, H_2, HNO_3, MnO_2 ।

4. নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলিতে কোন্‌টি জারণ-ক্রিয়া ও কোন্‌টি বিজারণ-ক্রিয়া তাহা নির্দেশ করিয়া দেখাও :—

(i) $I_2 + H_2S = S + 2HI$, (ii) $2KI + Cl_2 = 2KCl + I_2$, (iii) $C + H_2O = CO$
$+ H_2$, (iv) $MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$, (v) $SO_2 + 2H_2S$
$= 3S + 2H_2O$; (vi) $S + 2H_2SO_4 = 3SO_2 + 2H_2O$; (vii) $3Na + AlCl_3 =$
$3NaCl + Al$; (viii) $2Al + Fe_2O_3 = 2Fe + Al_2O_3$; (ix) $SO_2 + 2FeCl_3$
$+ 2H_2O = 2FeCl_2 + H_2SO_4 + 2HCl$; (x) $2CuSO_4 + 4KI = Cu_2I_2 + I_2 + 2K_2$
SO_4 ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বায়ু

1. বায়ুর উপাদানিক গঠন লিখ। তরল বায়ু কিভাবে প্রস্তুত করা হয়, সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া বুঝাও। উহার প্রধান ব্যবহার কি কি?

2. (a) বায়ুতে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি মিশ্রিত আছে তাহাদের নাম লিখ। উহাদের বিরল গ্যাস বলা হয় কেন এবং কিভাবে পৃথক করা হয়?

(b) নিয়ন-আলোক কাহাকে বলে? উহার ব্যবহার কি?

(c) ফ্ল্যাশ-লাইটের বাল্‌বে কি গ্যাস ভরতি থাকে? আবহ বিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য বেলুন উত্তোলনে কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়?

3. 'নাইট্রোজেন-চক্র' বলিতে কি বুঝায়? উহার চক্রাবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি মোটামুটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

4. (a) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে নাইট্রোজেন প্রধানতঃ কোন্ যৌগের আকারে থাকে? এমন দুইটি উদ্ভিদের নাম লিখ যাহারা বায়ুমণ্ডল হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন যোগাবদ্ধ করিতে পারে কোন্ জীবাণু এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে?

(b) এমন একটি প্রক্রিয়া উল্লেখ কর যাহাতে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ হইতে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া যায়।

5. (a) যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা রক্ষিত হয় সেইগুলি বিশদভাবে বর্ণনা কর।

6. (a) বায়ু মৌলিক, যৌগিক, না মিশ্র পদার্থ? তরল বায়ু হইতে কোন্ প্রক্রিয়া দ্বারা অক্সিজেন ও নাইট্রোজন পৃথক করা যায়?

(b) উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া বলিতে কি বুঝায়?

(c) মৃত উদ্ভিদ, বা প্রাণিদেহ মাটিতে পচিয়া কোন্ গ্যাসে পরিণত হয়? কোন্ ব্যাক্‌টিরিয়া অ্যামোনিয়াকে বিয়োজিত করিয়া নাইট্রোজেন বিমুক্ত করে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ: কয়েকটি সাধারণ গ্যাস

1. রসায়নাগারে অক্সিজেনের প্রস্তুত-প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর। অক্সিজেন গ্যাস সনাক্ত করা যায় কিভাবে?

2. হাইড্রোজেন গ্যাস রসায়নাগারে প্রস্তুত করা হয় কিভাবে? হাইড্রোজেনের বিজারণ ক্ষমতার একটি উদাহরণ দাও।

3. হাইড্রোজেনের অন্তর্ধৃতি বলিতে কি বুঝায়? জায়মান হাইড্রোজেন কাহাকে বলে? উহার রাসায়নিক সক্রিয়তায় একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

4. রসায়নাগারে নাইট্রোজেনের প্রস্তুত-পদ্ধতি বর্ণনা কর। হাইড্রোজেন ও ক্যালসিয়ামের সহিত কোন্ অবস্থায় নাইট্রোজেনের কি বিক্রিয়া ঘটে তাহা সমীকরণসহ বর্ণনা কর।

5. রসায়নাগারে যে বিক্রিয়া দ্বারা অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয় তাহার সমীকরণ লিখ। অ্যামোনিয়া কিভাবে বিশুষ্ক ও সংগ্রহ করা হয়? অ্যামোনিয়া সনাক্ত করিবে কিরূপে?

6. রসায়নাগারে কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রস্তুত-পদ্ধতি একটি পরিষ্কার চিত্রসহ বর্ণনা কর। চুন-জলের সহিত উহার বিক্রিয়া সমীকরণসহ লিখ।

7. সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রস্তুত-পদ্ধতি বর্ণনা কর। উহার বিজারণ-ধর্ম ও অ্যাসিড-ধর্মের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

8. রসায়নাগারে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রস্তুত করা যায় কিভাবে ? উহার দুইটি প্রধান রাসায়নিক ধর্ম আলোচনা কর।

9. যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর :—

(a) মার্বেল-পাথর, বা চক হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতিতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়, সালফিউরিক অ্যাসিড নহে।

(b) অ্যামোনিয়া পোড়া-চুনের সাহায্যে বিশুদ্ধ করা হয়, P_2O_5 বা গাঢ় H_2SO_4 দ্বারা নহে।

(c) ফেরাস সালফাইডের সহিত লঘু H_2SO_4-এর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করা হয়। এই প্রস্তুতিতে গাঢ় H_2SO_4 ব্যবহার করা যায় না।

10. (a) নিম্নলিখিত গ্যাসগুলির জলীয় দ্রবণের সংস্পর্শে কোন্ ক্ষেত্রে লিট্মাসের কিরূপ বর্ণ পরিবর্তন ঘটে : NH_3, CO_2, H_2S, SO_2।

(b) পটাশিয়াম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন প্রস্তুতিতে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা ও সুবিধা কি ?

(c) কিপ্ যন্ত্র ব্যবহারের প্রধান সুবিধা কি? কোন্ কোন্ গ্যাস এই যন্ত্রে প্রস্তুত করা যাইতে পারে ?

11. কোন্‌টি কোন্ গ্যাস (a) N_2 বা CO_2, (b) H_2 বা NH_3, (c) CO_2 বা SO_2, রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে কিরূপে সনাক্ত করিবে ? সনাক্তকরণের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির সমীকরণ লিখ।

12. নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে কি বিক্রিয়া ঘটে তাহা সমীকরণসহ বর্ণনা কর :—

(a) কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে জ্বলন্ত ম্যাগ্নেসিয়াম-তার প্রবেশ করাইলে।

(b) লঘু অ্যাসিড মিশ্রিত পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে জিংকের টুকরা যোগ করিলে।

(c) লঘু অ্যাসিড মিশ্রিত কপার সালফেট দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালিত করিলে।

(d) অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণে ক্লোরিন গ্যাস চালিত করিলে।

(e) উত্তপ্ত সোডিয়ামের উপর দিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস চালিত করিলে।

(f) সালফার ডাইঅক্সাইডের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালিত করিলে।

(g) উত্তপ্ত অ্যালুমিনিয়ামের উপর দিয়া নাইট্রোজেন প্রবাহিত করিলে, এবং উৎপন্ন পদার্থ ষ্টীমের সহিত বিক্রিয়া করিলে।

———